দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস : বিষয়বৈচিত্র্য, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ ও শিল্পরীতি

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

রবীন্দ্র কুমার বর্মন

Registration No : Ph. D/Beng. (1287)/670/R-2019

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায়

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

২০২১

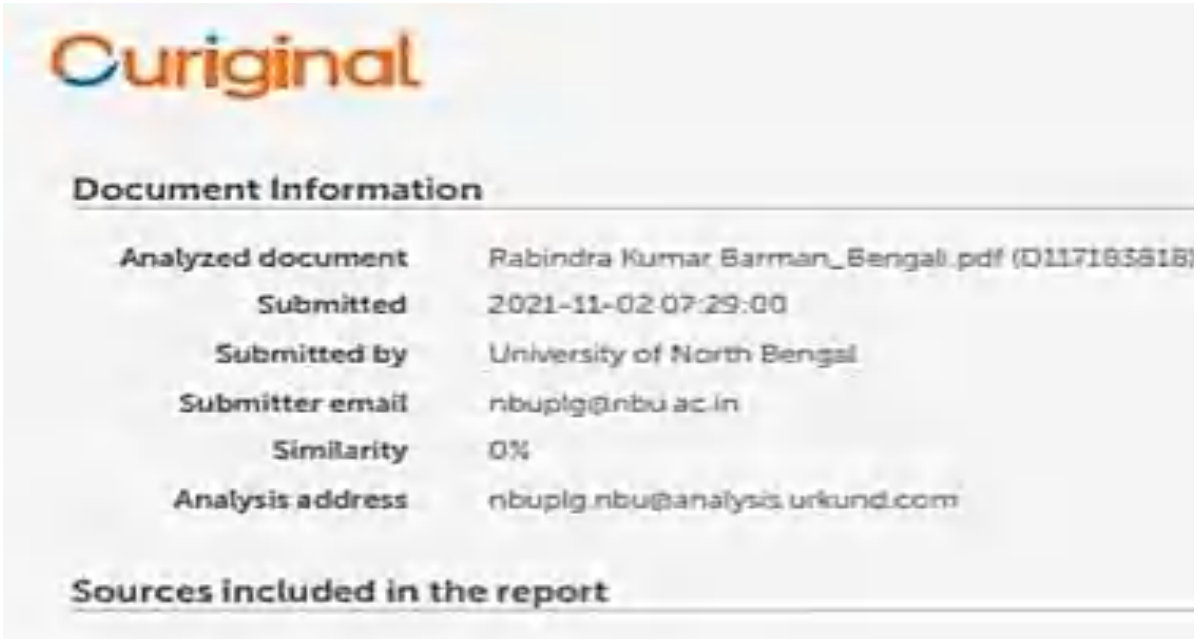
Curiginal

Document Information

Analyzed document	Rabindra Kumar Barman_Bengali.pdf (D117163618)
Submitted	2021-11-02 07:29:00
Submitted by	University of North Bengal
Submitter email	nbuplg@nbu.ac.in
Similarity	0%
Analysis address	nbuplg.nbu@analysis.urkund.com

Sources included in the report

Rabindra Kumar Barman
24/12/2021

Rabindra Kumar Barman
Department of Bengali
University of North Bengal

Dr. Nikhil Chandra Ray
(Supervisor)
Department of Bengali
University of North Bengal

PROFESSOR
Department of Bangla
North Bengal University

ঘোষণা

আমি **'দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস : বিষয়বৈচিত্র্য, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ ও শিল্পরীতি'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এই গবেষণা পত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

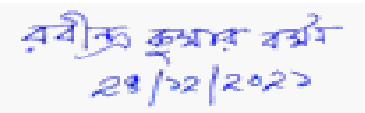

রবীন্দ্র কুমার বর্মন
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

dept.bengalinbu@gmail.com

রেফারেন্স নম্বর .....

তারিখ .....

I assure you that Rabindra Kumar Barman has prepared his Ph. D thesis for the Ph. D degree from the University of North Bengal under my supervision, entitled **'Dibyendu Paliter Uponyas : Bisoyboicitryo, Charitrer Manobishleson o Shilporiti'** [**'দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস : বিষয়বৈচিত্র্য, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ ও শিল্পরীতি'**] To prepare the thesis, he has met the requirements of the appropriate rules and regulations of the university. I am sure that this thesis has not been submitted to any other university or educational institution before. As a supervisor, I recommend him to submit his dissertation for his Ph. D at the University of North Bengal.

I wish Rabindra Kumar Barman success.

Dr. Nikhil Chandra Ray
Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

PROFESSOR
Department of Bangla
North Bengal University

গবেষণার সংক্ষিপ্তসার

(Abstract of Research Work)

দিব্যেন্দু পালিত বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর সৃষ্টিকর্মে তিনি ভাস্বর। তাঁর রচনাশৈলী অভিনবত্বের দাবি রাখে। তিনি যে শৈল্পিক ভাবনায় তাঁর সাহিত্যকীর্তিকে উপস্থাপন করেছেন তা আপামর পাঠককে অভিনন্দিত ও চমৎকৃত করেছে। তাঁর উপন্যাসে সময় ও পটভূমিতে, চরিত্র সৃষ্টি ও কাহিনি নির্মাণে, ভাষা ও প্রতীক ব্যবহারে, ইতিহাস চেতনা ও সমাজ চেতনার প্রতিফলনে আছে মৌলিকতা ও অভিনবত্ব যা বাংলা উপন্যাসে বিরল নিদর্শন। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস, ছোটোগল্প, কবিতা প্রবন্ধ নিয়ে অনেকেই প্রবন্ধ লিখেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর সাহিত্যের সমস্ত দিক নিয়ে একটি গবেষণামূলক কাজও হয়েছে। কাজটি করেছেন গুরুপদ অধিকারী। তাঁর গবেষণার শিরোনামটি ছিল— 'নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের মনোজগতের রূপকার দিব্যেন্দু পালিত (১৯৫৫-২০০০)'। কিন্তু দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ এবং শিল্পরীতি নিয়ে নতুন ভাবনা বা আলোচনা আমার চোখে পড়েনি। সেজন্যই এই সমস্ত দিকগুলি সামনে রেখে আমি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস : বিষয়বৈচিত্র্য, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ ও শিল্পরীতি'। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়টিকে ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—

প্রথম অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পটভূমি**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের পর্ববিভাগ ও বিষয়বৈচিত্র্য**

ক. প্রথম পর্ব ['সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯) থেকে 'প্রণয়চিহ্ন' (১৯৭১)]

খ. দ্বিতীয় পর্ব ['সন্ধিক্ষণ'(১৯৭১) থেকে 'সবুজ গন্ধ'(১৯৮২)]

গ. তৃতীয় পর্ব ['সহযোদ্ধা'(১৯৮৪) থেকে 'গৃহবন্দী'(১৯৯১)]

ঘ. চতুর্থ পর্ব ['সংঘাত'(১৯৯২) থেকে 'একদিন সারাদিন'(২০০৩)]

তৃতীয় অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের বিচিত্রতা**

চতুর্থ অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের প্রকৃতি**

পঞ্চম অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের শিল্পরীতি**

ক. উপস্থাপনরীতি

খ. গঠননৈপুণ্য

গ. ভাষাবিন্যাস

ষষ্ঠ অধ্যায় : **সমকালীন বাংলা উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিতের স্বাতন্ত্র্য**

প্রথম অধ্যায়ে কথাসাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশের পটভূমি আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসগুলিকে চারটি পর্বে ভাগ করে এবং পর্বানুযায়ী বিষয়বস্তুকে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় বিয়াল্লিশটি। কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে বিষয়বস্তু পাল্টে গেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে বিচিত্র চরিত্রের প্রদর্শনী। কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপন্যাসের চরিত্রকে দেখিয়েছেন। এই অধ্যায়ে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে দুটি ভাগে করে দেখানো হয়েছে—
১. উপন্যাসের প্রধান চরিত্রচিত্রণ এবং ২. উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রচিত্রণ।

চতুর্থ অধ্যায়ে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে। মনোবৈজ্ঞানিক সিগমণ্ড ফ্রয়েড, সি. জে. ইয়ুং, জাক লাকাঁ প্রমুখ মনিষীরা মনোজগতের জটিলতা, অস্বাভাবিকতা, টানাপোড়েন, বিকার প্রভৃতি সম্পর্কে যে নতুন নতুন সূত্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তা স্মরণে রেখে এই অধ্যায়ে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্রদের মনোবিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে চরিত্রগুলোর আচার-আচরণের কার্যকারণ বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আবার যেসব চরিত্রের মধ্যে মানসিক বিকার অসুস্থতার পর্যায়ে চলে গেছে অর্থাৎ নিউরোসিস, সিজোফ্রেনিয়া, হ্যালুসিনেশন, ডিল্যুউশান, ইনসমনিয়া, প্যারানাইয়া, আত্মহত্যাপ্রবণতা প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়েছে, সেগুলির কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেক চরিত্রের মধ্যে আবার কামবিকৃতি, ধর্ষকাম, ব্যক্তিত্ব বিন্যাসগত বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি লক্ষ করা গেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে শিল্পরীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়-ভাবনার বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পরীতির অনন্যতায়ও দিব্যেন্দু পালিত এক স্বতন্ত্র ধারার শিল্পী। তাঁর উপন্যাসের শিল্পরীতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে— ক. উপস্থাপনরীতি, খ. গঠননৈপুণ্য এবং গ. ভাষাবিন্যাস। দিব্যেন্দু পালিত কোনো কাহিনি বা ঘটনা বর্ণনা করে উপন্যাস রচনা করেননি। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসেই দেখা তিনি মাঝখান থেকে কাহিনি শুরু করেছেন কিংবা তাঁর উপন্যাসের শুরুটা হয়েছে একটা অস্পষ্টতা দিয়ে। উপন্যাসের শেষেও কোনো সুস্পষ্ট পরিণতি দেখাননি। উপন্যাসগুলির গঠন বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসগুলি আয়তন খুবই ছোট। অকারণে কলেবর বৃদ্ধির প্রতি তিনি বরাবরই বিরোধী ছিলেন। লেখায় তিনি পরিমিতিবোধকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি শিল্পগুণ বা ভাষাগুণ বলতে বুঝিয়েছেন সংযম। তিনি মনে করেছিলেন অতিকথন যে কোনো রচনারই বড়ো ত্রুটি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দিব্যেন্দু পালিতের সমসাময়িক, কিছু পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী কয়েকজন ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে দিব্যেন্দু পালিতের স্বতন্ত্রতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের রচনায় বিশেষকরে মতি নন্দী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, একটু বয়সে বড়ো বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখদের রচনায় মধ্যবিত্ত মানুষের সমস্যা প্রধান হয়ে উঠেছে। এঁদের মধ্যে থেকেই প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে দিব্যেন্দু পালিত বাংলা সাহিত্যে কতটা জায়গা দখল করেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে।

নিবেদন

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বিশেষ আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোভুক্ত মানুষের জীবন এবং তার মনোজগতের বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অন্বেষণের লক্ষ্যে আমি 'দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস : বিষয়বৈচিত্র্য, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ ও শিল্পরীতি' শীর্ষক বিষয়ে আমার উচ্চতর গবেষণার বিষয় গ্রহণ করি। এর পূর্বে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ২০১৫-২০১৭ সেশনে এম. ফিল করি। যদিও আমার এম. ফিলের বিষয় ছিল মধ্যযুগের সাহিত্য। তবে আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি টানটাই বেশি করে উঁকি দেয় মনের ভিতর। ২০১১-২০১৩ সেশনে এম. এ পড়ার সময় থেকেই বাংলা কথাসাহিত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। সেই তাগিদে গবেষণার প্রতি প্রবল ঝোঁকও ছিল। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করতে করতে কখন যে কথাশিল্পী দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যরচনার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি তা বুঝে উঠতে পারিনি। দিব্যেন্দু পালিত স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের একজন স্বতন্ত্র ধারার লেখক। যিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপন বিষয় নিয়ে উপন্যাস ও ছোটোগল্প লিখেছেন। খবরের কাগজের বিষয় কিভাবে লেখকের কলমে উপন্যাসের বিষয় হয়ে ওঠে তা পড়ে আমি হতবাক হই এবং এই বিষয়ে প্রবল আগ্রহ ও ভালোবাসা জন্মায়। সেই ভালোলাগা বা ভালোবাসার বিষয়ে আরো প্রবলভাবে জানার জন্য আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়ের কাছে যাই। বিষয়টির প্রতি আমার আগ্রহ দেখে তিনি আমাকে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য বেছে নিতে উৎসাহিত করেন। এবং আমি তাঁর পরামর্শ মেনে আমার গবেষণার বিষয়টি সুসম্পন্ন করতে পেরেছি।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে জীবনকে একেবারে স্বতন্ত্রভাবে দেখা একজন অনালোচিত ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু পালিতের প্রতিভা ও তাঁর উপন্যাসগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। আমার গবেষণার ক্ষেত্রটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। অধ্যায়গুলি হলো—

প্রথম অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পটভূমি**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের পর্ববিভাগ ও বিষয়বৈচিত্র্য**
ক. প্রথম পর্ব ['সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯) থেকে 'প্রণয়চিহ্ন' (১৯৭১)]

খ. দ্বিতীয় পর্ব ['সন্ধিক্ষণ'(১৯৭১) থেকে 'সবুজ গন্ধ'(১৯৮২)]

গ. তৃতীয় পর্ব ['সহযোদ্ধা'(১৯৮৪) থেকে 'গৃহবন্দী'(১৯৯১)]

ঘ. চতুর্থ পর্ব ['সংঘাত'(১৯৯২) থেকে 'একদিন সারাদিন'(২০০৩)]

তৃতীয় অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের বিচিত্রতা**

চতুর্থ অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের প্রকৃতি**

পঞ্চম অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের শিল্পরীতি**

ক. উপস্থাপনরীতি

খ. গঠননৈপুণ্য

গ. ভাষাবিন্যাস

ষষ্ঠ অধ্যায় : **সমকালীন বাংলা উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিতের স্বাতন্ত্র্য**

আমার এই গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সাহায্য করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়। স্যারের মূল্যবান সুপরামর্শ, সুগভীর জ্ঞান, সঠিক দিক নির্দেশ, অনুপ্রেরণা এবং প্রতিনিয়ত বিষয়টি নিয়ে স্যারের সঙ্গে পর্যালোচনা করে গবেষণাকর্মটি প্রস্তুত করতে পেরেছি। স্যারকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয় এবং বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকেরা নানাভাবে আমাকে উৎসাহ এবং সুপরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই আমি যাঁর কাছে চিরঋণী আমার বাবা স্বর্গীয় শ্রী অখিল চন্দ্র বর্মনকে। আজ বিশেষভাবে মনে পড়ছে বাবার কথা। এই গবেষণাকর্ম চলাকালীন তাঁকে আমি হারিয়েছি। আমার গুছিয়ে ওঠা পড়াশোনা ওলট-পালট হয়ে গেছে। মনে বড়ো কষ্ট হচ্ছে বাবা এই কাজটি দেখে যেতে পারলেন না। এরপর নিরন্তর যারা আমাকে পড়াশুনার প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁরা হলেন আমার মা শ্রীমতী মনোমতি বর্মন, দাদা অজিত কুমার বর্মন, বৌদি তাপসী বর্মন। এছাড়াও যাদের মুখ দেখলে আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় ও স্নেহে ভরে ওঠে প্রাণ ঠাকুরমা শ্রীমতী রমেশ্বরী বর্মন এবং দুই ভাইপো সৃজন কুমার বর্মন ও অপ্রতিম কুমার বর্মন।

আমার এই গবেষণাকর্মটির জন্য আমি মূলত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজেস এন্ড কালচার্স-এর সাহায্য গ্রহণ করেছি। বিভিন্ন সময়ে যারা বই দিয়ে সাহায্য করেছেন তারা হলেন বিভাগের অগ্রজপ্রতিম গবেষক কালিপদ বর্মন, অভিষেক মণ্ডল, পার্থ সাহা এবং বোনসম সাথী নন্দী— তাদেরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জহর সেনমজুমদার, অগ্রজপ্রতিম ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক রঞ্জন রায়, হাওড়ার প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজের অধ্যাপক সুধাংশুকুমার সরকার— এমন অনেক গুণমুগ্ধ মানুষ যারা আমার কাজের প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। এমনকি যারা প্রত্যেকটা সময় আমাকে আন্তরিক উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে বিভাগের দাদা-দিদিরা, বন্ধু এবং ভাই-বোন— তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। গবেষণাপত্রটি মুদ্রণের কাজ আমি নিজেই করেছি, সঙ্গে সাহায্য করেছে অনুজপ্রতিম ভাই বিশ্বজিৎ মজুমদার। আর প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করেছে গবেষক ভায়েলী পাটোয়ারী, জয়ন্ত বর্মন, সুজিত বর্মন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আজীবন মনে রাখার মতো, তাদেরকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার এই গবেষণাকর্মটির উদ্ধৃতি অংশে লেখকের মূল বানান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংসদ বাংলা অভিধান প্রবর্তিত বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

রবীন্দ্র কুমার বর্মন
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা : ১-৩

প্রথম অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পটভূমি** ৪-২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের পর্ববিভাগ ও বিষয়বৈচিত্র্য** ২৬-৮৬

ক. প্রথম পর্ব ['সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯) থেকে 'প্রণয়চিহ্ন' (১৯৭১)]

খ. দ্বিতীয় পর্ব ['সন্ধিক্ষণ'(১৯৭১) থেকে 'সবুজ গন্ধ'(১৯৮২)]

গ. তৃতীয় পর্ব ['সহযোদ্ধা'(১৯৮৪) থেকে 'গৃহবন্দী'(১৯৯১)]

ঘ. চতুর্থ পর্ব ['সংঘাত'(১৯৯২) থেকে 'একদিন সারাদিন'(২০০৩)]

তৃতীয় অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের বিচিত্রতা** ৮৭-১৩৪

চতুর্থ অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের প্রকৃতি** ১৩৫-১৫৯

পঞ্চম অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের শিল্পরীতি** ১৬০-১৮৮

ক. উপস্থাপনরীতি

খ. গঠননৈপুণ্য

গ. ভাষাবিন্যাস

ষষ্ঠ অধ্যায় : **সমকালীন বাংলা উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিতের স্বাতন্ত্র্য** ১৮৯-২১৭

উপসংহার : ২১৮-২২০

গ্রন্থপঞ্জি : ২২১-২৩৪

পরিশিষ্ট : ২৩৫-২৩৭

নির্ঘণ্ট : ২৩৮-২৪৫

ভূমিকা

স্বাধীনতা পরবর্তীকালের একজন স্বতন্ত্র ধারার কথাসাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরটিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বেড়ে ওঠা স্বাধীনতা সমসাময়িক ও স্বাধীনতা উত্তরকালে। এই সময় তিনি দেখেছেন আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাতাবরণে বিপর্যস্ত মূল্যবোধকে। এই সময় মানুষ একদিকে প্রত্যক্ষ করেছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একাগ্রতা, মন্বন্তরের দিনে দেখেছে রাস্তার ধারে জমে ওঠা মানুষের শব, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেশ বিভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষের স্রোত নেমে এসেছে কলকাতার রাস্তায়। বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম তাগিদে সমস্ত আদর্শ নষ্ট করতে হয়েছে। পুরুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে সতী-সাবিত্রীরা নিজেদের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে হারিয়ে ফেলেছে। এভাবে নিম্নবিত্তরা বাঁচার জন্য যে কোনো রাস্তাই বেছে নিয়েছে। আর উচ্চবিত্তরা নিজেদের বিবেককে উপড়ে ফেলে আরো ধনবান হয়েছে। কিন্তু মধ্যবিত্তরা ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ঝুলে রইলো। বর্তমানের ক্লিষ্টতা আর ভবিষ্যতের নিশ্চয়তার দিকে তাকিয়ে নিজেদের আশা আর ভরসার মধ্যে ব্যবধানকে ক্রমশ বাড়তে দেখে নিরুপায়বোধে পঙ্গু হয়ে যায়। নৈরাশ্য আর অসহায়তা মধ্যবিত্তজীবনকে সমাজের এক প্রান্তে ঠেলে দেয়। হৃদয়ের দিক থেকে নিঃস্ব হয়েও কেউ কেউ সচ্ছলভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। এই সময় আর সংকটই দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু।

ছয়ের দশক থেকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের চাপে মানুষ বদলাতে শুরু করে। উদ্বাস্তুরা থিতু হতে না পারায় বাঙালি শ্রেণিচরিত্রও বদলে গেছে। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেছে; শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ছুটেছে উচ্চবিত্ত হওয়ার লক্ষ্যে, আর একটি অংশ প্রতিদিন নিম্নবিত্তে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুঝেছে। শুরু হয় অর্থনৈতিক ও নৈতিক নানা অবক্ষয়— দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, হতাশা, একাকীত্ব, অস্তিত্বের বিপন্নতা। নতুন জীবনের স্বাদ পেতে মেয়েরাও চার দেয়ালের ভিতরে না থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তার ফলে দাম্পত্যজীবনে পুরুষের মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। স্বাভাবিকভাবেই দাম্পত্যজীবনে বিচ্ছেদের কথা এসে যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা যায় বহুগামিতা। বেশি দিন স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করার পর পুরুষের মনে হয়েছে জীবন ক্লান্তিকর, একঘেয়ে। পুরনো সম্পর্ক আর টিকে রাখতে চায় না। তাই দেখা যায়, দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে দুই, তিন, চার কিংবা পনের থেকে পঁচিশ কিংবা ষাট বছর পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর যে সম্পর্ক

টিকে ছিল তা আর টিকে থাকছে না। এর প্রভাব পড়েছে সন্তান-সন্ততিদের মনেও। দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে এই সব যুবক-যুবতিদেরও মনোবিশ্লেষণ দেখিয়েছেন। পুরুষদের আধিপত্য থেকে বেরিয়ে নারীরা অনেক সময় নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করেছে। চাকরি খুঁজে পেয়েছে আবার ভুল পথে চালিতও হয়েছে। আবার শেষে বিষণ্ণতায় ভুগতে হয়েছে নর-নারী উভয়কেই। কখনোবা মুক্তির জন্য আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে হয়েছে। দিব্যেন্দু পালিত মূলত এই সব নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের রূপকার। কাহিনি বা ঘটনাকে মুখ্য না করে চরিত্রের অন্তর্বিশ্লেষণকেই তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে স্থান দিয়েছেন।

এই সময় বাংলাদেশে এমন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে যারা গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত নয়। বরং শিল্পের উৎপাদনের সঙ্গে তাদের জীবন জড়িত। মেধাই এদের মূল হাতিয়ার। যা সৃজনশীল, ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনভিত্তিক আর আনুষঙ্গিক পরিমিত শ্রম। এই মূলধনকেই সম্বল করে তারা এসে দাঁড়াল নগরজীবনের কেন্দ্রে। সেখানে ততোদিনে গড়ে উঠেছে মাল্টি বাজার— দেশি পুঁজিপতিদের কাছে যে যতো বেশি বিক্রি করতে পারবে নিজেকে, ততো বেশি সে পাবে আর্থিক সাচ্ছল্য ও সামাজিক নিরাপত্তা। এভাবে আত্মবিক্রয়ের জন্য এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে চলে অবিরাম এক প্রতিযোগিতা। যেমন একদিকে জীবনকে সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা দিতে অনেক মানবিক দায়ের দিকে পিছন ফিরে তাকাতে হয় তাদের, অন্যদিকে পুরনো সংস্কার ও মূল্যবোধের আকস্মিক উদ্ভাসে নিজেদের দাঁড়াবার জায়গাটুকু চিনে নিতে হয়। এই দোলাচলতার মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থা এমন করুণ হয়ে উঠেছে যা মানবিক স্খলন ও হননেরই নামান্তর।

এই সময় রাজনৈতিক চেতনা ও শহুরে হয়ে ওঠার প্রবণতা বেড়েছে। কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণি স্বাধিকার অর্জনের দিকে এগিয়ে গেছে। এরই মধ্যে ছয়-সাতের দশকে নকশাল আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে ঘর ও বাহির— দুই জায়গাতেই বিপজ্জনক অবস্থা। যে আদর্শবোধ দেশের প্রাক্-স্বাধীনতা রাজনীতিকে দিয়েছিল সম্ভ্রমের রূপ, দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতায় তা ক্রমশ আড়াল হয়ে গেছে। প্রায় সমান্তরাল রেখায় প্রকট হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক ও নৈতিক নানা অবক্ষয়। এই অবস্থাকে কেন্দ্র করে রাজনীতির যে উত্তাল হাওয়া উঠেছিল তাকে হাতিয়ার করে দিব্যেন্দু পালিত উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু

সেগুলিতে রাজনীতি মুখ্য নয়। উপন্যাসের আবহমণ্ডলে রাজনীতিকে রেখে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।

দিব্যেন্দু পালিত দীর্ঘকাল সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই তাঁর সাংবাদিক জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে উপন্যাসে। সংবাদপত্রের রিপোর্টের আকারে অনেক সময় তিনি উপন্যাসের গঠন নির্মাণ করেছেন। শুধু তাই নয়, দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস বস্তিজীবনের কাহিনি থেকে শুরু করে মেয়েদের মেসবাড়ির জীবন, বেশ্যাপল্লী থেকে আন্তর্জাতিকতায় পৌঁচেছে।

প্রথম অধ্যায়

দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পটভূমি

ব্যক্তিজীবন ও ব্যক্তিমন এককভাবে সাহিত্যে তুলে ধরার অন্যতম ধারক হলো কথাসাহিত্য। মানবজীবনের বয়ে চলা ঘটনাপ্রবাহকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এই সাহিত্যশাখার দ্বারাই সম্ভব। তবে কালের প্রবাহে মানবজীবনের চলন, বলন, সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বদল হয়েছে এই সাহিত্যশাখার। কখনো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে সমাজ, কখনোবা ব্যক্তি তার সীমাহীন মর্যাদা নিয়ে ধরা দিয়েছে। এরই মধ্যদিয়ে কথাসাহিত্যিকরা খুঁজে পেয়েছেন সাহিত্যসভায় তাঁদের স্বতন্ত্র আসন। স্বাধীনতা পরবর্তী ছয়ের দশকে এমনি একজন স্বতন্ত্র কথাসাহিত্যিক হলেন দিব্যেন্দু পালিত। যিনি ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও অন্তর্জগতের বিশ্লেষণী ভাবনার দ্বারা তাঁর সাহিত্যকর্মকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দিব্যেন্দু পালিতের জন্ম শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণের স্মৃতিবিজড়িত বিহারের ভাগলপুরে বাংলা ২১ ফাল্গুন, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (৫ মার্চ, ১৯৩৯ সালে)। তাঁর পিতা ছিলেন শ্রী বগলাচরণ পালিত এবং মাতা শ্রীমতী নীহারবালা পালিত। দিব্যেন্দু পালিতরা মোট এগারোজন ভাই বোন ছিলেন— কনকলতা, শুভেন্দু, নমিতা, অমিতা, দিব্যেন্দু, অনিতা, অমলেন্দু, কবিতা, অর্ধেন্দু, পূর্ণেন্দু, নবনীতা। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কল্যাণী পালিত এবং একমাত্র সন্তান অমিতেন্দু পালিত।

দিব্যেন্দু পালিতদের আদি বাসস্থান ছিল বাঁকুড়া জেলার বেতড়ে। তারপর তাঁর পূর্বপুরুষরা ভাগলপুরে উঠে যান। সেখানে তাঁর বাবা খলিফাবাগ বা রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোডের একটি ছাদওয়ালা পাকা বাড়িতে উঠে আসেন। ঐ বাড়িতে বেঙ্গলশেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট-এর অফিস ছিল, তাঁর বাবা ঐ সিণ্ডিকেটের ম্যানেজার ছিলেন। কিছুদিন পর অফিস উঠে যায়। তাঁরা ওখানেই থেকে যান। প্রথম দিকে সচ্ছলভাবে চললেও পরিবারের লোকজন বেশি থাকায় পরবর্তিতে অভাব-অনটন দেখা দেয়। বিশেষকরে যখন তাঁর বাবার ক্যান্সারে অকালপ্রয়াণ ঘটে ১৬ এপ্রিল, ১৯৫৮ সালে। তাঁর বাবার চিকিৎসা করেছিলেন ডাক্তার এবং সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)।

দিব্যেন্দু পালিতের যখন সাত-আট বছর বয়স, সে সময় ভারত স্বাধীন ও ভাগ হয়। সাময়িকভাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। ভাগলপুরেও তার ছায়া পড়েছিল। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহ লেগেই থাকতো। প্রায় প্রত্যেকদিনই সন্ধ্যার পর রাত একটু বাড়লেই চারিদিকে 'বন্দেমাতরম্' আর 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি আকাশ ছেয়ে ফেলত। দিব্যেন্দু পালিতের কথায়—

> "সেই বয়সে দাঙ্গা যে কী, তা বুঝতাম না। কিন্তু সেটা যে ভালো কিছু নয়, তা বুঝতে পেরেছিলাম। আমরা যে-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তার ছাদে উঠে দেখলাম দূরে দূরে লেলিহান আগুনের আভা ছেয়ে ফেলেছে আকাশ।"[১]

আমরা জানি, এই সময় দাঙ্গা ক্রমশ আরো ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল।

এরপর দিব্যেন্দু পালিতরা ভাগলপুরেই গঙ্গার কাছে এক জমিদারের বাড়িতে স্থানান্তরিত হলেন। এই জমিদারের বাড়ির ডাকনাম ছিল 'বড়বাসা'। এর পূর্বে এই জমিদারী এস্টেটের (বড়বাসার) ম্যানেজার ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জায়গায় বসেই তিনি 'পথের পাঁচালী' রচনা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে এই অঞ্চলের অনেক বর্ণনা দিয়েছিলেন। দিব্যেন্দু পালিতরা বড়বাসায় থাকার সময়ও দাঙ্গা থামেনি। এই অঞ্চলটি হিন্দু অধ্যুষিত ছিল। পাশেই ছিল বুঢ়ানাথ মন্দির। ফলে স্থানীয় মুসলমানরা ঐ অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

দিব্যেন্দু পালিত ছোটোবেলায় খুবই দুরন্ত ছিলেন। ভয় বলতে তাঁর কিছুই ছিল না, কৌতূহলও ছিল অদম্য। এই সময় বড়বাসায় হিন্দুরা বসতি স্থাপন করতে শুরু করলে এক বৃদ্ধ মুসলমান নিজের বাপ-মায়ের ভিটে ছেঁড়ে যেতে চায়নি। ফলে হিন্দুরা একরাতে তাকে হত্যা করে। তারপর মৃতদেহটি চটের বস্তায় বন্ধ করে ভোরের দিকে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে থাকে গঙ্গায় ভাসাতে। বস্তার কোণা ধরে উল্লাস করতে করতে চারহত্যাকারী নিয়ে যাচ্ছে আর রক্ত ছিটকে ছিটকে পড়ছে রাস্তায়। খুব ছোটো বেলায় দিব্যেন্দু পালিত এরকম দৃশ্য দেখেন এবং সারাজীবন এই দৃশ্যটি তাঁর কাছে এক ভয়ানক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করেছে।

দিব্যেন্দু পালিত ভাগলপুরের এক প্রাথমিক স্কুলে পড়তেন। পরে স্থানীয় দুর্গাচরণ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৫৩ সালে। এই স্কুলে শরৎচন্দ্রও পড়েছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বই পড়ার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। তিনি আত্মকথায় জানান—

> "ছোটবেলা থেকেই বেশ বই পড়ার ঝোঁক ছিল আমার, নির্বাচনে বাছ-বিচার ছিল না। ... কালানুক্রমিক রচনাপাঠের সুযোগ আমার কোনোদিনই হয়নি। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বেশ কিছু বই পড়ে ওঠার আগেই আমি পড়েছি তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণের রচনা— এমনকি সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষের রচনাও। পড়েছি বইয়ের চেয়ে বেশি পত্রিকা। তখন কলকাতা থেকে ঢের দূর মফস্বলে যে দুটি সাহিত্যের কাগজ মূল্যবান ও সহজলভ্য ছিল, তাঁর একটি 'দেশ', অন্যটি 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়'। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, চতুরঙ্গ ইত্যাদি পত্রিকাগুলিও পাওয়া যেত কখনোসখনো।"[২]

স্কুলের শেষ দিকে দিব্যেন্দু পালিত এই পত্রিকাগুলির প্রতি বেশি আকর্ষিত হয়ে পড়েছিলেন। এছাড়াও স্কুলের হেডমাস্টারমশাই ম্যাট্রিকে ভালো রেজাল্ট করার জন্য তাঁদেরকে ইংরেজি বই পড়তে বাধ্য করতেন। ফলে ঐ সময়ে তাঁর ডিকেন্স, স্কট, জেন অস্টেন, মপাসাঁ প্রমুখের কিছু কিছু বাছাই করা বই পড়ার সুযোগ হয়েছিল। কলেজে ঢুকে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার গ্রাহক হন। স্থানীয় মাড়োয়ারি কলেজ থেকে বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে স্নাতক পাশ করেন এবং শেষে ১৯৬১ সালে বুদ্ধদেব বসুর সাহায্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দিব্যেন্দু পালিতের শিক্ষাগুরুরা ছিলেন— বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, ড. ওয়েনার রেফিল্ড, ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ান, মাদার আঁতোয়ানি, ফাদার ফাঁলো প্রমুখ। যে কোনো সাহিত্য পড়ুয়ার পক্ষে একসঙ্গে এতোজন মনীষী শিক্ষকের সাহচর্য লাভ করা সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার। এঁদের সান্নিধ্যে সাহিত্য বিষয়ে তাঁর বোধবুদ্ধি পরিচ্ছন্ন হয়। শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, এঁদের সংস্পর্শে এসে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর ব্যাপক পরিচয় হয়।

দিব্যেন্দু পালিতের পিতা ১৬ এপ্রিল, ১৯৫৮ সালে হঠাৎ মারা গেলে তিনি চাকরির খোঁজে কলকাতায় আসেন ১ মে, ১৯৫৮ সালে। এতো বড়ো এবং অপরিচিত শহরে তাঁকে

প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিলেন। সে'ই আত্মীয়ের খুব অসুবিধা হয়েছিল বলে দিব্যেন্দু পালিতকে মুখ ফুটে বলেছিলেন। এতে দিব্যেন্দু পালিতের খুব অভিমান হয়েছিল এবং তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন। এরপর শিয়ালদহের কাছাকাছি হায়াৎলেনের বোর্ডিং হাউসে তাঁর এক ভাগলপুরের সহপাঠী থাকতো সেখানে যান। সেই বন্ধু ভাগলপুর থেকে এসে কলকাতায় একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। সেই সহপাঠীও প্রতিদিন নয়, মাঝে মাঝে খেতে বলতেন। সময়টা ছিল ছয়ের দশকের শেষদিকে— ১৯৫৮-৫৯-৬০ সাল। শিয়ালদহ স্টেশনে তখনো উদ্বাস্তুরা গিজগিজ করেছিল। থাকার জায়গা নেই, খাবার জুটত না। এক বেলা খাবার জুটলেও, পরের বেলায় খিদের জ্বালায় ককিয়ে উঠতেন। এভাবে বেশ কয়েকদিন তিনি শিয়ালদহ স্টেশনের বেঞ্চিতে রাত কাটিয়েছিলেন। তিনি 'মর্মকথা'য় জানান—

> "তখন শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুরা থাকতেন। একদিন রাতে আমাকে হাঁটুতে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদতে দেখে এক প্রৌঢ়া এসে হাত রাখলেন পিঠে। দেখি তাঁর হাতে একটি শালপাতায় দুটি রুটি আর কুড়নো তরকারির ঝোল। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'খাও বাছা, দেখে বুঝতে পারি ভদ্দর ঘরের ছেলে। আহা রে বাছা। খেয়ে নে— ।' মানুষের এমন করুণার কণ্ঠস্বর আমি আরও শুনেছি। বেশ কিছুদিন পরে শেয়ালদা স্টেশনে ওই মহিলাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। পাই নি।"[৩]

দিব্যেন্দু পালিতের তখন আঠারো-উনিশ বছর বয়স। এইভাবেই কখনো জোড়াতালি দিয়ে কখনো সোজাসুজি যৌবনের শুরুটা তাঁর কেটেছে। দিব্যেন্দু পালিত তাঁর 'মর্মকথা'য় জানান, এমন জীবন যেন কারো না হয়। এক ধরনের আত্মবিশ্বাসই যৌবনের দুঃখময়, দারিদ্র্যের দিনগুলিতে টলতে দেয়নি তাঁকে। সাহিত্যচর্চা, বহির্জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের নানা টানাপোড়েনের মধ্যেও তাঁকে অচঞ্চল রেখেছে। তাঁর সাহিত্যকে দিয়েছে অভিজ্ঞতা, বৈচিত্র্য, সাহস এবং চেনা থেকে অচেনায় নিরন্তর সন্ধানের পথ।

দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম দিকের কর্মজীবনও সুখের ছিল না। জীবিকার জন্য শুরুতে তিনি গৃহস্থ বাড়িতে জ্বালানি ব্যবহারের সমীক্ষাকর্মীর কাজ করেছিলেন। লেখক তাঁর স্মৃতিকথায় জানান—

"প্রতিদিন সকালে ঠিকানা মিলিয়ে রেস্‌পন্ডেন্টদের বাড়ি যেতাম। তাঁরা কোন ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করেন, কয়লা না কেরোসিন, নাকি গ্যাস, এটাই জানতে হত। কাজটা আমার খুব সুখের মনে হত না। কোনও কোনও রেস্‌পন্ডেন্ট মাঝেমধ্যে কটুকথা শোনাতেও ছাড়েননি। তবে কিছু ভালো লোকও দেখেছি। এইভাবে কলকাতায় আমি বেশকিছু মানুষের সংস্পর্শে এলাম। মানুষের সম্পর্কে মনের মধ্যে একটা ধারণা গড়ে উঠতে থাকল। এই পর্বে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে আমায় লেখাও চালিয়ে যেতে হচ্ছিল।"[৪]

তারপর অডিট ফার্মের দিনমজুরির অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ পান। টাকার বড়ো অভাব ছিল তাঁর। পত্রিকায় লেখালিখির সুবাদে কিছু টাকা পেতেন। 'দেশ' পত্রিকা থেকে পেতেন কুড়ি টাকা আর 'আনন্দবাজার' পত্রিকা থেকে পনের টাকা। ১৯৫৯ সালের শেষ দিকে তিনি স্থির করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হওয়ার টাকা জোগাড় করতে পারেননি। এই সময় নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ— এঁদের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। পরিচয় হয় বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে। তাঁকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে মনস্থির করেন তিনি বুদ্ধদেব বসুর ছাত্র হবেন। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় তিনি ভর্তির টাকা দেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তখন তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধান ছিলেন।

দিব্যেন্দু পালিতের প্রকৃত কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৬১ সালে অধুনালুপ্ত ইংরেজি দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সাব-এডিটরের কাজে যোগদানের মধ্যদিয়ে। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি কল্যাণী পালিতকে বিয়ে করেন। বিয়ের সময় দিব্যেন্দু পালিতের চাকরি চলে যায়। তখনো ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। দিব্যেন্দু পালিতের তরফে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাদের এক পারিবারিক বন্ধু নন্দুদার বাড়িতে। এই নন্দুদাই দিব্যেন্দু পালিতকে একটি অ্যাড-এজেন্সিতে চাকরি জুটিয়ে দেন। কল্যাণী পালিত অবশ্য বিয়ের কয়েকমাস আগে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

এরপর ১৯৬৫ সালে দিব্যেন্দু পালিত যোগ দেন বিপণন ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত পেশায়। সেই সূত্রে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন অ্যাডার্টস্‌ অ্যাডভার্টাইজিং এবং পরে দীর্ঘকাল যুক্ত

ছিলেন ক্লারিয়ন-ম্যাকান, আনন্দবাজার সংস্থা এবং 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সঙ্গে। সেই সঙ্গে 'আজকাল', 'যুগান্তর', 'অমৃতবাজার' পত্রিকাতেও। লেখক বলেন—

> "বিজ্ঞাপন যে জীবিকা হতে পারে সেটা আমি প্রথম বুঝতে পারি ক্লারিয়ন-ম্যাকান অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসেস-এ, সেখানে আমি ছিলাম প্রায় সাত বছর। আনন্দবাজার পত্রিকা তখন নতুন করে ব্যবসা প্রসারের কথা ভাবছে। আমাকে অরূপকুমার সরকার প্রস্তাব দিলেন তাঁদের নতুনভাবে গড়ে ওঠা বিজ্ঞাপন বিভাগে প্রধান হয়ে যোগ দিতে। আমাকে সেখানে আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন বিপণনের সর্বভারতীয় কর্মকাণ্ড দেখতে হত।"[৫]

১৯৮৭ সালে আবার ফিরে আসেন সাংবাদিকতায়— 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর রূপে। যুক্ত হন 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়' বিভাগ এবং সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদনার সঙ্গে। এরপর ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০০২ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত তিনি 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই যে এতোগুলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে লেখক লেখালিখির জগতে লাভবান হয়েছিলেন। কারণ এই জগতে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তা বাস্তবিক অভিনবরূপে সাহিত্যে প্রতিফলন ঘটান। চাকরির শেষ দিকে কিংবা অবসরের শুরুতেই দিব্যেন্দু পালিত সেরিব্রালে অচল হয়ে পড়েন। সেই থেকে আর স্বাভাবিক দিব্যেন্দু পালিতকে পাওয়া যায়নি। এই সময় তাঁর স্ত্রীও আকস্মিক মারা যান। ছেলেও চাকরির সূত্রে দূরে থাকতেন। ফলে দিব্যেন্দু পালিত একা হয়ে যান। এরপর তাঁর লেখালিখি স্তিমিত হয়ে আসে। তিনি ৩ জানুয়ারি, ২০১৯ সালে পরলোক গমন করেন।

ব্যক্তিজীবনে দিব্যেন্দু পালিত স্বাভাবিক, সৎ, কর্তব্যপরায়ণ ও হৃদয়বান এক মানুষ ছিলেন। স্নেহে ও সৌজন্যে অকৃপণ, অকপট; ব্যক্তিগত ও বহির্জীবনে অনেক আঘাত সহ্য করেও তিনি আড়াল করে রাখতেন নিজেকে। কারোর বিপদে সবসময় তিনি পাশে দাঁড়াতেন। খুব কঠোরকর্মাও ছিলেন। কাজ করতে ভালোবাসতেন। বন্ধুবর সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন—

"সে সময় দেখেছি খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে। আমি প্রায়ই বলতাম তুই লেখক, তুই শুধু লিখবি, এত দায়িত্ব নিয়ে মাথা ঘামাস কেন? এসব কাজে ঢিলে দিয়ে শুধু লেখা নিয়ে থাক। কিন্তু শোনেনি। যে দায়িত্ব নিয়েছে সেটা ঠিকমত পালন করতে না পারলে ওর স্বস্তি হত না। তাই লিখতও, আবার লেখার সাথে সাথে অফিসের কাজগুলিকেও সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে করার চেষ্টা করত।"[৬]

দিব্যেন্দু পালিত লেখার পরিশ্রমে কখনো ক্লান্তি বোধ করেননি। অন্য কোনো কাজ না থাকলে পাঠ্যবই থেকে কপি করে ভরিয়ে তুলতেন খাতার পাতা। সাহিত্য চর্চার গোড়ার দিকে ভালোমন্দ না ভেবে এভাবেই প্রয়োজনের তুলনায় বেশি লেখালিখি করেছিলেন।

দিব্যেন্দু পালিত খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর কথায়—

"দিব্যেন্দুর সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে একদম বহির্মুখী নয়। খুবই ইন্ট্রোভার্ট।... তাছাড়া খুবই অনেস্ট। কখনও কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে দেখিনি। আর খুব পাংচুয়াল। যাকে যে সময় দেয় তার নড়চড় করে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজটুকু করার চেষ্টা করে।"[৭]

সাহিত্যের মার্গে দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম প্রবেশটি অনেকটা স্বেচ্ছায় আবার অনেকটা ভবিতব্যও বলা যায়। শৈশবে ভাগলপুরের দুর্গাচরণ হাইস্কুলে পড়াকালীনই তিনি ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত একটি সর্বভারতীয় স্বহস্তে লিখিত গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন। ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তখন খুবই সক্রিয় প্রতিষ্ঠান ছিল। ভাগলপুরে সাহিত্যচর্চার একটা সুন্দর পরিবেশ ছিল। বাংলার সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকলেও বাঙালি সংস্কৃতি থেকে দূরে ছিল না ভাগলপুর। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা এখানে বসে সাহিত্য চর্চা করেছেন। দিব্যেন্দু পালিত তাঁর স্মৃতিকথায় জানান—

"এই ভাগলপুরেই সবচেয়ে বেশি জমিয়ে বসেছিলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—বনফুল।...এই সব নিয়ে সাহিত্যের যে পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তা অল্পবয়সে আমাদেরও প্রভাবিত করে।"[৮]

ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতি বছর বাংলা ভাষায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ নিয়ে সর্বভারতীয় সাহিত্য প্রতিযোগিতার আহ্বান করতো। এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতো কলকাতার 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকায়। তখন লেখক স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়তেন। তিনি হঠাৎ একদিন একটা গল্প পাঠিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতাটির অন্যতম বিচারক ছিলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। আগে থেকেই বনফুলের সঙ্গে দিব্যেন্দু পালিতের পরিচয় থাকলেও বনফুল জানতেন না এই গল্পটি দিব্যেন্দু পালিতের লেখা। পুরস্কার প্রদানের দিন বনফুল জানতে পারেন গল্পটির লেখক দিব্যেন্দু পালিত। তারপর তিনি দিব্যেন্দু পালিতকে লেখা চালিয়ে যেতে বলেন। এই সময় পুরস্কার হিসেবে অনেকগুলি বই উপহার পেয়েছিলেন লেখক। একটি বইয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের সুপণ্ডিত ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখে দিয়েছিলেন—

"তোমার সাহিত্যপ্রীতি আমাকে করেছে মুগ্ধ ভাই।
সাধনায় সিদ্ধ হও, তোমারে আশিস দিয়া যাই।।"[৯]

দিব্যেন্দুর কথায়, "তখন থেকেই আমি পড়াশুনার চেয়ে লেখার দিকে বেশি মনোযোগ দিই।"[১০]

দিব্যেন্দু পালিতের বই পড়ার আগ্রহ হয়েছিল তাঁর মায়ের জন্য। তাঁর মা নিয়মিত গল্প-উপন্যাস পড়তেন। তিনি মর্মকথায় জানান—

> "ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে আমি মায়ের জন্য বই আনতাম। মা খুব পড়তেন আর কি! আর সেই বইয়ের কিছুটা আমিও পড়ে ফেলতাম। সুযোগ পেলেই লুকিয়ে পাঠ্য বইয়ের আড়ালে রেখে পড়ে নিতাম। কোনও লেখা ভাল লাগলে বা কোনও একটা প্যারাগ্রাফ ভাল লাগলে, সেটা খাতায় টুকতাম এবং সেদিকে তাকিয়ে ভাবতাম যে আমি যদি কোনওদিন লেখক হই আমার পাণ্ডুলিপির চেহারাটাও এরকমই হবে। অক্ষরের প্রতি, শব্দের প্রতি একটা আগ্রহ, সেটা এইভাবে তৈরী হচ্ছিল।"[১১]

অর্থাৎ লেখক হওয়ার স্বপ্ন দিব্যেন্দু পালিতের কৈশোরেই তৈরী হয়েছিল। তিনি প্রায় একা একা সাহিত্যের নিভৃত চর্চা করতেন। তিনি বলেন, স্কুল থেকে কলেজে পড়বার সময়

সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে অনেকটা পরিচয় হয় তাঁর। সেই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের লেখা কিছু কিছু পড়েন। বেশি করে পড়েন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সতীনাথ ভাদুড়ী, এমনকি বুদ্ধদেব বসুর লেখা। সেই সময়ই পড়েন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, সমরেশ বসুর লেখাও। নিয়মিত পড়তেন 'দেশ', 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়', 'বসুমতী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'পরিচয়', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি।

দিব্যেন্দু পালিতের পারিবারিক পরিবেশে লেখালিখির চর্চা ছিল না। তাঁর দাদা অল্পবিস্তর লিখতেন। কিন্তু চর্চার অভাবে লেখা ছেড়ে দেন। লেখক জানান, "আমার লেখালিখির ব্যাপারটা আমার বাবা, মা, দাদা সকলেই লক্ষ করেছিলেন। তাঁরা সাহিত্য ভাবনায় ভাবিত না হলেও আমাকে উৎসাহ দিতেন।"[১২] এই সময় দিব্যেন্দু পালিত আর তাঁর বন্ধুরা ভাগলপুরে 'প্রগতি সংঘ' নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে সহপাঠী বন্ধুরা মিলে নিজেদের লেখা পড়তেন এবং সাহিত্যচর্চা করতেন।

স্কুলে পড়ার সময় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা উপলক্ষে দু'একটি গদ্য লিখেছিলেন তিনি। সেগুলির সবই বিষয়-নির্ভর হালকা রচনা। দু-একটি পুরস্কারও পেয়েছিলেন। পাটনার কোনো এক সংস্থা দ্বারা আয়োজিত স্কুলের ছাত্রদের জন্য এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তিনি দ্বিতীয় হয়েছিলেন। কাগজে এই প্রথম তাঁর নাম ছাপা হয়। তাঁর এই সাফল্যে মাস্টারমশাইরা ক্ষুদ্র কৃতিত্বেও অসামান্য গর্ব বোধ করেছিলেন। দিব্যেন্দু পালিত বলেন—

> "প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে এঁদের উৎসাহ শৈশবেই আমাকে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগী করে তুলেছিল।"[১৩]

দিব্যেন্দু পালিতের পাকাপাকিভাবে লেখালিখির জগতে প্রবেশ ১৯৫৫ সালে। তখনো তাঁর বয়স ষোলো বছর অতিক্রম হয়নি। তিনি ভাগলপুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সহপাঠী বন্ধু রণজিৎ মিত্রকে একটা গল্প পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন তিনি। রণজিৎ বলেছিলেন, গল্পটা আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে পাঠাতে। রণজিতের পরামর্শেই দিব্যেন্দু পালিত প্রথম গল্প 'ছন্দপতন' আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে পাঠিয়েছিলেন। এর এক-দেড় মাসের মধ্যে তা প্রকাশিত হয় (১৯৫৫ সালের ৩০ জানুয়ারি 'আনন্দবাজার' পত্রিকার

‘রবিবাসরীয়’তে)। এটিই দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম লেখা। তারপরের বছরেই ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতরে দিব্যেন্দু পালিত আর একটি গল্প পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু গল্পটি ফেরত আসে। তখন ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিমল কর। তিনি গল্পটির পাণ্ডুলিপি কিছুটা সংশোধন করে দিব্যেন্দু পালিতকে পাঠিয়ে দিয়ে চিঠিতে জানান— “গল্পটি পরিমার্জনা করে পাঠান, নতুবা নতুন গল্প পাঠান। আপনার আশা নিশ্চয়ই পূরণ হবে।”[১৪] দিব্যেন্দু পালিত নতুন গল্প পাঠাননি। পুরনো গল্পটাই ঘষামাজা করে পাঠিয়েছিলেন। এর মাস খানেকের মধ্যেই গল্পটি ছাপা হয়। গল্পটির নাম ‘নিয়ম’। গল্পটি ১৯৫৬ সালে সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময়েই ১৯৫৫-১৯৫৬ সালে দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম কবিতা ‘তোমার ভালোবাসা’ ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ দিব্যেন্দু পালিত ছোটোগল্প এবং কবিতা একই সময়ে লেখা শুরু করেছিলেন। তবে দিব্যেন্দু পালিতের কিছু কিছু গল্প স্নাতকোত্তর হওয়ার আগেই প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়— এগুলির সবই তিনি ভাগলপুর থেকে ডাকে পাঠিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় সেগুলির খোঁজ পাওয়া যায়নি। দিব্যেন্দু পালিত তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন—

> “লেখার জন্য অনেক লড়াই করতে হয়েছে। ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অপেক্ষাও করতে হয়েছে। আমার প্রথম মুদ্রিত গল্প পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হল এবং আনন্দবাজারের মত কাগজে এবং পরের বছর দেশের মত পত্রিকায়, এতে যেন কেউ না মনে করেন যে আমি যা পাঠিয়েছি তাই ছাপা হয়েছে। তা কিন্তু হয়নি। আমার বেশ কিছু গল্প অমনোনীত হয়ে ফেরত এসেছে যে কোনও কারণেই হোক। আমি ধরেই নিতাম যে গল্প পছন্দ হবে না, প্রত্যাখ্যাত হবে; আবার কোনও কোনও গল্প ছাপা হতেও পারে। এটুকু বুঝতাম যে ছাপা হচ্ছে যখন, তখন আমি বোধহয় লিখতে পারি এবং আমার লেখার ওপর এঁদের একটা— মানে যাঁরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না, তাঁদেরও আস্থা আসছে।”[১৫]

১৯৫৮ সালে মে মাসে কলকাতায় পাকাপাকিভাবে আসার পর আরো নিয়মিত হয় দিব্যেন্দু পালিতের লেখা। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প-সঙ্কলন গ্রন্থ ‘শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি’। তখন তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হলো— ‘মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ’ (১৯৭৩), ‘মূকাভিনয়’ (১৯৮২)

‘শুক্রে শনি’ (১৯৮৪), ‘আলমের নিজের বাড়ি’ (১৯৮৪), ‘রজত জয়ন্তী’ (১৯৯২) ‘হিন্দু’ (১৯৯৪) ইত্যাদি।

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা ‘কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান’ গ্রন্থে বলেন—

> “আমার প্রথম প্রকাশিত বা প্রথম দিকে প্রকাশিত রচনার সঙ্গে কোনো পরিশীলিত মন ও পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির সম্পর্ক ছিল বলে মনে করি না। তাদের পিছনে যতো আবেগ সবই ছিল কৈশোরক, এক ধরনের শখ থেকে উদ্ভূত।”[১৬]

এই কারণেই সম্ভবত ১৯৫৫ সাল থেকে প্রথম দশ-এগারো বছরে লেখা ‘ছন্দ-পতন’, ‘নিয়ম’, ‘অন্ধকার পেরিয়ে’, ‘মায়াতরু’ প্রভৃতি আরো কয়েকটি গল্প দিব্যেন্দু পালিতের কোনো গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। গল্পগুলির সার্থকতা সম্পর্কে লেখকের সন্দেহই মূল কারণ। তিনি স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

> “বিষয় ও বক্তব্যের মিল না থাকলেও ‘নিয়ম’ গল্পটির ভাষাবিন্যাসে সুবোধ ঘোষের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। সত্যি বলতে, প্রায় প্রস্তুতিহীনভাবে যখন আমি হঠাৎ লেখা শুরু করি, গোড়ার দিকের সেইসব রচনায় শুধু সুবোধ ঘোষ কেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রভাবও কম ছিল না; পরবর্তীকালে প্রায় এককভাবে যে-প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বিমল কর। এর কারণ কি অভিজ্ঞতার অভাব? হয়তো। মাটি কাঁচা থাকলে তাকে যে-কোনো ছাঁচেই ঢালা যায়। এই সব লেখকরা যে সেই সময় আমার ভাষার ওপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং সহজেই, তাঁর কারণ একটিই : তখন আমি ছিলাম নিতান্তই লিখিয়ে, মন ছিল অপরিণত, নিজস্ব অভিজ্ঞতা-নির্ভর সত্তা বলে কিছু গড়ে ওঠেনি; যে কোনো ভালো লাগাকেই গ্রহণ করেছি নিজের মতো করে।”[১৭]

এই বক্তব্যের জের টেনে পরে আরো বলেন, “খুব কম লেখকই আছেন যাঁরা সাহিত্যজীবনের সূচনায় কোনো-না-কোনো প্রভাব ছাড়াই উপস্থিত করেন নিজেকে। কিন্তু, অভীপ্সা সৎ হলে একদিন-না-একদিন তাঁকে ভাবতেই হয় পরিবর্তনের কথা, নিজস্ব উপলব্ধির কথা। এই ভাবনার সময়টা সোজা সিঁড়ি ওঠার মতোই দুরূহ— এই পর্বে এসে

হাল ছেড়ে দেন বা হাঁপিয়ে ওঠেন এমন লেখকের সংখ্যাও অনেক। আমার সান্ত্বনা, আমি হাল ছাড়িনি; অন্যের ব্যবহৃত পোশাক ছেড়ে নিজের পোশাকটি চিনে নেবার জন্যে চেষ্টা করেছি প্রাণপণ।"[১৮]

এরই ফলে সূচনার দিন থেকে যা তিনি লিখেছেন সেগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন— ১৯৬৪-৬৫ সালের আগে এবং ঐ সময়ের পরে। ভালো হোক বা মন্দ হোক, দ্বিতীয় পর্বের রচনাগুলি একান্তভাবেই ছিল— 'পরিবর্তনের চিহ্নবাহক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কোনো'।[১৯] লেখালিখির শুরু থেকে ১৯৬৪-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত রচনার মধ্যেই আছে 'মাছ', 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি', 'প্রতিনায়ক', 'দুঃসময়', 'সিতাংশু', 'চিলেকোঠা' প্রভৃতি প্রশংসিত রচনা। দেখা যায়, ১৯৬০ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত আধুনিক বাংলা ছোটোগল্পের নির্বাচিত সংকলন 'সিন্ধুর স্বাদ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর গল্প। তাঁর 'প্রতিনায়ক' গল্পটিকে সন্তোষকুমার ঘোষ জাত লেখকের লেখা বলে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। এবং প্রায় পঁচিশ বছর পর এই সময়ের দুটি গল্প নিয়ে পর পর দুটি ছবি করেছেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত— 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি' এবং 'মাছ' গল্প অবলম্বনে 'গৃহযুদ্ধ'।

দিব্যেন্দু পালিতের ছোটোগল্পের খ্যাতি ও সমাদর প্রসঙ্গে সমালোচক পবিত্র সরকার বলেন— "দিব্যেন্দু পালিত নাগরিক মধ্যবিত্ত (নিম্নমধ্যবিত্ত সুদ্ধ) জীবনের, এই শ্রেণীর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের, এমন সব গলিঘুঁজির সন্ধান রাখেন, এমন দুর্লভ নজর ও তীক্ষ্ণ সংবেদনে সেগুলিকে আমাদের গোচরে আনেন যে, অন্য জনপ্রিয় লেখকদের অনেকের লেখায় তা আমরা সচরাচর পাই না।"[২০] কখনো গভীর, কখনো আপাত-তুচ্ছ ঘটনা— যে কোনো বিষয়ই তাঁর ছোটোগল্পে অপ্রত্যাশিত ও ভিন্নতর তাৎপর্যে দেখা দিতে থাকে। 'শোকসভা', 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ', 'মহাদশায়', 'দাঁত', 'মানুষের মুখ', 'ট্রেসপাসার্স', 'মাড়িয়ে যাওয়া', 'একটি মন্দিরের জন্ম ও মৃত্যু', 'গন্ধের আবির্ভাব', 'মূকাভিনয়', 'সীমানা', 'অবসর', 'খেলা', 'ছাগল বিষয়ে দু-চার কথা' প্রভৃতি ছোটোগল্পগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে ও তাৎপর্যে এক নতুনত্বের স্বাদ এনেছিল। এই সব গল্পের আবার অনেকগুলিই ভারতীয় ভাষায় ও ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে এবং প্রকাশিত হয়েছে 'দি ইলাস্ট্রেটেড উইকলি', 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' প্রভৃতি অন্যান্য পত্রিকায়।

১৯৫৫-৫৬ সালে 'দেশ' পত্রিকায় দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম কবিতা 'তোমার ভালোবাসা' প্রকাশিত হলেও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় অনেক পরে। ১৯৭০ সালে প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাজার বাড়ি অনেক দূরে'। এরপর 'আহত অর্জুন' (১৯৭০), 'কিছু স্মৃতি, কিছু অপমান' (১৯৭৬), 'শব্দ চাই, দাও' (১৯৮১), 'নির্বাসন, নয় নির্বাচন' (১৯৮৬), 'বড় ছেলে ছোট ছেলে' (১৯৯৩) 'অমৃত হরিণ' (১৯৯৭), 'স্মৃতির মতন কিছু' (২০০১), 'সতর্কবার্তা' (২০০৩) প্রভৃতি। দিব্যেন্দু পালিত নাগরিক জীবন নিয়েই কবিতা লিখেছেন। নগরজীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-আনন্দ, নানা সমস্যায় দীর্ণবিদীর্ণ ছিন্নভিন্ন মানুষের কথা তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়। জীবনানন্দের কবিতায় যে বিস্ময়বোধ ফুটে উঠেছিল দিব্যেন্দু পালিত সেই বিস্ময়বোধকে তুলে ধরেছেন। তিনি স্বীকারও করেছেন জীবনানন্দ তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন। জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় বিস্ময়বোধ বিপন্ন হয়ে যাবার কষ্টে মানুষটি আত্মহননের পথ বেছে নেয়। দিব্যেন্দু পালিতও লেখেন—

"রাস্তার দু'ধার জুড়ে মাল্যবান—
অথচ মানুষ কতো একা!
মানুষের ভিতর মানুষ
ঘুমের ভিতর স্বপ্ন; না-পাওয়া সমস্ত সুখ ঢেলে দেয় তৎপর আবেগে— "[২১]

কিংবা,

"স্বপ্নের ভিতর কিংবা মৃত্যুর ভিতর কিংবা
জাগরণে, সূর্যের ভিতর
একাকী, নিঃসঙ্গ, এই আত্মঘাতী শোকের ভিতর।"[২২]

এইরকম একাকীত্ব, দুঃখহীনতা, বিস্ময়হীনতা, অসারতা আধুনিক মানুষের ধূসর মুখচ্ছবি সারি সারি ধরা পড়েছে দিব্যেন্দু পালিতের কবিতায়।

সারাজীবন সুদক্ষ সাংবাদিক থাকার ফলে এক ধরনের সাংবাদিক সত্তাও তাঁর কবি সত্তার সঙ্গে মিশে গেছে। 'কালো বৃষ্টি' কবিতায় লেখেন—

"পোখরান বাস্তব হলে নিশ্চিত অনেকে মারা যাবে
পরমাণু শব্দে খুব জোর আছে, বিস্ফোরণে আরও,
সুতরাং রাজনীতি প্রতিবাদ বুদ্ধিজীবী সভা আয়োজন
পোখরান বিষয়ে কিছু শব্দ লেখো যত দ্রুত পারো,
ইস্যুটা গরম থাকতে হোক তাঁর ব্যাপ্ত বিপণন;
বিষয় বিবেক— যারা বিবেকি তারাই এটা খাবে।"[২৩]

দিব্যেন্দু পালিতের কবিতাগুলিতে আছে সামান্য ব্যঙ্গ, মৃদু শ্লেষ এবং বিভিন্ন তির্যক বুদ্ধির অভিক্ষেপ। আগাগোড়া পরিণত, পরিমিত এবং প্রজ্ঞাবান এক বোধই তাঁর কবিতায় কাজ করে গেছে।

দিব্যেন্দু পালিতের উল্লেখযোগ্য পরিচয় ঔপন্যাসিক হিসাবে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে আভেনীর প্রকাশনী থেকে। তিনি বলেন এর রচনাকাল ১৯৫৬ সালের দিকে। মাঝখানের তিন বছর তিনি উপন্যাসটিতে অনেক পরিমার্জনা ও সংশোধন করেন। উপন্যাসটি সম্পর্কে তিনি জানান—

"খুব কাঁচা লেখা। ...খারাপ লেখার যদি কোনও বহ্নি-উৎসব হয়, তাহলে আমার ওই লেখাটি প্রথম সে আগুনে নিক্ষেপ করা উচিত।"[২৪]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র হওয়ায় দিব্যেন্দু পালিতের যেমন গর্ব হয়েছিল, তেমনি পরবর্তীকালে একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এখানে পড়তে এসে তাঁর মনে হয়েছিল—

"চোখের ও মনের সামনে সাহিত্যের জানালা-দরজা খুলে যাচ্ছে। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে আমার এই যে পরিচয় হল তা আমার পরবর্তী লেখা এবং মানসিক গঠনে অনেক সাহায্য করেছিল। আমি সাহিত্য সম্পর্কে নতুনতর বোধে উত্তীর্ণ হই। আমার লেখালেখিও পাল্টাতে থাকে যত আমি বিশ্বসাহিত্যের পাতা ওলটাতে থাকি।"[২৫]

এই সময় সাহিত্যে নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছিল। দিব্যেন্দু পালিতও এই সাহিত্য আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। বয়সের পার্থক্য থাকলেও তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে

ছিলেন মতি নন্দী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। বিমল কর এঁদের নিয়ে শুরু করেছিলেন 'ছোটগল্প-নতুনরীতি' আন্দোলন। বিমল কর তখন 'দেশ' পত্রিকার গল্প বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। গল্পে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাতেও নতুনত্ব আসে। নতুনত্বের এই ঝোঁক সৃষ্টি করেছিলেন 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর কবিরা। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ।

এই সময় সাহিত্যিক ও শিক্ষাগুরু বুদ্ধদেব বসু কোনো এক প্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলেন সাহিত্যিক হতে গেলে 'কল্পনা শক্তি, কাহিনি বয়নের ক্ষমতা, চরিত্র-নির্মাণ ও সংলাপ-রচনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে যে কেউ একটু চেষ্টা করলেই লেখক হতে পারেন। তবে 'সাহিত্যিক' হতে গেলে দ্রষ্টা হতে হয়। সেই থেকে দিব্যেন্দু পালিত কথাগুলি মননে গেঁথে নিয়ে সাহিত্য রচনায় বেশি করে আকৃষ্ট হন এবং নিজেকে 'সাহিত্যিক' আখ্যা দিতে পছন্দ করতেন।

১৯৬৫ সালে দিব্যেন্দু পালিতের পেশা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেখার মধ্যেও পরিবর্তন আসে। বিশেষকরে ছোটোগল্প রচনার ভঙ্গি ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ধরন বদলে গেছে। উপন্যাসে এই পরিবর্তন এসেছে ১৯৭১ সালে 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের মধ্যদিয়ে। তাঁর লেখার যে বৈশিষ্ট্য এক ধরনের ধারালো ভাব, ভাষায় মেদহীনতা, ঋজু এক ধরনের আত্মস্থভাব চলে এসেছিল। আসলে ১৯৬৫ সালের পর থেকে তিনি অনেক বেশি সময় ও সমাজ সচেতন হয়ে ওঠেন।

দিব্যেন্দু পালিতের সামগ্রিক সত্তার সঙ্গে মিশে আছে সাংবাদিক সত্তাও। সারাজীবন সুদক্ষ এবং বুদ্ধিদীপ্ত সাংবাদিকতা করে গিয়েছিলেন তিনি। কবিতা, গল্প, উপন্যাসে তাঁর সাংবাদিক সত্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাই তাঁর সাংবাদিক জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে। 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ', 'অন্তর্ধান', 'অনুভব' প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর সাংবাদিক সত্তার প্রকাশ ঘটেছে। এই উপন্যাসগুলিতে তিনি সংবাদপত্রের খবর যেমন হুবহু ব্যবহার করেছেন, তেমনি আবার প্রয়োজনে কাহিনি, চরিত্রের অদলবদল করেছেন। যেমন 'অনুভব' উপন্যাসের শেষে বলেছেন—

"এই উপন্যাসে বিভিন্ন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, গ্রন্থ এবং নমুনা-সমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু তথ্য কাহিনীর প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা হয়েছে।"[২৬]

উপরিউক্ত উপন্যাসগুলিতে তিনি মেয়েদের কিডন্যাপ, ধর্ষণ, খুন ('অন্তর্ধান', 'অনুসরণ'), কলগার্ল বা বেশ্যাপল্লীর মেয়েদের জীবনযাত্রা ('অনুভব'), বিজ্ঞাপন জগতের প্রসঙ্গ ('সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ') প্রভৃতি সাম্প্রতিক বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন। সংবাদপত্রের রিপোর্টের আকারে অনেক সময় উপন্যাসের গঠনও নির্মাণ করেছেন। বিজ্ঞাপন, বিপণন ও জনসংযোগ— এই নতুন জগৎটি দিব্যেন্দু পালিতই সাধারণের কাছে সর্বপ্রথম উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। কথাসাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত এবং কবি দিব্যেন্দু পালিত— এই দুইয়ের সমন্বয়ে স্রষ্টা দিব্যেন্দু পালিতের সামগ্রিক সত্তা গড়ে উঠেছে। বিশেষকরে ছোটোগল্প এবং কবিতায় এর মিল বেশি। উপন্যাসেও কম নয়। দিব্যেন্দু পালিত মর্মকথায় বলেন, "দু'জনের মধ্যেই বিরোধ এত প্রবল যা অনুভব করলে আমি বিষণ্ণ হয়ে পড়ি।"[২৭]

প্রাবন্ধিক হিসাবেও দিব্যেন্দু পালিত পরিচিত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ হলো— 'প্রেমপত্র' (১৯৭১), 'সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' (১৯৯১), 'রোম আর রম্য' (১৯৯৫), 'সিনেমা থিয়েটার' (২০০২)। 'প্রেমপত্র' দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ফসল। প্রথম জীবনের যে ব্যক্তিগত নানা ঘটনা মনের নিভৃতে ভেবেছিলেন তারই নীরব উচ্চারণ এখানে ফুটে উঠেছে। সাহিত্য সমালোচক হিসাবে দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠত্ব ধরা পড়ে 'সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। 'অদ্বিতীয় প্রেমেন্দ্র মিত্র', বুদ্ধদেব বসুর ওপর 'স্যার', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ওপর 'দেহমনের বৈতালিক', সমরেশ বসুর উপর 'এক ধরনের আশ্রয়', 'অসীম রায়', 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা', 'অরুণকুমার সরকারের কবিতা', 'নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা', 'প্রেমের কবিতা', 'বাংলা কবিতা ও কৃত্তিবাস', 'বুদ্ধিজীবী,' 'বড্ডবেশি বাঙালি', 'পুজো সংখ্যা', 'বইমেলার সংস্কৃতি' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে তিনি বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে সাহিত্যের দুর্লভ আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র হওয়ায় প্রবন্ধগুলিতে তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। যেমন, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দ্বীপপুঞ্জে'র সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র তুলনামূলক আলোচনায়

সাহিত্যবোধের সঙ্গে সমাজচেতনার সুষ্ঠু সমন্বয় দেখিয়েছেন। স্মৃতিকথামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন 'আমার সময় এবং আমরা', 'কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান' প্রভৃতি।

১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ভালোলাগা সিনেমাগুলির তিনি সাময়িক বা দৈনিক পত্রিকার জন্য রিভিউ হিসেবে লিখেছিলেন। সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও অনেকটা জীবিকার প্রয়োজনে এই প্রবন্ধগুলি তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু এর পিছনে তাঁর অন্য এক ব্যক্তিত্ব সক্রিয় ছিল। প্রথম পাঠের সময় সিনেমা রিভিউ মনে হলেও সব প্রবন্ধগুলি একত্রে পড়লে বোঝা যায় তিনি এক অতিরিক্ত কিছু সাহিত্যের শাখায় যোগ করতে চান। 'সিনেমায় কলকাতা', 'দেশবিভাগ : চলচ্চিত্রে', 'ফিলমোৎসব-১৯৯০', 'থিয়েটার আরও এগোবে' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি পড়লে বোঝা যায় সিনেমা-থিয়েটার শিল্পের প্রকরণ ও শৈলীনির্মাণের বিশিষ্টতা।

রচনার রম্যতা, অভিজ্ঞতার অভিনবত্ব এবং সংবাদের সংগ্রহ— এই তিনের সমন্বয়ে 'রোম আর রম্য' রচনাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। 'লর্ডস আর কমন্স', 'হায় নববর্ষ', 'হারানো পায়ের স্মৃতি', 'শৈশব থেকে শৈশবে' প্রভৃতি রচনাগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে বিষণ্ণতা। ভ্রমণ পিপাসু মন আর সাংবাদিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ফুটে উঠে 'শরীরে মিললেও মনে মেলেনি' প্রবন্ধে।

দিব্যেন্দু পালিত 'শতবর্ষে চলচ্চিত্র' (দুই খণ্ড- ১৯৯৬, ১৯৯৮) নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনাও করেন নির্মাল্য আচার্য্যের সঙ্গে। চলচ্চিত্র যে একটি শক্তিশালী মাধ্যম, এটা দিব্যেন্দু পালিত বিশ্বাস করেছিলেন। এই বইটি সম্পাদনার আগেই নির্মাল্য আচার্য্যের ক্যান্সারে মৃত্যু হয়। ফলে সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁর একার কাঁধেই পড়ে। এই সময় সিনেমার সঙ্গে দিব্যেন্দু পালিতের একটা যোগসূত্র হয়ে যায়। তিনি যখন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন, তখন তিনি সিনেমা সংক্রান্ত বিষয়েরই সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু তিনি মৌলিক চিত্রনাট্য কখনো লেখেননি। এমনকি লেখার চেষ্টাও করেননি। তবে দিব্যেন্দু পালিতের গল্প-উপন্যাস নিয়ে একাধিক চলচ্চিত্র হয়েছে।

দিব্যেন্দু পালিত নাটক লেখেননি। কিন্তু নাটক আলোচক হিসাবে তাঁর সুপরিচিতি আছে। 'মৌনমুখর' উপন্যাসে তাঁর প্রতিফলন দেখা যায়। এই উপন্যাসে একটি মেয়ের নাটকের প্রতি ভালোবাসা ও নাটককে আঁকড়ে ধরে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা প্রকাশ পেয়েছে।

স্টার থিয়েটার ভেঙে গ্রুপ থিয়েটারের জনপ্রিয়তার কারণও দেখান দিব্যেন্দু পালিত। ব্যক্তিজীবনেও তিনি নাটকের প্রতি ভালোবাসার কথা জানান। তাঁর অভিনয় করারও খুব সখ ছিল। তিনি স্মৃতিকথায় জানান, "স্কুলে ও কলেজে পড়ার সময় আমার নাটক ও অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল।"[২৮] নাটক না লিখলেও পরবর্তীতে তিনি নাট্য-সমালোচনা করিয়ে নিতেন। 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়'তে পবিত্র সরকারকে দিয়ে নাট্য-সমালোচনা করিয়ে নিতেন। পবিত্র সরকার এ প্রসঙ্গে বলেন—

> "দিব্যেন্দুদা আমাকে দিয়ে অনেকগুলো নাট্য-সমালোচনা করিয়ে নিয়েছিলেন।...যেন আমি আনন্দবাজারের নাট্য-সমালোচক। প্রতি সপ্তাহেই আমার নাটকের সমালোচনা বেরোত।...বাংলায় গ্রুপ থিয়েটারে যত নাটক হয়, প্রথমদিকের দর্শকদের মধ্যে উনি একজন।...নাটক শেষ হবার পরে বসে নাটকের ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন।...দিব্যেন্দুদা নিজে নাট্য-সমালোচনা বেশি করেন না।...কিন্তু ঐদিকে থাকলেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক হতে পারতেন।"[২৯]

দিব্যেন্দু পালিত ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার এবং প্রাবন্ধিক। আবার ব্যক্তিগত জীবনে দীর্ঘকাল সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এবং নমুনা-সমীক্ষায় প্রাপ্ত অনেক ছোটো-বড়ো ঘটনা তাঁর গল্প-উপন্যাস-কবিতায় উঠে এসেছে। দিব্যেন্দু পালিত বেশ কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণও করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ তাঁর রচনায় আন্তর্জাতিকতাও স্থান পেয়েছে। প্রথম দিকের লেখায় তিনি সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বিমল কর প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ফরাসি সাহিত্যিক আলব্যের কাম্যুর দ্বারা প্রভাবিত হন। নিজের স্বীকারোক্তিতে তিনি বলেছেন—

> "বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি দস্তয়েভস্কি, কামু, কাফ্‌কা এবং আরও অনেকের রচনার সান্নিধ্যে আসি। কামু আমার খুব প্রিয় লেখক এবং তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাই তন্নতন্ন করে পড়েছি, রচনার ওপর প্রভাব এমনি আসে না, যদি না কোনও লেখককে মনেপ্রাণে বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে গ্রহণ করা যায়। কামুকে যথা সম্ভব সেইভাবে গ্রহণ করেছিলাম।"[৩০]

কাম্যুর উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধের মতোই তাঁর রচনা পরিপাঠ্য। তারপর ধীরে ধীরে তিনি নিজের চিন্তা-ভাবনায়, বুদ্ধিমত্তায় এবং সংযমশীলতায় নিজ লেখনির বৈশিষ্ট্যে বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী করে নিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১১৮

২. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ৯৭

৩. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১২২

৪. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১২

৫. তদেব : পৃ. ২৪

৬. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১৭

৭. তদেব : পৃ. ৬৯-৭০

৮. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১০

৯. তদেব : পৃ. ১০

১০. তদেব : পৃ. ১১

১১. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১২১

১২. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৩

১৩. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ৯৮

১৪. তদেব : পৃ. ৯৯

১৫. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১২১

১৬. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ৯৯

১৭. তদেব : পৃ. ৯৯-১০০

১৮. তদেব : পৃ. ১০০

১৯. তদেব : পৃ. ১০০

২০. সরকার, পবিত্র : মধ্যবিত্ততার মহাকাব্য, আজকাল, কলকাতা, ৩ জুলাই, ১৯৯৫, পৃ. ৫

২১. পালিত, দিব্যেন্দু : দেখা হয়ে যায়, দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ৩৭

২২. পালিত, দিব্যেন্দু : অপেক্ষা, দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ২৩

২৩. পালিত, দিব্যেন্দু : কালো বৃষ্টি, দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ১৬৭

২৪. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১০

২৫. তদেব : পৃ. ১৫

২৬. পালিত, দিব্যেন্দু : অনুভব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ১২৭

২৭. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৫

২৮. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ৯৯

২৯. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ২০

৩০. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের পর্ববিভাগ ও বিষয়বৈচিত্র্য

রচনার উৎকর্ষ বিচারে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসগুলিকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটি পর্বের উপন্যাসগুলিকে কালানুক্রমিক উল্লেখ করা হলো—

ক. প্রথম পর্ব ['সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯) থেকে 'প্রণয়চিহ্ন' (১৯৭১)] :

'সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯), 'সেদিন চৈত্রমাস' (১৯৬১), 'ভেবেছিলাম' (১৯৬৪), 'মধ্যরাত' (১৯৬৭) এবং 'প্রণয়চিহ্ন' (১৯৭১)।

খ. দ্বিতীয় পর্ব ['সন্ধিক্ষণ' (১৯৭১) থেকে 'সবুজ গন্ধ' (১৯৮২)] :

'সন্ধিক্ষণ' (১৯৭১), 'সম্পর্ক' (১৯৭২), 'আমরা' (১৯৭৩), 'বৃষ্টির পরে' (১৯৭৪), 'বিনিদ্র' (১৯৭৬), 'চরিত্র' (১৯৭৬), 'একা' (১৯৭৭), 'উড়োচিঠি' (১৯৭৮), 'অহংকার' (১৯৭৯) এবং 'সবুজ গন্ধ' (১৯৮২)।

গ. তৃতীয় পর্ব ['সহযোদ্ধা' (১৯৮৪) থেকে **'গৃহবন্দী' (১৯৯১)] :**

'সহযোদ্ধা' (১৯৮৪), 'ঘরবাড়ি' (১৯৮৪), 'আড়াল' (১৯৮৬), 'সোনালী জীবন' (১৯৮৬), 'ঢেউ' (১৯৮৭) 'স্বপ্নের ভিতর' (১৯৮৮), 'মাইন নদীর জল' (১৯৮৮), 'অন্তর্ধান' (১৯৮৯), 'অবৈধ' (১৯৮৯), 'সিনেমায় যেমন হয়' (১৯৯০), 'অনুসরণ' (১৯৯০) এবং 'গৃহবন্দী' (১৯৯১)।

ঘ. চতুর্থ পর্ব ['সংঘাত' (১৯৯২) থেকে 'একদিন সারাদিন' (২০০৩)] :

'সংঘাত' (১৯৯২), 'ভোরের আড়াল' (১৯৯৩), 'অনুভব' (১৯৯৪), 'অচেনা আবেগ' (১৯৯৫), 'সেকেন্ড হনিমুন' (১৯৯৭), 'মৌনমুখর' (১৯৯৮), 'মাত্র কয়েকদিন' (১৯৯৮), 'যখন বৃষ্টি' (১৯৯৯), 'হঠাৎ একদিন' (২০০০), 'সোহিনী এখন কোথায়' (২০০০), 'বহুদূর অভিমান' (২০০২) এবং 'একদিন সারাদিন' (২০০৩)।

বিষয়-ভাবনার বৈচিত্র্যে দিব্যেন্দু পালিত এক একক ধারার শিল্পী। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন উপন্যাসের কাহিনি-পরিকল্পনায় তিনি সব সময় নতুন অভিজ্ঞতা যুক্ত করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু

বারোয়াঁ'র বিষয়বস্তুতে উঠে এসেছে ত্রিকোণ প্রেমের আবহ। কলেজ পড়ুয়া অরুন্ধতী বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে বেশি দিন থাকতে পারেনি। পাড়ার বখাটে যুবক সুনীলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কারণে তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। দ্বিতীয় উপন্যাস 'সেদিন চৈত্রমাস'-এ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এষা সহপাঠী অমলেন্দু ও স্বামী মৃণালকান্তি— এই দুই পুরুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগেছে। তৃতীয় উপন্যাস 'ভেবেছিলাম'-এ চাকরি, প্রেম, জীবনের নানা বাঁধা, নানা সমস্যা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত যুবকের আশা ও আশাভঙ্গের বেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসগুলিকে বিষয়বস্তুর নিরিখে কয়েকটি দিক থেকে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারি। যেমন—

১. প্রেমের উপন্যাস— 'সিন্ধু বারোয়াঁ', 'সেদিন চৈত্রমাস', 'অচেনা আবেগ', 'মাত্র কয়েকদিন', 'হঠাৎ একদিন' ইত্যাদি।

২. লেখকের ব্যক্তিজীবন কেন্দ্রিক— 'ভেবেছিলাম'।

৩. মৃত্যুবোধ বিষয়ক— 'সন্ধিক্ষণ', 'বৃষ্টির পরে', ' সবুজ গন্ধ' ইত্যাদি।

৪. দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন বিষয়ক— দিব্যেন্দু পালিতের বেশিরভাগ উপন্যাসের মূল বিষয় দাম্পত্যজীবনের সমস্যা। দীর্ঘ কয়েক বছরের একটানা সংসার জীবনে আসে ক্লান্তি বা অবসাদ। স্বামী-স্ত্রীর পুরনো সম্পর্ক তখন আর ফিরে পাওয়া যায় না। পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে চলে। যেমন— 'প্রণয়চিহ্ন', 'অবৈধ', 'সেকেন্ড হনিমুন', 'যখন বৃষ্টি', 'সিনেমায় যেমন হয়', 'আড়াল', 'মাইন নদীর জল', 'একদিন সারাদিন' ইত্যাদি।

৫. রাজনীতি বিষয়ক— দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে। যেমন— 'আমরা', 'সহযোদ্ধা', 'ঢেউ', 'গৃহবন্দী', 'উড়োচিঠি' ইত্যাদি।

৬. বিজ্ঞাপন জগতের প্রসঙ্গ বিষয়ক— 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ' ইত্যাদি।

৭. নিরুদ্দেশ, অপহরণ বিষয়ক— 'অন্তর্ধান', 'অনুসরণ', 'সোহিনী এখন কোথায়'।

৮. মেসবাড়ির মেয়েদের কাহিনি বিষয়ক— 'মধ্যরাত', 'স্বপ্নের ভিতর' ইত্যাদি।

৯. নারীর অধিকার বিষয়ক— 'স্বপ্নের ভিতর', 'সংঘাত', 'অনুভব' ইত্যাদি।

১০. নাট্যজগৎ বিষয়ক— 'মৌনমুখর'।

১১. অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের বিষয়ক— 'সোনালী জীবন'।

ক. প্রথম পর্ব ['সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯) থেকে 'প্রণয়চিহ্ন' (১৯৭১)] :

এই পর্বের উপন্যাসগুলি হলো— 'সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯), 'সেদিন চৈত্রমাস' (১৯৬১), 'ভেবেছিলাম' (১৯৬৪), 'মধ্যরাত' (১৯৬৭) এবং 'প্রণয়চিহ্ন' (১৯৭১)।

দিব্যেন্দু পালিত প্রথম জীবনে কয়েকটি প্রেমের উপন্যাস লিখেছিলেন। এগুলির কাহিনি সরল এবং একরৈখিক। উপন্যাসগুলিতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, নেই চরিত্রের গভীরতা। সমালোচকের মতে, "দিব্যেন্দু পালিতের লেখায় প্রেম এসেছে, কিন্তু তার প্রকাশ খুব মৃদু। উচ্ছ্বাসটা অত তীব্র নয়।"[১] আসলে দিব্যেন্দু পালিতের এটি ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ফল। এই সময় তাঁর বয়স খুবই কম ছিল। তখন তিনি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেমের কথা উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন। তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংসারে প্রেমের প্রকাশও ছিল খুবই চাপা। 'সিন্ধু বারোয়াঁ', 'সেদিন চৈত্রমাস' প্রভৃতি উপন্যাসে প্রেমের নিটোল কাহিনি প্রকাশ পেয়েছে।

দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ'। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে আভেনির প্রকাশনী থেকে। তখন লেখকের বয়স কুড়ি বছর। এই সময় তাঁর পিতা হঠাৎ মারা যান। সদ্য স্বর্গীয় পিতাকেই তিনি উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন। উপন্যাসটিতে দুটি ত্রিকোণ প্রেমের বৃত্ত আছে। প্রথম বৃত্তে জয়ন্তী-সৌম্য-অরুন্ধতী এবং দ্বিতীয় বৃত্তে অতনু-জয়ন্তী-সৌম্য। এরা প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া, প্রথম বর্ষের ছাত্র। জয়ন্তী বাংলা বিভাগের, সৌম্য ইংরেজি বিভাগের, মলিনা দর্শন বিভাগের। অরুন্ধতী তাদের থেকে এক ক্লাস নিচে পড়ে। ততোদিনে সৌম্য ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। জয়ন্তী ও সৌম্য আলাদা বিভাগের হলেও সবসময় এক সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশেছে। সেই মেলামেশা ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়। কিন্তু অরুন্ধতীকে দেখে সৌম্যর ভাবনা পাল্টে যায়। সে জয়ন্তীর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে। অরুন্ধতীর প্রেমে পাগল হয়ে ওঠে। অরুন্ধতীকে প্রথম দেখাতেই সৌম্যর মনে হয়েছে—

"চেতনার কোনো এক দুর্গম স্তরে অরুন্ধতী যেন একটা প্রবল ঝড় তুলেছে।...যেন একটা স্তব্ধ ঢেউ বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে, ফেনায়িত তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে সবকিছু!"[২]

এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে সে মিশেছে, সে পরিচয় কখনো কখনো ঘনিষ্ঠ আলাপেও পরিণত হয়েছে। কিন্তু এরকম মনের ভেতর তীব্র অনুভূতি আসেনি। ঘটনাক্রমে অরুন্ধতীরা সৌম্যদের বাড়িতেই ভাড়া থাকে। নিত্য দেখা হয় তাদের। সেই পরিচয়ে তারা পরস্পরের প্রেমে পড়ে। প্রেম একসময় আরো ঘনিষ্ঠ করে দুজনকে। তাদের প্রেমের মাঝখানে আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি আসে সুনীল। সুনীল সৌম্যর পাড়াতেই থাকে। বড়লোক বাপের একমাত্র ছেলে সুনীল। সৌম্যর চেয়ে বয়সে একটু বড়ো। তবুও একসময় সৌম্যর সঙ্গে পড়েছিল। কয়েকবার ফেল করার পর পড়া ছেড়ে দিয়েছিল সুনীল। এখন পাড়ার বখাটে ছেলেদের মধ্যে সে এক নাম্বার। কয়েকদিন ধরে অরুন্ধতীর পিছনে লেগেছিল। অরুন্ধতী কথাটা সৌম্যকে জানালেও সৌম্য কোনো ভ্রূক্ষেপ করেনি। সুনীল কোনোভাবেই অরুন্ধতীর প্রেমের কাছে পৌঁছতে পারেনি। সুনীল হঠাৎ একদিন তাদের বাড়ি চলে যায়। এতে অরুন্ধতী ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু এইদিকে আর গল্প এগোয়নি। গল্পের বাঁক এসেছে অন্যদিকে। অরুন্ধতীর বাবা মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলে এক চাকরিজীবী ছেলের সাথে। ফার্ন রোডে বাড়ি, নাম বিভাস। অরুন্ধতী বিয়ের কথা সৌম্যকে জানালে সৌম্য কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি বিয়ের কথা। সে শুধু পড়াশুনা নিয়ে ভেবেছে। ভেবেছে ভবিষ্যতে সে আরো অনেকদূর পর্যন্ত এগোবে। ফলে সৌম্য বিয়ের কথা তার বাবা-মাকে বলতে পারেনি। অরুন্ধতীর বিয়ের কয়েকদিন আগে সে কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেছে পুরীতে। তারপর ফিরে এসে নিঃসঙ্গতায় ভুগেছে। তার কাছে জীবন হয়ে উঠেছে অসহ্য। সে আবার জয়ন্তীকে ফিরে পেতে চায়।

অরুন্ধতীকে বিয়ে করে বিভাস সুখী হতে পারেনি। অরুন্ধতীর প্রেম সৌম্যর জন্য ছিল অন্ধ। বিয়ে করে অরুন্ধতী বিভাসের সাথে একসঙ্গে থাকেনি। ফলে উভয়ের মধ্যে বিবাহটা ছিল একটা সামাজিক বন্ধনমাত্র। পিতৃমাতৃহীন বিভাস চেয়েছিল সুখ। তার কাছে জীবন ছিল সহজ সরল। পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধে সে অনাবিল আনন্দ খুঁজেছিল। লেখকের কথায়—

"সুন্দর এই পৃথিবী, কত সুন্দর; ছোটো ছোটো সুখ, ছোটো ছোটো দুঃখ, শোক, যন্ত্রণা এবং আশা; সব কিছুর মধ্যে এক জ্যোতির্ময় আলোর সন্ধান করছিল।"[৩]

বিভাস বিয়ে করে সুখী হবে এই আশা করেছিল। কিন্তু তার এখন পৃথক শয্যা। সহজ, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার মধ্যে তবুও সে অরুন্ধতীকে সন্দেহ করেনি। সেই বখাটে সুনীলের সঙ্গে দার্জিলিং ঘুরতে যেতে দিয়েছিল। বিভাস ভেবেছিল ঘুরে এসে যদি অরুন্ধতীর মন ভালো হয়। কিন্তু অরুন্ধতী আগের থেকে আরো খিটখিটে হয়ে যায়। তার চেহারায় আরো বেশি করে ক্লান্তি, বিষণ্ণতা ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে বোঝা যায় অরুন্ধতী সন্তানসম্ভবা। বিভাসের কাছে এর থেকে আর খুশির খবর হয় না। সে নতুনভাবে জীবন শুরু করার কথা ভাবে। কিন্তু নার্স ও কাজের মাসির কথায় ছেলেটা যেন তাদের কারোর মতো হয়নি। নিজের সন্তানকে ঘৃণা হয় অরুন্ধতীর। ছেলেকে মনে হয় একটা 'জানোয়ার'। 'অকারণ ঘৃণার শিহরে রি-রি করে অরুন্ধতীর সারা দেহ'। সে 'জানোয়ার'টার অস্থির চিৎকার শ্বাসরোধ করে শান্ত করে। আর নিজেও আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যায়।

'সেদিন চৈত্রমাস' দিব্যেন্দু পালিতের দ্বিতীয় প্রেমের উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। এই সময় তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এখানেও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যুবক-যুবতির প্রেমের ছবি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসটি যখন 'বসু চৌধুরী' প্রকাশনী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় তার সূচনায় লেখা ছিল— "প্রেম ও যৌনতা বিষয়ে মৌল স্বাদযুক্ত উপন্যাস 'সেদিন চৈত্রমাস'।"[৪]

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এষা। সে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যুবতী। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ির লোকজন তাকে জোর করে বিয়ে দেয়। স্বামীকে এষার কোনোমতেই পছন্দ হয়নি। বিয়ের প্রথম রাত থেকেই স্বামী সম্পর্কে তার ঘৃণা আসে। বিদেশে স্বামীর বড়ো চাকরি থাকলেও সঙ্গে যায়নি। এষা বাপের বাড়িতে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করতে চায়। বিবাহিতা এষা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সহপাঠী অমলেন্দুর সংস্পর্শে আসে। তার প্রতি আবেগ, আকর্ষণ এবং ভালোবাসা জন্মে। অমলেন্দুর ঘনিষ্ঠতায় এষা খুঁজে পায় বেঁচে থাকার আশ্বাস আর ভবিষ্যতের আশ্রয়। অমলেন্দুকে কাছে পেয়ে সে জীবনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে অমলেন্দুর সঙ্গে সংসার করতে চায়। কিন্তু প্রেমিক

যুবক অমলেন্দু তাকে সঙ্গ দিয়েছিল, ভালোবাসা দিতে পারেনি। তার শরীর নিয়ে খেলেছিল, ভালোবাসার মর্যাদা দিতে পারেনি। বেকার যুবক অমলেন্দুর জন্য অপেক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু অমলেন্দুর কথাবার্তায় তার সম্পর্কে কোনো আবেগ নেই। অমলেন্দু আশ্রয় দিতে পারেনি তাকে। এই ব্যর্থ প্রেমে এষা নিজেকেই অপরাধী মনে করেছিল। আত্মহত্যার কথা মাথায় আসে তার। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এষা বুঝতে পারে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তার মানসিক নিবৃত্তি সম্ভব নয়। তাই দুই পুরুষের সান্নিধ্যে না থেকে সে স্বাবলম্বী হতে চেয়েছিল। স্কুলের হেডমিস্ট্রেস অঞ্জলি দিদিমণির কাছে পরামর্শ নিয়েছে কীভাবে একা বেঁচে থাকা যায়। শেষ পর্যন্ত সে একটা স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ করে। প্রেম, বিবাহ, সংসার ছেড়ে একটা আত্মসুখী, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের পথ বেছে নিয়েছে। ব্যর্থ প্রমের আখ্যান হলেও 'সেদিন চৈত্রমাস' আধুনিক শিক্ষিত নারীর বিদ্রোহী চেতনার উদ্ভাস।

দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিজীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস 'ভেবেছিলাম'। এটি দিব্যেন্দু পালিতের তৃতীয় উপন্যাস। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে সুরভি প্রকাশনী থেকে। এর আগে এটি মুদ্রিত হয় 'উল্টোরথ' পত্রিকায়। উপন্যাসটি আকারে খুবই ছোটো। আটটি মাত্র পরিচ্ছেদ। উপন্যাসটি লেখক উৎসর্গ করেছেন শ্রীযুক্তা যূথিকা নাগকে।

'ভেবেছিলাম' উপন্যাসটি উত্তম পুরুষে লিখিত। গল্পের কথক একজন ভাববাদী যুবক। তার বয়স তিরিশ বছর। সেই সময় দিব্যেন্দু পালিতেরও বয়স প্রায় সমান ছিল। পিতা মারা যাওয়ার পর যুবক দিব্যেন্দু ১৯৫৮ সালে ভাগলপুর থেকে কলকাতায় আসেন কাজের জন্য। এই সময় কাজ তো দূরের কথা নিজের পেটের ভাত টুকুও জোটাতে তিনি ব্যর্থ। বাড়িতে বৃদ্ধা মাকে ভাই-বোন ও সংসারের সব দায়িত্ব দিয়ে এসেছেন। মায়ের জন্য তাঁর মন খারাপ হতো সবসময়। এই উপন্যাসের কথকের মুখের ভাষা দিয়ে লেখক বুঝিয়েছেন তাঁর মায়ের স্মৃতি-বিজড়িত বেদনা—

> "মা-র চুলে পাক ধরেছে— এই কয়েক মাসে তিনি অত্যধিক জীর্ণ হয়েছেন ও তাঁর কয়েক বছর বেড়ে গেছে...। মা, আমার মা, আমার বুড়ি মা— আবেগের আতিশয্যে এবংবিধ ভাবতে ভাবতে আমার ইচ্ছে করছিল মাকে প্রবলভাবে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরি ও তাঁর ললাট চুম্বন করি।"[৫]

এই উপন্যাসটিতে ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত লেখকের ব্যক্তিজীবনের নানা ঘটনা স্থান পেয়েছে। দিব্যেন্দু পালিত জানান, এই ছয়-সাত বছর শুধু তাঁকে বেঁচে থাকার জন্যেই বহু পরিশ্রম, গ্লানি ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে। তিনি স্মৃতিকথায় জানান—

> "সে বড়ো নিঃসঙ্গ সময় : ক্ষুধা, ভয়, একাকীত্ব, অসহায়তা, মানুষের প্রবঞ্চনা ও অকারণ বিরুদ্ধাচরণ— এই কয়েক বছরে আমাকে উপর্যুপরি এতো আঘাতের সম্মুখীন হতে হয় যে, মনে হতো, হেরে যাচ্ছি, খুব তাড়াতাড়ি একটা বিকল্প খুঁজে না পেলে আর টানতে পারব না নিজেকে। কিন্তু, এই বোধও স্থায়ী হতো না বেশিক্ষণ। আশঙ্কা একা আসত না; সঙ্গে নিয়ে আসত জীবনযাপন সম্পর্কে একরকম উদাসীনতা— যা ক্লান্তি ও বিষণ্ণতা থেকে টেনে নিতে পারে নতুনতর শক্তি সঞ্চয়ের দিকে।"[৬]

এই ধরনের অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্টভাবে পড়েছে 'ভেবেছিলাম' উপন্যাসের গল্প কথকের উপর। গল্প কথকের কোনো নাম নেই। বলা চলে দিব্যেন্দু পালিত নিজের কথাই বলছেন। গল্পের কথক এম. এ. পাশ করে বেকার হয়ে পড়েছেন। অনেক ইন্টারভিউ দিয়েও কোনো লাভ হয়নি। 'কর্মহীনতার কমপ্লেক্স' ঘিরে ধরেছে তাকে। শহরের পথে তিনি একা এবং নিঃসঙ্গ হেঁটেছেন। তার কাছে বর্তমান নেই, ভবিষ্যতের যাবতীয় চিন্তাও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। বন্ধু নিকুঞ্জকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা এবং নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন—

> "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিবছর কিছু-না-কিছু শিক্ষিত যুবককে মানপত্র দিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করার দায়িত্ব পালন করছে। অর্থাৎ কর্পোরেশনের লরি। যেন সেই স্তূপীকৃত জঞ্জালের একাংশে আমি নিজেও পড়ে আছি, পরস্পরের বিক্ষোভের গন্ধে সর্বাঙ্গ ক্রমশ পচন ধরেছে।"[৭]

কথক বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে দার্শনিক ভঙ্গিতে অজস্র মানুষের মুখ দেখেছেন। কালো মুখ, ফর্সা মুখ, ভরা মুখ, সুন্দর মুখ, ভাঙা মুখ, উজ্জ্বল মুখ কিংবা কুৎসিত মুখ— সমস্ত মুখই তাঁর কাছে ভাবলেশহীন এবং নির্বিকার। এদের মধ্যে কথক আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষদেরও

দেখেছেন। বন্ধু নিকুঞ্জর কাছে দেখেছেন সেই শূন্যতা। তার নিস্পৃহ, নিরুদ্যম দৃষ্টি কথককে অপূর্ণ, অসহায় ও নিঃসঙ্গতায় ঠেলে দিয়েছে। তিনি বুঝেছেন, প্রকৃত মৃত্যুর আগেই এই সব মানুষের মৃত্যু ঘটে। এই সব অভিজ্ঞতার কথা লেখক অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁর স্মৃতিপটে—

> "মনে হতো নিজের মধ্যে প্রত্যেক মানুষই বড়ো একা; একের সঙ্গে অন্যের পারস্পরিক সম্পর্ক যতোই নিবিড় হোক, মাঝখানে কোথাও আছে এক অতিকায় লোহার দরজা— ভারী খিল আঁটা, তার আড়ালে বসে প্রত্যেকেই ছুঁয়ে যাচ্ছে নিজের অপূর্ণতা, কথা বলছে, কেঁদে যাচ্ছে আপন মনে।"[৮]

কলকাতায় আসার প্রথম দিকের অভিজ্ঞতায় লেখক মানুষের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেননি। এই সময় তিনি এমন কিছু ব্যক্তি মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, যাদের দয়ায় এবং মমত্ববোধে তিনি উপকৃত। চারিদিকের ক্লেদ, গ্লানি এবং কুশ্রীতার মধ্যেও যে মানুষ চোখ তুলে তাকায় মানুষের দিকে— বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, আশ্রয়ের জন্যে, ক্ষমা প্রার্থনা ও চরিতার্থতার জন্যে, তার মূলে আছে কিছু মানুষের শুভবোধ। যাঁরা স্বার্থহীনভাবে দুঃস্থ ধরিত্রীর দিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে দিচ্ছেন শুশ্রূষার হাত। এই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা তিনি উপন্যাসের কথকের মুখ দিয়ে বলেছেন—

> "মানুষ মাত্রেই ভালোমানুষ, সৎ ও উদার এবং ভালোত্বের ধারাবাহিকতা মনের অগোচরেই তারা রক্ষা করে থাকে; অবচেতনার শুদ্ধতা পৃথিবীকে নিরন্তর শুদ্ধ করে তোলে।"[৯]

১৯৬১ সালে লেখক ইংরেজি 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকা'য় সাব এডিটরের কাজে যোগ দেন। আলোচ্য উপন্যাসেও কথক অস্থায়ী কর্মী হিসেবে ইংরেজি 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় সাব এডিটর এবং স্টাফ রিপোর্টার-এর কাজে যোগদান করে। চাকরি জীবনে এসে সে ঘটনা সূত্রে মানুষের প্রতি বিশ্বাস ধরে রাখতে পারেনি। সেইসব কথা সে আত্মবিশ্লেষণের ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছে। কথক বরাবর সৎ এবং নিঃস্বার্থ ছিল। কিন্তু সংবাদপত্র অফিসে তাকে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির শিকার হতে হয়েছে। সময় মতো ভালো কাজ করলেও সে সকলের প্রিয়ভাজন হতে পারেনি। মিস্টার চৌধুরী তাকে গোপনে পরীক্ষা করে। অফিসার

সেনগুপ্ত তাকে সুব্যবহারের আড়ালে চাকরি থেকে বরখাস্তের নোটিশ দিয়েছে। হেলথ ডিপার্টমেন্টে তদন্ত করতে গিয়ে বঞ্চনা এবং যন্ত্রণার আর এক অভিঘাত দেখেছে সে। কাজে অনুপস্থিত থাকার জন্য চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির নব্বই টাকা মাইনের স্টাফ নার্স প্রীতিলতাকে ডিসচার্জ করা হয়েছে। প্রীতিলতা বিধবা এবং সন্তানসম্ভবা হওয়া সত্ত্বেও অফিসে তাকে খেসারত দিতে হয়েছিল। সে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটায়। কিন্তু তার নামে এক বা একাধিক ব্যক্তির কারসাজিতে এখনো মাইনে উইথ ড্র করা হয়। এই সব বিষয় যেন তদন্ত করা না হয় তার জন্য হেলথ অফিসার ডক্টর এল. এম. ঘোষ সুকৌশলে ব্যাপারটি এড়িয়ে গেছে। অফিসার সেনগুপ্ত প্রেসের সমস্ত কাজ গণপতিবাবু এবং তাকে দিয়েছে এডিটর জ্যোতিষবাবু না থাকায়। আর্লি মর্নিং এডিশনের মেক আপের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য রাতে কাজ থাকলেও বন্ধু বীরেনের দাদার অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে অফিস থেকে চলে যেতে হয়। খবরটা যদিও মিথ্যে। এতে তার কোনো দোষ ছিল না। বীরেনের প্রেমিকা শ্যামলী বীরেনকে ঠকিয়েছে। শ্যামলী বীরেনের প্রেমের মর্যাদা দেয়নি। সে একটা পয়সাওয়ালা ছেলের সাথে বিয়ে ঠিক করেছে। এদিকে বীরেন একটা দামী আংটি শ্যামলীকে দিয়েছে। শ্যামলী সেটা ফেরত না দিয়ে বেমালুম হজম করেছে। এর ফলে বন্ধুর প্রেম সম্পর্কিত বিবাদে তারা রাস্তায় মারপিটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং পুলিসে তাদের থানায় নিয়ে যায়।

এই সব ঘটনার এক মাস পরে অফিসে গেলে সেনগুপ্ত তার হাতে রেজিগনেশন লেটার ধরিয়ে দেয়। 'কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টে' লাল কালিতে আন্ডারলাইন করা ছিল দুটো পয়েন্ট—

> "ডিউটির সময়ে অ্যাক্সিডেন্টের অজুহাত দেখিয়ে ছুটি নেওয়া এবং পরে, মধ্য রাস্তায় মারপিট, তারপর থানায় গমন...এবং হেলথ ডিপার্টমেন্টে অফিসিয়াল সিক্রেট ফাঁস করার অভিযোগে অভিযুক্ত আমি।"[১০]

নিরপরাধ কথক চাকরি হারিয়ে অফিস থেকে রাস্তায় নেমে পড়েছে। শূন্যতা তাকে আরো অন্ধকার ও আচ্ছন্নতায় ঠেলে দিয়েছে। গল্পকথকের স্রষ্টা লেখক দিব্যেন্দু পালিতও ব্যক্তিজীবনে ১৯৬৫ সালে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার কাজ ছেড়ে দেন। এই সমস্ত দিক বিচার করে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে লেখকের ব্যক্তিজীবনের দলিল।

মেসবাড়ির মেয়েদের জীবনকাহিনি নিয়ে দিব্যেন্দু পালিত দুটি উপন্যাস লিখেছেন— 'মধ্যরাত' এবং স্বপ্নের ভিতর'। দুটি উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্র প্রায় একই। 'মধ্যরাত' দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম যৌবনের লেখা বলে চরিত্রগুলির মধ্যে মনের গভীরতা কম প্রকাশ পেয়েছে। আর 'স্বপ্নের ভিতর' পরিণত বয়সে লেখা বলে চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

'মধ্যরাত' দিব্যেন্দু পালিতের চতুর্থ উপন্যাস। ১৯৬৭ সালে এটি 'চতুষ্পর্ণা' প্রকাশনী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর আগে এটি 'চতুষ্পর্ণা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটি লেখক ভাগলপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী সুশীলরঞ্জন মহাশয়কে উৎসর্গ করেন।

এই উপন্যাসটির মূল কেন্দ্রে আছে 'নষ্টনীড়' নামে একটি বাড়ি। সেখানে অভিভাবকহীন স্বাধীন মেয়েরা বাস করে। মেয়েগুলির বয়স বেশিরভাগই ত্রিশের আশপাশ। কিছু মেয়ে বাবা-মা মারা যাবার পর এখানে চলে এসেছে। কিছু মেয়ের স্বামী মারা যাওয়ার পর শ্বশুর বাড়ির লোকজনের অত্যাচারে চলে এসেছে। এই সব মেয়েরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে নিজেদের মতো চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। আসলে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিক্ষাদীক্ষায় উন্নতি হওয়ায় ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও স্বাবলম্বী হতে চেয়েছিল। বাঁচতে চেয়েছিল নিজের মতো করে। তারাও আর আবদ্ধ ঘরে জীবন কাটাতে চায়নি। বাইরের জীবনের সাধ নিতে চেয়েছিল। এইরকম কিছু মেয়েদের জীবনকাহিনি নিয়ে দিব্যেন্দু পালিত 'মধ্যরাত' উপন্যাসের বয়ন করেছেন।

এই উপন্যাসের মূল চরিত্র তপতী। সে সুরমাদেবী গার্লস কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে তার কাকার বাড়ি থেকে মেসবাড়ির যাত্রায়। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর কাকার বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাকে। কাকা ভালো ব্যবহার করলেও কাকিমা আটাশ-ঊনত্রিশ বছরের ধিঙ্গি আইবুড়ো মেয়েকে সুনজরে দেখেনি। শেষে অশান্তির ভয়ে তপতী 'নষ্টনীড়' নামক মেসবাড়িটিতে আশ্রয় নেয়। মেসবাড়িতে এসে তার জীবন ভালোই কাটছিল। বাকি মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা, গল্পগুজব, মজলিশ, হাসিঠাট্টা আর সর্বোপরি প্রত্যেকের দুঃখের কাহিনি— সবাই মিলেমিশে ছিল। "গোটা বিষয়টার মধ্যে

কোথায় যেন এক ব্যঙ্গের ছোঁয়া আছে, অভিভাবকহীন স্বাধীন কয়েকটি মেয়ের আত্মপরিচয়ের রূপান্তর"[১১] — এই উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন।

উপন্যাসটিতে লেখক প্রত্যেকটি মেয়ের পেশাগত পরিচয়কে তুলে ধরেছেন। সাবিত্রীর পেশা নার্সিং। রিনা চাকরি করে কুটির শিল্পের দোকানে। বাসন্তী একটা বেসরকারি অফিসে কাজ করে। এছাড়াও রত্না, মন্দিরা, মিনতি, দীপালি, অঞ্জলি, রেণু— এদের পেশা কি লেখক বলেননি ঠিকই কিন্তু এরা প্রত্যেকদিন সকালে কাজে বের হয় এবং রাত্রে মেসে ফেরে। সবার সহজ এবং আন্তরিক ব্যবহারে প্রত্যেকের দিন ভালোই কাটছিল। কিন্তু কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটায় প্রত্যেকে বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। সাবিত্রীর রহস্যময় গতিবিধি, হঠাৎ নীলার বিয়ে হয়ে যাওয়া, অঞ্জলির আকস্মিক অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া ও লুকিয়ে গর্ভপাত করাতে গিয়ে মৃত্যু, সেই ঘটনা খবরের কাগজে হাইলাইট হওয়া, মেসবাড়িতে পুলিস আসা— ইত্যাদি ঘটনায় প্রত্যেকে ক্লান্ত, বিষণ্ণ এবং ভয়াতুর হয়ে পড়েছে। তারা ঠিক করেছিল সবাই নিজের নিজের বাড়িতে গিয়ে থাকবে। কিন্তু যে যেখানে গেছে কেউ ভালোভাবে থাকতে পারেনি। সবসময় অনুভব করেছে শূন্যতা, একাকীত্বতা। ফলে কয়েক মাস পর তারা আবার নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে ফিরে আসে 'নষ্টনীড়ে'। এবারে কিছু নতুন মেয়ে মেসবাড়িতে আসে। এভাবেই শেষ হয় উপন্যাসটি।

দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন বিষয়ক দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস 'প্রণয়চিহ্ন'। উপন্যাসটি অরুণা প্রকাশনী থেকে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন সাহিত্যিক বিমল করকে। উত্তম পুরুষে উপন্যাসটি রচিত। কথক নায়িকা নমিতা। তার আত্মকাহিনি উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। দাম্পত্য জীবনের কলহে ঘর-সংসার ছেড়ে তার একাকীত্ব জীবন কীভাবে কেটেছিল তাই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। নারী ও পুরুষের বহুগামিতার প্রসঙ্গ এসেছে। পুরুষ যেমন অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে, নারীও তেমনি বহু পুরুষের সান্নিধ্যে স্বেচ্ছায় এসেছে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে নারী-পুরুষের এই অবৈধ সম্পর্কের বিন্যাস পরবর্তী বহু উপন্যাসে দেখা যায়।

ব্যবসায় উন্নতির ফলে মহীতোষ তার স্ত্রী নমিতাকে নিয়ে একান্নবর্তী পরিবার থেকে ফ্ল্যাটে চলে আসে। ব্যবসার জগতে সে স্ত্রীকে সামাজিক হতে চেষ্টা করে। ফলে নমিতাকে চা-কফির বদলে বিলিতি কায়দায় মদও ঢেলে দিতে হতো। নমিতাকে অন্য পুরুষের সঙ্গে

বাইরেও যেতে হতো। মিশতে হতো তাদের আড্ডায়, পার্টিতে। যে মহীতোষ একদিন তাকে ঘর-সংসার থেকে দূরে ব্যবসার জগতে নিয়ে আসে সে'ই হঠাৎ করে সন্দেহ করে তাকে। নমিতার কথায়—

> "মহীতোষ তার ব্যবসার সুবিধের জন্য মক্কেল ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করাতে চাইত আমাকে।...কিন্তু এর জন্য যে স্বতঃস্ফূর্ততা দরকার, যে মানসিক ঔদার্যতা— নাগালের বাইরে স্বত্ব অধিকার করার জন্য ভেতরের স্বত্ব কিছুটা ছাড়া, মহীতোষের তা ছিল না। ব্যাপারটা কোনোদিনই সে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি।...বুঝিনি পর্দার বাইরে টেনে আনলেও পর্দাটাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারেনি মহীতোষ।"[১২]

নমিতার ভুল ছিল। সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই জেনেও কোনো প্রতিবাদ করেনি। সে মানসিক ঔদার্যহীন, দুর্বল, স্পর্শকাতর, সন্দেহগ্রস্ত স্বামীকে সবল হবার সুযোগ দিয়েছিল। মহীতোষের চোখে ব্যভিচারিণী হয়ে যায় নমিতা। এই অভিযোগে কোর্টের দ্বারস্থ হয় নমিতা। আইনি মাধ্যমে ছয় বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যায় নিমেষে। কিন্তু আইন তাকে এক ধরনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেও স্বাধীনতা দেয়নি। দেয়নি আত্মরক্ষার অধিকার। সমাজের চোখে সে খারাপ হয়ে যায়। লোকে তাকে অবাঞ্ছিত মনে করেছে। সামান্য ফ্ল্যাট খুঁজতে গিয়ে ডিভোর্সির কথা শুনে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে অনেকে। নমিতা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেবর পরিতোষের কথা তার মনে পড়ে যায়—

> "বউদি জেদ থাকা ভালো, যদি শেষপর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারো। তুমি কি পারবে! বরং তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো।"[১৩]

মহীতোষের সন্দেহই জোর এনে দিয়েছিল তাকে। পরিতোষের সাহায্যে একটা ফ্লাটে ভাড়া পায়। শুধু বাঁচার জন্যই তার এই আশ্রয়—

> "বাঁচতে আমার বড়ো লোভ হয়, ইচ্ছে করে আর অনেক, অনেকদিন ধরে বাঁচি। সময়ের ভার অসহ্য না হলে, ...সত্যিই আমি আরও অনেকদিন বেঁচে যাবো।"[১৪]

কাকার বন্ধু মিস্টার সরকারের সুপারিশে নমিতা মার্কেন্টাইল ফার্মে রিসেপশনিস্টের কাজ পায়। এছাড়াও অফিসকর্মী সুব্রত মডেলের কাজ দেয় তাকে। কিন্তু জীবিকার সন্ধান পেলেও জীবন বদলায় না তার। একাকীত্ব কাটাতে পুরুষের দরকার হয়। নির্জন ফ্ল্যাটে নিত্য যাতায়াত চলে বন্ধু মনীশের। মনীশ বিবাহিত। স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে ঘর-সংসার করার স্বপ্ন বৃথা। মহীতোষও দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। এভাবেই নমিতা আর মহীতোষের প্রণয়চিহ্নগুলি ক্রমে ক্রমে পাল্টে গেছে।

খ. দ্বিতীয় পর্ব ['সন্ধিক্ষণ' (১৯৭১) থেকে 'সবুজ গন্ধ' (১৯৮২)] :

এই পর্বের উপন্যাসগুলি হলো— 'সন্ধিক্ষণ' (১৯৭১), 'সম্পর্ক' (১৯৭২), 'আমরা' (১৯৭৩), 'বৃষ্টির পরে' (১৯৭৪), 'বিনিদ্র' (১৯৭৬), 'চরিত্র' (১৯৭৬), 'একা' (১৯৭৭), 'উড়োচিঠি' (১৯৭৮), 'অহংকার' (১৯৭৯) এবং 'সবুজ গন্ধ' (১৯৮২)।

দিব্যেন্দু পালিতের বেশকিছু উপন্যাসে শূন্যতা, একাকীত্ব এবং বিষণ্ণতার অনুষঙ্গে মৃত্যুবোধ মূল সুর হয়ে উঠেছে। 'সন্ধিক্ষণ' (১৯৭১), 'বৃষ্টির পরে' (১৯৭৪), 'একা' (১৯৭৭), 'সবুজ গন্ধ' (১৯৮২) প্রভৃতি উপন্যাসে মৃত্যুবোধ আগাগোড়া সঞ্চারিত হয়েছে। এই উপন্যাসগুলিতে মৃত্যুর অমোঘ আবির্ভাব কখনো জীবনকে চিনিয়ে দেয়, কখনো সম্পর্কগুলিকে উল্টেপাল্টে সাজিয়ে দেয় নতুন করে, কিংবা কখনো অবিন্যস্তই রেখে দেয়।

'সন্ধিক্ষণ' দিব্যেন্দু পালিতের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম উপন্যাস। এই সময় লেখকের লেখার হাত যথেষ্ট পাকা। আগের উপন্যাসগুলির মতো কাহিনির বাড়াবাড়ি নেই। উপন্যাসগুলিও আকারে ছোটো হয়ে এসেছে। ছোটোগল্পের মতো উপন্যাসের শুরুতেই একটা চমক আছে। যেমন—

> "ভোরের দিকে চলে গেল কনক। কাকপক্ষী জেগে ওঠার আগে, উদাসীন হাওয়া আর রহস্যময় আলোছায়ার মধ্যে, এক ঘুম থেকে আরেক ঘুমে ঢলে পড়ার মতো— নিঃশব্দে চলে গেল।"[১৫]

উপন্যাসের শুরুতেই এইভাবে একটা মৃত্যুর প্রসঙ্গ পাঠককেও একা করে দেয়। প্রিয়জনকে হারাবার শূন্যতা পাঠককেও বিষণ্ণ করে তোলে। কনকের চলে যাওয়াটা ছিল অবধারিত। শুধু দিনক্ষণটি জানা ছিল না কারোর। দিনক্ষণ জানা হয়ে গেলে কনকের পিতা

দাশরথি নিঃশব্দে একটি প্রশ্ন করে 'কখন'? তার মা বসুধা মূক হয়ে যায়। বড়ো বোন বুলা অসহায় সংসারের জন্য চাকরি খোঁজে। ছোটো বোন ঝুমির কৌমার্য নষ্ট হয় কনকের বন্ধু শ্যামলের হাতে। বন্ধু অমিয়, নিখিল অতীতের হারানো স্মৃতিতে জীবনের মানে ভুলে যায়। সর্বোপরি অমিয় আর রেখার দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরে।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে দাশরথি কেরানীর চাকরি করলেও কনকই ছিল একমাত্র ভালো উপার্জনশীল। কনকের মারা যাওয়াটা ছিল পরিবারের ওপর এক অশুভ শক্তির অভিশাপ। দাশরথির প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যেটুকু টাকা ছিল কনকের চিকিৎসায় শেষ হয়ে যায়। ছেলের শ্রাদ্ধ করার কানাকড়িও প্রায় ছিল না। ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধশান্তির বিদায় দেওয়ার টাকাটাও দিতে পারেনি। নিত্য দারিদ্র্য নেমে আসে পরিবারে। দুই মেয়ের বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এইজন্য কনকের অসুখটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেলেও হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাননি দাশরথি। তিনি বলেছিলেন—

> "কেরানী মানুষের সম্বল তো ওই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডটি, ওতে হাত দেবো! আমার তো শুধু একটি নিয়ে ভাবলেই চলে না!"[১৬]

নিত্য দারিদ্র্যের বেড়াজালে বুলা অসহায়ভাবে ঘরের বাইরে এসেছে চাকরির জন্য। দাদার অফিসে চাকরি খুঁজতে গিয়ে হেনস্থা হতে হয়েছে তাকে। দাদার বন্ধু নিখিলের শরণাপন্ন হলে নিখিল তাকে গুরুত্ব দেয়নি। বরং তার অফিসে গেলে সে অস্বস্তিবোধ করেছে। চাকরির জন্য হয়রান হওয়া বুলার মনে হয়েছে, তার কাছ থেকে সবাই আলাদা, বিচ্ছিন্ন, অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে। বুলা বেকারত্বের জ্বালায় ভিতরে ভিতরে নিঃশব্দে ক্ষয়ে যাচ্ছে। নিজের ভাবনার মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে।

কনকের মৃত্যুর পর ছোটো বোন ঝুমি নিজের ব্যবস্থা নিজেই ঠিক করে নিতে চেয়েছে। দাদার বন্ধু শ্যামলের সঙ্গে ঘর করতে চেয়েছে। তার উপর নির্ভর করে স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু শ্যামল তার ভালোবাসার মর্যাদা দেয়নি। বুলার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেছে, তারপর হোটেলে নিয়ে গেছে, আবদ্ধ ঘরে তার কৌমার্য নষ্ট করেছে। স্বার্থপর শ্যামল শেষে তাকে পরিত্যাগ করেছে। পুরুষের কাছে ব্যবহৃত, পরিত্যক্ত বুলা এরপর পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেছে।

কনকের মৃত্যুতে অমিয় আর রেখার দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে। কনক এক সময় ভালোবাসতো রেখাকে। এই সূত্রে কনকের মৃত্যুর পর রেখার মনের মধ্যে নীরবতা দেখতে পেলে অমিয় রেখাকে সন্দেহ করেছে। রেখার গর্ভের সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অমিয়। ফলে দুজনের মধ্যে চলে নিরন্তর চাপা মনোমালিন্য ও অশান্তি। রেখা ও অমিয় পরস্পরের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। রেখা আত্মহত্যার মধ্যদিয়ে মুক্তির পথ খুঁজতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বামীর প্রতি ভক্তি আর সন্তানের কথা ভেবে পারেনি। এইভাবে কনকের মৃত্যুর পর সময়ের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে প্রত্যেকেই অসুস্থতা ও নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে।

'বৃষ্টির পরে' উপন্যাসের শুরুতেও মৃত্যুর প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু সেই মৃত্যুটি অমানবিক, অসামাজিক। একটি সাত বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ ও খুন করে করে নদীতে ফেলে দিয়েছে। এই ঘটনার পর মেয়েটির বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী কেউই স্বাভাবিক থাকতে পারেনি। সকলেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কল্যাণ আর বাণীর ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে টুসি। কথা বলতো বড়ো বড়ো করে। পাড়ায় সকলের প্রিয় এবং আদরের জন্য সবসময় চোখে চোখে থাকতো। একসময়ের বিশ্বস্ত কাজের লোক শঙ্করলাল টুসিকে ধর্ষণ ও খুন করে পালিয়েছে। শঙ্করলাল ধরা পড়লেও তার শাস্তির কথা উপন্যাসে নেই। তার চেয়ে এইরকম পরিস্থিতিতে চরিত্রগুলির বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থাকে লেখক তুলে ধরেছেন।

কল্যাণ আর বাণী খুবই সহজ সরল স্বভাবের মানুষ। টুসি জন্মাবার পর তাদের দুঃখ বলে পৃথিবীতে কিছু ছিল না। পেশায় অধ্যাপক দুজনেই। বাণী একটু গম্ভীর প্রকৃতির হলেও ফাঁকা সময়ে সবার সাথে গল্প, আড্ডা, হাসাহাসি করে। কিন্তু একমাত্র মেয়েকে হারানোর পর সে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে রাতে তার এখন ঘুম আসে। মধ্যরাতে ঘুম ভাঙলে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সব সময় তার মনে পড়ে মেয়ের মুখ, মেয়ের অনুভূতি। এই দুর্ঘটনা ভুলতে স্বামীর সঙ্গে অন্য জায়গায় চলে যেতে চায়। কল্যাণেরও একইরকম অবস্থা। মধ্যরাতের নিঃশব্দতার মধ্যে বাণীর নিঃশ্বাসই তার একমাত্র নির্ভরতা। নেশায় অভ্যস্ত না হলেও এই সময় সিগারেট ধরায়। তার মনে হয়েছে জীবন অসহ্য— দুঃখের

অতীত স্মৃতি থেকে পরিত্রাণ পেতে সে স্ত্রীকে নিয়ে অন্য বাসস্থানে গেছে। যাবার সময় অশোককে তারা বলে গেছে, "শুধু একজন থেকে গেল— তুই দেখিস— "[১৭]

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অশোক। সে গ্রামের ছেলে হলেও চাকরির সূত্রে কলকাতায় থাকে। কলকাতায় তার আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ নেই। কল্যাণদের পাড়াতেই থাকে। তার চোখ দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, মৃত্যু মানুষকে কীভাবে সমাজজীবন থেকে দ্রুত একা করে দেয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে অশোক শুনতে পায় অন্ধকারে নিঝুম হচ্ছে শহরটা। তার ভয় হয়, একদিন হয়তো সবকিছু থেমে যাবে। আদ্যন্ত বিষাদে ডুবে যায় টুসির মৃত্যুর কথা ভেবে, নির্জন রাতে গুণ্ডাদের আক্রমণে মাস্টার মশাইয়ের মাথা ফাটার কথা ভেবে, ধর্মান্তরিত একটি মেয়ের চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া কথা ভেবে, পায়ে আঘাত নিয়ে একটি ছেলে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে তার স্বপ্ন থেকে তার কথা ভেবে। অনেক মুখের কথা তার মনে পড়ে। রাজবালা, শ্যামশ্রী, গায়ত্রী, বিষাণের বিষাদ ভরা মুখ। তার মনে হয়েছে—

> "জীবন জড়িয়ে যাচ্ছে জীবনের সঙ্গে; এই শহরের ভাঙাচোরা, বিবর্ণ অস্তিত্বের মধ্যে থেকে এখন সে কোথায় আলাদা করে খুঁজে পাবে নিজেকে!"[১৮]

'একা' (১৯৭৭) উপন্যাসের শুরুতে শ্রীলা আত্মহত্যা করেছে। স্বামী, সন্তান থাকা সত্ত্বেও কেন সে আত্মহত্যা করেছিল তার সঠিক কারণ জানা যায় না। তার মৃত্যুটা শিশিরের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। শিশিরের মনে হয়েছিল, শ্রীলার আত্মহত্যা পরোক্ষে তার দিকেই আঙুল তুলেছে। যদিও আত্মহত্যার আগে স্পষ্ট লিখে গিয়েছিল শ্রীলা— 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়— '। স্ত্রীর আত্মহত্যার পর ব্যক্তিজীবনের নিঃসঙ্গতা এবং অতীত স্মৃতির বেদনায় শিশিরের দ্বন্দ্বময় জীবন লেখক উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দশ বছরের দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে শিশির সুখেই ছিল। সে একটু অহংকারী ছিল। অফিসে সুনামের দম্ভে তার পা মাটিতে পড়ে না। চার বছরে পাঁচটি বড়ো ধাপ সে ছাড়া আর কেউই পেরিয়ে আসতে পারেনি। সবসময় স্ট্যাটাস মেইনটেন করে চলত। অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সে স্ত্রী ও সন্তানকে সময় দিতে পারতো না। তার স্ত্রীর শুধু একটাই অভিযোগ ছিল, সে কোনোদিন তাকে বুঝতে পারেনি। স্ত্রীর মৃত্যুর

পর শিশির একা হয়ে যায়। বিষণ্ণতা ঘিরে ধরে চতুর্দিকে। নিঃশব্দে কাটে তার এক একটা দিন। অনুভূতি জুড়ে এক ধরনের অসহায়তা টের পায় সে—

> "একটা শুকনো অনুভূতি ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তাকে। এরপর ক্রমশ অসুখী হবার দিকে এগিয়ে যাবে সে? নাকি শ্রীলার অভাবে অসহ্য হয়ে উঠবে জীবন?"[১৯]

একমাত্র সন্তানকে রেখে আসে শ্বশুরবাড়িতে। স্ত্রী না থাকার অবসাদ কাটিয়ে সে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে। বাঁচতে ভালো লাগে তার। সে বাঁচতে চায় অফিস নিয়ে, কেরিয়ার নিয়ে, সাফল্য আর সচ্ছলতা নিয়ে, চন্দনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। নিজের মনকে বোঝাতে চায়— "শ্রীলার মৃত্যু একটা ঘটনামাত্র— যেমন অন্যান্য ঘটনা, তা হলে সে থেমে আছে কেন!"[২০] মুহূর্তের অবসাদ কাটিয়ে অনেকটা সুস্থতা অনুভব করে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্ররা অতীত স্মৃতির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়নি। স্মৃতি মাঝে মাঝে শিকড় ধরে টান দিয়েছে। নিজের জীবন পরিবর্তন করতে পারেনি শিশির। পরিষ্কার বুঝতে পারে, মৃত্যুর বর্ণনা ছাড়া আর কোনো চিহ্ন নেই পরিবর্তনের। একটা অপরাধবোধ, একটা অস্বস্তি এসে বারবার এলোমেলো করে দিয়েছে তার মনকে। প্রতিদিনের অভ্যাস থেকে সরে আসতে চেয়েছিল সে। লিজ, কণার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে মুক্তি পেলেও একাকীত্ব তার পিছন ছাড়েনি। মেয়েদের শরীরে মুগ্ধ হতে পেরেছে, কিন্তু দুঃখে পারেনি। তার মনে হয়েছে—

> "কেন মনে হচ্ছে জীবন যেমন ছিল আর ঠিক তেমন থাকবে না— শরীর থেকে ক্রমশ কমে যাবে হাত-পায়ের জোর, মন থেকে দাপট, স্মৃতিবিজড়িত বিস্মৃতির দিকে ক্রমশ হাঁটতে হবে একা!"[২১]

নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে অনেক চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। বিবেকের কাছে হেরে যায়। সন্তানের ঘৃণার কথা ভেবে আঁতকে ওঠে। 'মানুষ সব পারে কিন্তু সন্তানের ঘৃণা সহ্য করতে পারে না'।[২২] শিশির অপরাধবোধের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য ছটফট করতে থাকে। মৃত স্ত্রীকে উপলক্ষ করে বলে—

"দ্যাখো, কেমন সুন্দরভাবে কেটে যাচ্ছে এক-একটা দিন! কী মধুর নিঃস্বতায় মিশে যাচ্ছে নিঃশ্বাস, স্মৃতি মিশে যাচ্ছে স্মৃতিতে। কাল যেখানে ছিলাম, আজ ঠিক সেখানে নেই। ঘাস মাটি নির্জনতার গন্ধে ভরা এই অন্ধকারে চুপিসারে আরো একটু এগিয়ে যাব কাল— "[২৩]

'সবুজ গন্ধ' (১৯৮২) উপন্যাসের আবহেও আছে মৃত্যুর প্রসঙ্গ। এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মানসী নার্সিং হোমের কেবিনে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাকে কেন্দ্র করে তার স্বামী দীপঙ্কর, বাবা-মা, এবং বোন তাপসীর মধ্যে এক জটিল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যুর ধূসর গন্ধের মধ্যে কেউই স্বাভাবিক থাকতে পারেনি। উপন্যাসটিতে কোনো কাহিনি নেই। চরিত্রগুলোর দোলাচলতা, মানসিক দ্বন্দ্ব, নিঃসঙ্গতা, নিজেদের অপরাধবোধ লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

বাবা-মার অমতে মানসী রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিল দীপঙ্করের সঙ্গে। কয়েকদিন পর মানসী এক জটিল রোগ নিয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি হয়। ডাক্তারের রিপোর্ট শুনে দীপঙ্কর বুঝতে পারে মানসী ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। অসুখ মানুষকে কতো দূরত্বে ঠেলে দেয়, একা করে তোলে, দীপঙ্কর রক্তের প্রবাহে প্রবাহে তা টের পায়।

"মানসীর অসুখটা একা করে দিয়েছে তাকে— এতো একা যে নিজের মধ্যে ক্রমশ আরও একা হতে হতে সে ভুলে যাচ্ছে তার চারপাশ, মানুষজন ও পরিবেশের অস্তিত্ব!"[২৪]

একসময় মানসীর ভালোবাসার স্পর্শে আবিষ্ট হয়ে থাকত দীপঙ্কর। মানসীকে সঙ্গে নিয়ে পাশাপাশি হাঁটলে একরকম গন্ধ পেতো সে। বৃষ্টিভেজা সবুজের আর্দ্রতা মেশানো, অল্প আরকের ছোঁয়া লাগা কিংবা হঠাৎ উড়ে আসা ভোরবেলার হাওয়ার স্নিগ্ধতা ও রহস্যময়তা মানসী চিনিয়েছিল তাকে। সেই কারণেই সবুজ গন্ধের আকর্ষণ তার কাছে ছিল অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু মানসীর অসুস্থতা আর হাসপাতালের স্প্রে করা কৃত্রিম গন্ধের মধ্যে সবুজ গন্ধের মাধুর্যতা হারিয়ে যায়। মানসীর সমগ্র শরীরে ঘ্রাণের ইন্দ্রিয় পরিস্ফুট করে তুললেও সেই বিচিত্র গন্ধ আর পায় না দীপঙ্কর। তখন তার নিশ্বাস এলোমেলো হয়ে যায়। হারিয়ে ফেলে মানসিক ভারসাম্য।

অনেকটা অভ্যাসবশত স্ত্রীর এরকম অবস্থাতেও সে অফিসে যায়, সময় মতো হাসপাতালে যায়। মৃত্যুর মুখে পতিত স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটায়। মানসীর রক্তহীন আঙুল, ফ্যাকাসে ঠোঁট দেখে বুঝতে পারে শুধু সময়ের অপেক্ষা। তারপর সে একা হয়ে যাবে। নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবে। এসব ভাবতে ভাবতে একার ভার দ্বিগুণ হয়ে চেপে বসে তার বুকে। সময় ও দূরত্ব ক্রমশ সৃষ্টি করে আরো বেশি প্রতিবন্ধকতা। কমে আসে তার নিঃশ্বাসের জোর। দূরত্ব কমানোর জন্য মাঝে মাঝে সময়ের আগেই ছুটে আসে হাসপাতালে। কিন্তু মৃত্যুর কাছে সবই হার মানে।

হাসপাতালের আবদ্ধ পরিবেশে থেকে থেকে মানসী নিজের অসুস্থতা ও দীপঙ্করের একটু একটু করে বদলে যাওয়া বুঝতে পেরেছিল। তার শরীর চলে না বলে ভালোবাসার আবেগ দীপঙ্করের কমে গেছে। সে অভিযোগ করে, যার স্ত্রীর এরকম যায়-যায় অবস্থা সে কীভাবে অফিস করে। মানসী সন্দেহ করে দীপঙ্করকে। বিয়েটা সামাজিক মতে হয়নি বলে কি দীপঙ্করের সে পুরোপুরি স্ত্রী নয়। সে শুধু একটু সঙ্গ চায় দীপঙ্করের কাছে। বাঁচার তীব্র ইচ্ছা ছিল মানসীর। পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধে সে নিজেকে আবার নতুন করে সাজিয়ে তুলতে চায়। সুস্থ হয়ে সামাজিক নিয়ম মেনে বিয়ে করবে দীপঙ্করকে। তাই সবুজ পাড়ের শাড়ি পড়ে দীপঙ্করের কাছে নিজেকে আরো সুন্দর করে মেলে ধরতে চায়। শরীরে শক্তি এনে বলে—

> "দীপু তুমি বুড়ো হয়ে যেও না। মনটা ভালো রেখো। মাঝখানের সময়টাকে আমরা বাদ দিয়ে দেব। যেদিন আমাকে ফেরত নিতে আসবে, সেদিন তোমার আজকের বয়সটাকেই সঙ্গে করে এনো। মানুষ তো কিছুর জন্যে বাঁচে, আমি তোমার জন্যেই বেঁচে উঠব!"[২৫]

কমলাকান্ত একদিন আফিমের মাত্রা চাড়িয়ে দেখেছিলেন, 'এই বিশ্বসংসার একটি বড়োবাজার— সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি।...সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে'।[২৬] একুশ শতকেও এই পরিস্থিতির কোনোরকম পরিবর্তন হয়নি। দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্বপ্নকল্পনাটি আত্মস্থ করেছিলেন।

'সম্পর্ক' (১৯৭২), 'বিনিদ্র' (১৯৭৬), 'ঢেউ' (১৯৮৭), 'সিনেমায় যেমন হয়' (১৯৯০) প্রভৃতি উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিত বিজ্ঞাপন ও বিপণন সংক্রান্ত বহু বিষয় তুলে ধরেছেন। আসলে উপন্যাসে এই প্রয়োগ ছিল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল। কর্মসূত্রে ১৯৬৫ সালে তিনি যোগ দেন বিপণন ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত পেশায়। সেইসূত্রে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন অ্যাডার্টস অ্যাডভার্টাইজিং এবং পরে ক্লারিয়ন-ম্যাকান, আনন্দবাজার সংস্থা, দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার সঙ্গে। সেই সঙ্গে আজকাল, যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকাতেও। ১৯৮৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর রূপেও কাজ করেছিলেন। ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সংবাদ পত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বলা যায় সম্পূর্ণ জীবনটাই তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্মৃতিচারণায় বলেছেন—

> "সাধারণের কাছে অপরিচিত এই নতুন জগৎ ও মানুষজন তাদের দ্বন্দ্ববহুল অস্তিত্বের টানাপোড়েন নিয়ে বিপুলভাবে স্পর্শ করেছে আমাকেও, 'সম্পর্ক,' ও 'বিনিদ্র' উপন্যাসে তার আভাস পাওয়া যায়।"[২৭]

'সম্পর্ক' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। লেখক উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন রমাপদ চৌধুরীকে। উপন্যাসটির আবহমণ্ডলে আছে বিজ্ঞাপন জগতের প্রসঙ্গ। প্রধান চরিত্র রামতনু সোম, স্টারলেট হিউমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সে ঐ সময়কার বিজ্ঞাপন জগতের সেরা মানুষ বলে খ্যাত। বিজ্ঞাপন জগতে তার হাতেখড়ি কপিরাইটার হিসাবে। তখন থেকে গত পঁচিশ বছর ধরে স্টাইল প্রিসিসান— এই দুই পরিপূরকের চর্চা করেছেন তিনি। বর্তমানে বিজ্ঞাপন বিষয়ে তার মনোভাব—

> "দেশ স্বাধীন হয়েছে বাইশ বছরেরও বেশি দিন, এই বিপুল সময়ের মধ্যে সর্ব বিষয়ে আমরা স্বনির্ভর হব, পথও যতো খুঁজে নেব নিজেদের মতো করে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতোই বিজ্ঞাপন-চিন্তায় আমরা এখনো মাত্রাতিরিক্ত পরাশ্রয়ী, বিদেশী ভাবনায় অনুপ্রাণিত।"[২৮]

কোম্পানির কাজের জন্য তাকে প্রতিদিন ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি পাঁচ-সাতটি খবরের কাগজ দেখতে হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বিশেষ করে স্টারলেট হিউমের রিলিজগুলো। রিপ্রোডাকসনের কোনো গণ্ডগোল দেখলেই লাল পেনসিল দিয়ে দাগিয়ে রাখে। সে মনে করে

অধিকাংশ লোকই বিজ্ঞাপন জগতে ঠিকঠাক কাজ করতে পারে না। বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার পরও তারা বুঝতে পারে না, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুহূর্তে আমাদের মতো অনুন্নত দেশে বিজ্ঞাপনের চেহারা কী রকম হতে পারে। তার মতে—

> "এখনও এ-দেশের অধিকাংশ বিজ্ঞাপন পরিকল্পিত হয় মুষ্টিমেয় ইংরেজি-শিক্ষিত কেতাবি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে, যাঁরা সাহেবদের অনুকরণে ওঠেন, বসেন এবং নিদ্রা যান। সেই কোটি কোটি বিভিন্ন জনসাধারণের কথা ভুলে থাকি আমরা, চলায় বলায় মানসিক গঠনে যাঁরা পুরোদস্তুর ভারতীয়।"[২৯]

স্বাধীনতার অল্প কয়েকদিন পরে ফিডার লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। ছোটোখাটো যে কয়েকটি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখাশুনার সূত্রে স্টারলেট অ্যাডভার্টাইজিংয়ের পথ চলা শুরু হয়েছিল, ফিডার ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে তারা বেবি ফুড তৈরীর এক বিলিতি ফর্মুলা আমদানি করে নতুন পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে। রামতনু জানত ফিডাররা ভারতবর্ষে এর হৈচৈ তোলার জন্য প্রচুর বিজ্ঞাপন দেবে। ঐ বিজ্ঞাপনের বরাদ্দের টাকা (কুড়ি লক্ষ) রামতনু যে কোনো উপায়ে পেতে তৎপর। প্রথমদিকে রামতনুর বিশ্বাস ছিল দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কারণে 'বনিবেব্'–এর অ্যাকাউন্টটা পেতে স্টারলেট হিউমেই আসবে। কিন্তু স্টারলেট হিউমের দিল্লি ব্রাঞ্চের ম্যানেজার বুধি নায়ার জানান, 'বনিবেব্'-এর অ্যাকাউন্টটা নতুন কোম্পানি ইউরেকার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে। ফলে তাদের পাওয়ার সুযোগ কম। এরকম হলে রামতনুর মান-সম্মানে লাগবে। তাদের কোম্পানি পিছনে পড়ে যাবে। আর একটি ব্যর্থতাই ভবিষ্যতে আরো অনেক ব্যর্থতা এনে দেবে। এই ভেবে রামতনুর মনে জেদ চেপে যায়, যে রকম করেই হোক 'বনিবেব্'-এর অ্যাকাউন্ট সে হাতছাড়া করবে না।

রামতনু সোম অসাধারণ বুদ্ধিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন। তার নানা গুণের মধ্যে একটি অসামান্য আত্মবিশ্বাস। সে 'বনিবেব্'-এর অ্যাকাউন্ট পেতে দিল্লিতে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে যায়। সেখানে কোনো বন্দোবস্ত না হওয়ায়, ম্যানেজার বুধি নায়ারের সঙ্গে প্ল্যান করে। তারা অফিসকর্মী নীরাকে কাজে লাগায়। চাকরিতে ঢুকে অল্পদিনের মাথায় নীরাও নিজের বেতন ও পদোন্নতির জন্য সবকিছু করতে রাজি হয়। কিন্তু নীরা বুঝতে পারে না

তাকে ব্যবসার খাতিরে কাজে লাগায় রামতনুরা। 'আমার সময়' পত্রিকায় দিব্যেন্দু পালিত জানান—

> "এখানে (বিজ্ঞাপন জগতে) মানুষকে বিচার করা হয় পণ্য বা প্রোডাক্ট হিসেবে। এবং সেই প্রোডাক্টের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করেই তৈরী হয় বিজ্ঞাপন।"[৩০]

ব্যবসার জগতের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। যেখানে নারীকে প্রোডাক্ট করা হয়।

বিজ্ঞাপন জগতের প্রসঙ্গ নিয়ে দিব্যেন্দু পালিতের আর একটি উপন্যাস 'বিনিদ্র' (১৯৭৬)। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র দীপ্ত রায়। সে কাজপাগল একজন মানুষ। বিজ্ঞাপন জগতে লড়াকু মানসিকতা নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ ও ব্যক্তিত্ব পাকা করেছে সে। দিনরাত একাকার করে সে নিয়মিত ক্যাম্পেন প্রেজেন্টেশনের কাজ করে চলেছে। স্টারলেট হিউমের হাত থেকে কফি অ্যাকাউন্ট ছিনিয়ে নিতে সে বদ্ধ পরিকর। এদিক থেকে 'সম্পর্ক' উপন্যাসের রামতনু সোমের সে সমগোত্রীয়।

স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভসের নতুন ব্র্যাণ্ডের কফি বাজারে বিক্রি হয়নি। তাই কোম্পানি সেই কফি প্রায় নতুন অবস্থাতেই বাজার থেকে তুলে নেয়। দীর্ঘ ছয় মাস পর কোম্পানি সেই পুরনো কফি আবার বাজারে আনতে চায়। এর জন্য প্রচুর টাকার বিজ্ঞাপন করতে চায় কোম্পানি। সেই অ্যাকাউন্ট পাওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন কোম্পানিগুলির মধ্যে শুরু হয় রেষারেষি। স্টারলেট হিউম, ক্রিয়েটিভ গ্রুপ, হিন্দুস্থান ফস্টার প্রভৃতি বিজ্ঞাপন সংস্থাকে ডেকেছে ক্যাম্পেন তৈরী করার জন্য। কিন্তু কে পায় সেই অ্যাকাউন্ট। বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলির সঙ্গে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির গাঁটছাড়া সম্পর্ক। হিন্দুস্থান ফস্টারের দীপ্ত রায় এই অ্যাকাউন্টটি হাত ছাড়া করতে চাননি। কিন্তু অসুবিধা হলো, তাদের থেকে স্টারলেট হিউমের বিজ্ঞাপন বিষয়ে অভিজ্ঞতা, টিমওয়ার্ক ও প্রফেসনাল নলেজ অনেক বেশি। তাছাড়া ঐ কোম্পানিতে রামতনু সোম ও নির্মল সেনের মতো তুখোড় বিজ্ঞাপনবিদদের অস্তিত্ব। এইরকম একটা অ্যাকাউন্ট তারাও নিতে ভুল করবে না। দীপ্ত তবুও অ্যাকাউন্ট পেতে মরিয়া। তার কাজ সহজ হতো যদি স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভসের মার্কেটিং ডিরেক্টর অশোক মুখার্জি অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে না যেত। নতুন দায়িত্ব পায় সিন্‌হা। মার্কেটিংয়ে সিন্‌হার অভিজ্ঞতা কম। বোধও অস্বচ্ছ। লোকটি স্বার্থ ছাড়া যে একটুও নড়বে না দীপ্ত ভালো করে জানে। অপরদিকে স্টারলেট হিউমের রামতনু সোম নিজে তাদের ক্যাম্পেন প্রেজেন্স করবে—

একথা শুনে দীপ্তর উদ্বেগ প্রায় শূন্য হয়ে আসে। কিন্তু দীপ্তর কাছে যে কেনো মূল্যে লক্ষ্য পূরণই আসল কথা। 'সম্পর্ক' উপন্যাসে অ্যাকাউন্ট পেতে যেমন রামতনু সোম নীরাকে ব্যবহার করেছিল, তেমনি দীপ্তও এরকম ভেবেছে। নিজের অভীষ্ট পূরণের উদ্দেশ্যে সে সুনীতাকে কাজে লাগিয়েছে। অফিসকর্মী সুনীতাকে দিয়ে সিন্‌হার কাছ থেকে মোটা টাকার কফি অ্যাকাউন্ট হস্তগত করেছে।

> "আমি তোমাকে ব্যবহার করেছি মাত্র— বঁড়শির চারের মতো; তুমি অযোগ্য বলে নয়, শুধু সিন্‌হা তোমাকে চেয়েছিল বলে! বলবে কী, স্বার্থের জন্যে নিজের স্ত্রীকেও যে ঠেলে দিতে পারে অস্বস্তিতে, নিঃসম্পর্কিতা একটি মেয়ের জন্য তার প্রাণে দয়া থাকতে পারে না; সত্য সামনে ভেবে দ্যাখো কী করবে তুমি!"[৩১]

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে সুনির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন বা মতাদর্শের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই। ব্যক্তিজীবনেও দিব্যেন্দু পালিত রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়াননি। তবে হ্যাঁ তিনি রাজনীতির কবলে মানুষের ভোগান্তিকে স্বীকার করেছেন, স্বার্থবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে নিজের মতবাদ পোষণ করেছেন, এমনকি নিজের জীবনের বিনিময়েও তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা প্রশাসনের স্বার্থবাদী রাজনীতির কাছে হার মানেননি। দিব্যেন্দু পালিত একজন সমাজ সচেতন নাগরিক এবং লেখক। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররাও এর ব্যতিক্রম নয়।

যাকে দলীয় রাজনীতি বা 'পার্টি পলিটিক্স' বলে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে তার ছায়ামাত্রও নেই। তিনি রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির কোনো তত্ত্ব বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য নিয়েও উপন্যাস লেখেননি। তাঁর পূর্বে অনেক ঔপন্যাসিকই দলীয় রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। যেমন, প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', গোপাল হালদারের 'একদা', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে সমরেশ বসুর 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'তিন পুরুষ', মহাশ্বেতা দেবীর অনেক উপন্যাস, দেবেশ রায় প্রমুখ অনেকের উপন্যাসে কোনো না কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ বড়ো হয়ে উঠেছে। এগুলি সবই সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস।

দিব্যেন্দু পালিত এঁদের থেকে একদম আলাদাভাবে রাজনীতিকে উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। তিনি কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিচয় তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেননি। তাঁর রাজনীতিকে ব্যবহার করার কৌশলটা অন্যরকম। তাঁর উপন্যাসে প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রসঙ্গ আছে ঠিকই— কিন্তু রাজনীতির কোনো দলীয় নাম নেই।

দিব্যেন্দু পালিতের চারটি উপন্যাসে রাজনীতির প্রসঙ্গ আছে— 'আমরা' (১৯৭৩), 'উড়োচিঠি' (১৯৭৮), 'সহযোদ্ধা' (১৯৮৪) এবং 'গৃহবন্দী' (১৯৯১)। এখানে একটি কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দিব্যেন্দু পালিতের লেখক সত্তা বা উপন্যাসের মূল প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল ছয়-সাত-আটের দশকে। মূলত এই সময়কার রাজনীতির প্রসঙ্গই তাঁর উপন্যাসে মূল প্রেরণা হয়ে উঠেছে। খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে নকশালবাড়ি আন্দোলনই তাঁর এই কয়েকটি উপন্যাসের মূল ভিত্তি। এই রাজনৈতিক আন্দোলনটিই তিনি মনে হয় খুব কাছ থেকে সচেতনভাবে দেখেছেন। বলা যেতে পারে অন্য আর কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে নয়, সাতের দশকে তরুণ-তরুণীদের মনে নকশালবাড়ি আন্দোলন যে কী ভয়াবহ অস্থিরতা, বিপন্নতা, অস্তিত্বহীনতা এনেছিল তাই বড়ো করে দেখিয়েছেন তিনি।

'আমরা' দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৭৩ সাল অর্থাৎ সাত-আটের দশকের সেই রক্ত ঝরানোর দিন, নকশাল আন্দোলনের সময়। কিন্তু উপন্যাসটির সময় লেখক উপন্যাসের শুরুতেই বলে দিয়েছেন— ১৯৬৭ সাল, অর্থাৎ তখনো নকশাল আন্দোলনের ভয়াবহতা দেখা দেয়নি। পশ্চিমবাংলায় প্রথম তখন বামফ্রন্ট সরকার খুঁটি গেঁড়ে বসতে যাচ্ছে। নির্বাচনের ফলাফল গণনা চলছে। লোকে লেটেস্ট রেজাল্ট জানবার জন্য ভিড় করছে। আর মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠছে 'যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ'। পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসকে হারিয়ে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার কুড়ি বছর পর দ্বিখণ্ডিত বাংলার মানুষ কংগ্রেসের মন্ত্রীসভাকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। এই রাজনৈতিক গুরুত্বটি অন্ততপক্ষে এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্মরণ করা উচিত।

কিন্তু রাজনীতির এই পালাবদল 'আমরা' উপন্যাসের নায়ক প্রিয়নাথের মনে কোনো সাড়া ফেলেনি। সে তার অর্ধচেতন, অসাড় মন নিয়ে নিজের মনোবৃত্তে ঘুরপাক খায়। চারশো সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সার চাকরি জীবনে প্রিয়নাথ তনুশ্রী নামে একটি মেয়ের প্রেমে আবদ্ধ

হয়, কিন্তু বিয়ে করতে পারে না। সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির চাপে সবকিছুই মনে হয় আবেগহীন ও বেদনাহীন। ভোগ ও ভোগহীনতার মধ্যে কোনোটিরই যেন কোথাও সদর্থক দিক নেই। অন্য নারীর সংসর্গের সময়েও তার অন্তর্দেশ উত্তেজিত হয় না। দিব্যেন্দু পালিতের প্রায় সব উপন্যাসের মতোই এই উপন্যাসটিও একক মানুষের অস্তিত্বহীনতার আখ্যান। লেখক দেখাতে চেয়েছেন স্বাধীনতার কুড়ি বছর পর একটি রাজনৈতিক ক্ষমতার হ্রাস এবং নতুন একটি রাজনৈতিক বাতাবরণে নাগরিকদের মনে কি রকম সচেতনতা এলো। কিন্তু প্রিয়নাথের নির্জীব নির্বিকারত্বের কোনো পরিবর্তন হয় না।

উপন্যাসটিতে একটি রাজনৈতিক মিছিলের বর্ণনা আছে— "আমি দাঁড়িয়ে আছি একা, মিটিং চলছে পুরোদমে, একজন খুব উঁচুতে উঠে চেঁচিয়ে যাচ্ছে : এ-সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম, আমাদের সকলের সংগ্রাম, সুতরাং এ-লড়াই জিততে হবে। মনে রাখবেন আমাদের প্রত্যেকের বুকেই আছে ভিয়েতনাম—। শুনে সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠলো 'ভিয়েতনাম লাল সেলাম' বলে।"[৩২] এটি ভিয়েতনামকে সমর্থন জানিয়ে আয়োজিত একটি মিছিল। ছয়ের দশকের মাঝামাঝি প্রগতিবাদী বামপন্থীদের কাছে 'ভিয়েতনাম' ছিল একটি প্রতিবাদী প্রাণের সংকেতবাহী শব্দ। কিন্তু প্রিয়নাথের পাশে মিছিলে হাঁটা তার সঙ্গী মধু বিশ্বাস হঠাৎ বলে উঠে— 'হ্যাঁ, মশাই প্রিয়নাথবাবু, ভিয়েতনাম জায়গাটা কোথায়? এরকম প্রশ্নে বোঝা যায়, রাজনীতি সম্পর্কে তখনো পশ্চিমবাংলার মানুষ কতোটা অসচেতন।

দিব্যেন্দু পালিতের যখন লেখক জীবন শুরু তখন ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের আবহমণ্ডলে দেশের সর্বস্তরের মানুষ নতুন করে কমিউনিস্ট পার্টির কথা রাজনৈতিক আন্দোলনের আদর্শরূপে ভাবতে পারেননি। চীনকে সমর্থন করা এবং না করার প্রশ্নে পার্টির মধ্যেই দেখা দেয় মতবিরোধ। কমিউনিস্ট পার্টি দু'ভাগ হয়ে যায়। কিছুদিন পর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আর তীব্র খাদ্য সংকটের ফলে মানুষের মনে কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডই আস্থা জাগাতে পারেনি। এরকম পরিস্থিতিতে যখন উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে কৃষক আন্দোলন বিস্ফোরিত হয় তখন তরুণেরা আপ্লুত হয়ে জীর্ণ সমাজকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়বার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে। বাঙালি মধ্যবিত্তরা আবেগ আর ভয়ের টানে গড়িয়ে যান। তবু মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা তাদের স্বপ্ন আর বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে আসে। তাদের ভুল-ভ্রান্তি ছিল, কিন্তু স্বার্থবুদ্ধিবিহীন সেই ভ্রান্তি মানুষের শ্রদ্ধাও অনেকটা আকর্ষণ

করেছিল। সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার আর জেলখানার ভিতরে অমানবিক অত্যাচার, বিচারের ব্যবস্থা না করেই এনকাউন্টার— এসব ঘটনায় একটু হলেও বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ নকশালপন্থী তরুণদের প্রতি সহমর্মী হয়েছিল।

দিব্যেন্দু পালিতের 'উড়োচিঠি' (১৯৭৮) উপন্যাসটি এরকমই আবহে লিখিত। সাতের দশকের রাজনীতি আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ ছিল। এই উপন্যাসেও দিব্যেন্দু পালিত কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন বা মতাদর্শের উপর দৃষ্টিপাত করেননি। আন্দোলন চলাকালীন পুলিসের গুলির আড়ালে যে সমস্ত তাজা প্রাণগুলি বেঁচে থাকে তাদেরকে নিয়ে চিন্তিত লেখক। রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর পুলিসি ব্যবস্থার ফাঁদে পড়ে নিরাপত্তা হারানো তরুণদের লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রজত স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র। একদিন পুলিসের গাড়ি এসে স্কুল থেকেই তাকে তুলে নিয়ে যায়— "জামার কলার চেপে ধরেছে একটা কনস্টেবল, আর একজন টানছে হাত ধরে। বুটের খটখটানি তুলে বেটন হাতে ইন্সপেক্টর এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, কোমরের বেল্টে খোলসপরা রিভলভার। স্কুল কম্পাউণ্ড থেকে যতোই এগোচ্ছে কালো গাড়িটার দিকে, ততোই চিৎকার করছে রজত, স্যার আমাকে বাঁচান। স্যার আমি কিছু করিনি— "[৩৩] এরকম দৃশ্যে স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক সবাই উঠে এসেছে বারান্দায়। কেউ প্রতিবাদটুকু বা আটকানোর চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। ইতিহাসের শিক্ষিকা মৈত্রেয়ী দেবী হেডমাস্টারকে বলেন, "এ কী, মাস্টারমশাই, ছেলেটাকে তো মেরে ফেলবে! আপনি প্রতিবাদ করছেন না কেন!"[৩৪] এর উত্তরে হেডমাস্টারমশাই বলেন, "আমি প্রতিবাদ কররার কে! পুলিশের অর্ডার!...একটা নিরীহ ছেলেকে এইভাবে ধরে নিয়ে গেল! জাস্টিস কি আমার হাতে— !"[৩৫] উপন্যাসের প্রথমে এই অংশটুকুর বর্ণনায় আমরা বুঝতে পারি দেশের বিচার ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত। জেলে গিয়ে রজতকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। বিনা দোষে রজতকে জেল খাটতে হয়েছে। জেলে বসে বসে ভাবে, "সে খুন-টুন করেনি কোনো, জানেই না কেন ধরে আনা হল তাকে। তবে যদি ছাড়া পায়, খুন তাকেও করতে হবে।"[৩৬] আমরা জানি, এইভাবেই সাত-আটের দশকে রাজনীতির আশ্রয়ে অনেক দুষ্কৃতী তৈরী হয়েছিল।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর রজত আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। যে পিতৃবন্ধুর বাড়িতে থাকতো তারা থাকতে দেয়নি। সরকারী চাকরি করা নিজের দাদাও রাজনীতির চাপে তাকে থাকার জায়গা দেয়নি। এমনকি মাসে মাসে যে টাকা দিত সেটাও বন্ধ করে দিয়েছিল। রজত নিজের লড়াই নিজে চালিয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু সেখানেও আকস্মিকভাবে আসন্ন ছাত্র-নির্বাচনে ভোট চাইতে আসা সমর্থক দলের সাথে তার বাদ-বিবাদ শুরু হয়। ক্লাসেই মারপিট হয়। সে মার খায় এবং নিজেও মার দেয়। ভোট চাইতে আসা সমর্থক দলের প্রতি রজতের আচরণে একটু বাড়াবাড়িই ছিল। কিন্তু প্রশাসনের ক্ষমতার রাজনীতির প্রতি তার এই ঘৃণা পূর্বের চেপে রাখা ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ নয় কি?

'চরিত্র' (১৯৭৬) উপন্যাসে ব্রতীন আর আহামরির বারো বছরের দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন ধরা পড়েছে। এতোদিনের দাম্পত্য জীবনে তাদের সন্তান হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দুজনের মধ্যেই দেখা দিয়েছে মনোমালিন্য। মধ্যবিত্তশ্রেণির হওয়ায় দুজনের কেউই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেনি। ব্রতীন কলেজের অধ্যাপক। তার সহকর্মী বন্ধু নৃসিংহকে ঘিরে তৈরী হয়েছে ব্রতীন-আহামরি-নৃসিংহ ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি। নৃসিংহ বিয়ে করেনি। ব্রতীনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের মেলামেশায় বন্ধুত্ব আরো ঘন হয়। আহামরির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা বাড়ে নৃসিংহর। ব্রতীন ধীরে ধীরে বুঝতে পারে তার স্ত্রীর প্রতি নৃসিংহের দুর্বলতা। ফলে ব্রতীনের মনে সন্দেহ ও ঘৃণা এসেছে। নিঃসন্তান আহামরিও নৃসিংহের সঙ্গে সম্পর্কে এতোটা খারাপ চোখে দেখত না। শুধু মাঝে মাঝে তার স্বামীর প্রতি প্রেমের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সিনেমা হলে ব্রতীনের প্রথম চুম্বনের কথা। বারো বছর পর আহামরি বুঝতে পারে তার স্বামীর সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। নৃসিংহই একমাত্র সম্বল তার। তাই ব্রতীনের নিষেধ সত্ত্বেও আহামরি নৃসিংহের সঙ্গে মিশেছে, নৃসিংহের ফ্ল্যাটে গেছে, শরীরী খেলায় মেতেছে। উপন্যাসের শেষে আহামরি সন্তান সম্ভবা হয়েছে। মনের ভিতর তার খুশির আলোড়ন। স্বামীর সন্তান নয় জেনেও সন্তানকে অস্বীকার করেনি। বরং ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়ে মুখ নিচু করে হেসেছে। গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে শান্তির দীর্ঘশ্বাস নিয়েছে।

কুড়ি বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যায় তৃতীয় পুরুষের প্রবেশের ফলে। তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর মিল থাকে না। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কোনো দায়িত্ব, কর্তব্য দেখা যায় না। শুধু সন্দেহ বড়ো হয়ে ওঠে। নিজের সন্তানের মুখ দেখে মনে হয় অন্য কারোর সন্তান।

জ্যোতি আর নীপার দাম্পত্য সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এরকমই কাহিনি গড়ে উঠেছে 'অহঙ্কার' (১৯৮২) উপন্যাসে। জ্যোতি আর নীপার বাড়িতে প্রায় কুড়ি বছর ধরে বাস করে ভারাটে বিমান। দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু নীপা আর বিমানের পারস্পরিক মেলামেশা জ্যোতি সহ্য করতে পারেনি। সন্দেহ করেছে নীপাকে আর তাদের সন্তান সুদেষ্ণাকে। প্রচণ্ড অভিমান আর ক্রোধে স্ত্রীকে একদিন আঘাত করে সে। নীপা স্বামীর উপর বিশ্বাস হারায়। মেয়েকে নিয়ে বিমানের সঙ্গে চলে যেতে চায়। জ্যোতি পৌরুষত্বে এক অর্থে দুর্বল ছিল। তাই নীপাকে বিমানের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বিমান তাদেরকে আশ্রয় দিতে পারেনি। পৌরুষের চেয়ে স্বামিত্বের জোর বেশি থাকায় বিমান নীপা আর সুদেষ্ণাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেনি। ফলে দুই পুরুষের মাঝে নীপা মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে। এই উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নরনারীর সীমাবদ্ধতাকে লেখক দেখিয়েছেন। জ্যোতি সন্দেহের বশে ক্রোধে ঘৃণায় নীপাকে মারলে নীপা স্বামীর দেওয়া সিঁদুরকে কোনোদিন মুছে ফেলতে পারেনি। এক ধরনের নীতিবোধ থেকে বিমানও নীপাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারেনি। উপন্যাসে শেষে জ্যোতি মারা গেলে নীপা আর সুদেষ্ণার প্রতি বিমান এক প্রকারের দায়িত্ববোধ নিয়ে এসেছিল।

গ. তৃতীয় পর্ব ['সহযোদ্ধা' (১৯৮৪) থেকে 'গৃহবন্দী' (১৯৯১)] :

এই পর্বের উপন্যাসগুলি হলো— 'সহযোদ্ধা' (১৯৮৪), 'ঘরবাড়ি' (১৯৮৪), 'আড়াল' (১৯৮৬), 'সোনালী জীবন' (১৯৮৬), 'ঢেউ' (১৯৮৭) 'স্বপ্নের ভিতর' (১৯৮৮), 'অন্তর্ধান' (১৯৮৯), 'অবৈধ' (১৯৮৯), 'সিনেমায় যেমন হয়' (১৯৯০), 'অনুসরণ' (১৯৯০) এবং 'গৃহবন্দী' (১৯৯১)।

'সহযোদ্ধা' উপন্যাসটি নয়ের দশকের গোড়ায় রচিত। কিন্তু এর পটভূমিতে রয়েছে ছয়-সাত দশকের নকশাল আন্দোলন। চারিদিকে তখন বারুদের গন্ধ। ষোলো থেকে ছত্রিশ বছর হলেই পুলিস এনকাউন্টার করে। তবুও যুবশক্তি শোষণশক্তির হাত থেকে মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। এই টালমাটাল রাজনৈতিক হাওয়ার ঝড় এই উপন্যাসের নায়ক আদিত্য রায়ের গায়েও লেগেছিল। তবে রাজনীতির কোনো মতাদর্শ এখানেও নেই। উপন্যাসের পরিণতিতে স্থায়িত্ব লাভ করেছে আদিত্যর বিবেক।

একদিন ভোরে মর্নিং-ওয়াকে গিয়ে সে পুলিসের গুলিতে একটি রোগা ও লম্বা লোককে নিহত হতে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে আসে বাড়িতে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার আত্মবিবেক জেগে ওঠে এবং সে আত্মদ্বন্দ্বে ভুগে। সাক্ষ্য দিবে কী না? পুলিসের কাছে জানাবে কী না? জানিয়েই বা লাভ কী? আর যে খুন হলো তার সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও কেন সে সাক্ষ্য দিবে? কিংবা যে খুন হলো সে কোনো দিন জানতেই পারলো না তার খুনের কেউ সাক্ষী আছে? খুনিদের কোনো বিচার হবে কী না? তার মনে প্রশ্ন জাগে, এই যে আমি এতোদিন ধরে লেখার মধ্যদিয়ে যা বলতে চেয়েছি, এই যে প্রতিবাদের এতো বিবৃতি দিয়েছি; এর অর্থ কি? প্রচণ্ড যন্ত্রণাবোধ মনে নিয়ে দুদিন কেটে যায়। অবশেষে সে স্থির করে থানায় ডায়েরি করবে। পার্ক স্ট্রিট থানায় ফোন করে ঘটনাটি জানালে থানা থেকে তাকে রূঢ়ভাবে ধমক দেওয়া হয়। আদিত্য শেষ পর্যন্ত খুনের প্রমাণ হিসাবে খবরের কাগজে স্বনামে চিঠি লেখে। লেখে সে খুন হতে দেখেছে। সমস্ত ঘটনাটির সঙ্গে মিলে যায় একটা খবর, নকশালদের একজন বড়ো নেতাকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে এবং চারু মজুমদার স্টেটমেন্ট দিয়েছে, সেদিন ভোর রাতেই তাকে পুলিস মেরে ফেলেছে। তাই নকশালরাও আদিত্যকে রাতে ফোন করে হুমকি দেয়, "আপনাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে যাকে মার্ডার করা হয়েছে সে কমরেড শৈবাল মজুমদার। তিনদিন সময় দেওয়া হল। আমাদের অর্ডার না শুনলে আপনাকে শ্রেণীশত্রু বলে ধরে নেওয়া হবে— "[৩৭] আদিত্যর মনে বিস্ফোরণ ওঠে। তার কানে নিজেরই কণ্ঠস্বর বাজতে থাকে সে 'হিপোক্রিট' বা 'কাওয়ার্ড' নয়।

আদিত্যর স্রষ্টা দিব্যেন্দু পালিতের জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটেছিল। ৮ জুন ১৯৯২ সালে বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে চোখের সামনে অন্যায় ঘটতে দেখে চুপ করে থাকতে পারেননি দিব্যেন্দু পালিত। তিনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। এরপর তাঁকে চিঠিতে, ফোনে, এমনকি প্রত্যক্ষেও অনেকে ভয় দেখিয়েছিলেন। এছাড়াও দু'একটি বেনামী চিঠিতে এমন কথাও লেখা হয়েছিল যে, তিনি যে আঙুল দিয়ে ঐ প্রতিবাদ লিখেছেন, সেই আঙুল কেটে ফেলা হবে। যেন আর কোনো দিনও এরকম দুঃসাহস দেখাতে না পারেন। কার্যক্ষেত্রে সেরকম কিছুই ঘটেনি। কিন্তু মনোভাবটা অস্পষ্ট ছিল না।[৩৮]

১৯৯১ সালে প্রকাশ পায় দিব্যেন্দু পালিতের 'গৃহবন্দী' উপন্যাস। এখানে নকশাল আন্দোলনের অন্তিম পর্ব স্থান পেয়েছে বলা যেতে পারে। বাস্তবে একসময় ছাত্র রাজনীতি করা কিছু তরুণ তরুণী রাজনীতি ছেড়ে কেরিয়ারিস্ট হয়ে পড়েছিল। এই উপন্যাসে এরকমই কয়েকজন তরুণ তরুণীকে আমরা পাই। তীর্থঙ্কর, রণজয়, সুশান্ত, সুতপা, পারমিতা— এরা একসময় কলেজে পড়তো এবং রাজনীতি করতো। শৈশবে এরা কমিউনিস্ট পার্টির দীক্ষা নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নিজের কেরিয়ার তৈরী করতে রাজনীতির সাম্প্রতিকতা থেকে সরে গিয়েছে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রণজয়কে কমিউনিস্ট পার্টি করা তীর্থঙ্কর লিখেছে—

> "শৈশবে রাজনীতিতে দীক্ষা লইয়াছিলাম। যত দূর পারিয়াছি পার্টির কাছে আত্মনিয়োগ করিয়া বুঝিয়াছিলাম আমার বিশ্বাসে ভুল নাই— সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রয়াস অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভেদ দূর করিয়া মানুষে মানুষে সাম্য আনিতে পারে, সমাজের পক্ষে অশুভ ও হানিকর শক্তিগুলিকে নির্মূল করিয়া বৈষম্য দূর করিয়া সকলের কাছেই বাঁচার সার্থকতা প্রমাণ করিতে পারে। সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও প্রতিবাদ সংগঠনের মধ্য দিয়া পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকলের জন্য সাম্য অর্জন করিতে পারে। দেশও গড়িতে পারে।"[৩৯]

অনিন্দ্য এবং তীর্থঙ্কর নকশাল আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ছিল। বন্ধু সুশান্তর বিশ্বাসঘাতকতায় অনিন্দ্য পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারায়। অপরদিকে রাজনীতিই ছিল তীর্থঙ্করের শেষ আশ্রয়। আদর্শহীন রাজনীতির উপর সে নির্ভর করতে পারেনি। সে চিঠিতে রণজয়কে জানিয়েছে— "রাজনীতি হইতে আদর্শবোধ ও সততা চলিয়া গিয়াছে; শুধু রাজনীতির জন্য রাজনীতি করিলে যাহা হয় তাহাই হইতেছে। যে যার নিজের পার্টির জন্য এবং নিজের জন্য গুছাইতে ব্যস্ত। ইহাতে যদি মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইতে হয়— দুর্নীতি ও দুষ্কর্ম প্রশ্রয় দিতে হয়, তাহাতেও পিছপা নাই। মানব কল্যাণের লক্ষ্যে স্লোগান আছে, নিরপেক্ষতা নাই, সততাও নাই। ইহার পরিবর্তে ক্ষমতার জোর আসিয়াছে।"[৪০] উপন্যাসের শেষে রাজনীতির কাছে হেরে যাওয়া তীর্থঙ্করের শেষ আশ্রয় হয়ে ওঠে আত্মহত্যা। অপরদিকে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রণজয় ও তার স্ত্রী সংসার ধর্ম পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরা আর পার্টি করেনি। সুতপা একটি অনাথ শিশুকে পালন করে মাতৃত্বের বোধে উদ্দীপ্ত

হয়েছে। আসলে এরা বুঝতে পেরেছিল রাজনীতির মূল্যে কিছু কিছু গোলমাল দেখা দিলেও কোনো কোনো ব্যক্তির নৈতিক মূল্য অটুট আছে এবং থাকবে।

'ঘরবাড়ি' (১৯৮৪) উপন্যাসে ফ্ল্যাটবাড়ি কেনাকে কেন্দ্র করে হিমাদ্রি ও জয়ার পাঁচ বছরের দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরে। এক সময় উভয়ের মধ্যে দাম্পত্য প্রেম ছিল মধুর। পরস্পরের মধ্যে নির্ভরতাও ছিল যথেষ্ট। ছোটো একটা ভাড়াবাড়িতে দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে তাদের মনে হয়েছিল পরাধীন ও পরাশ্রিত তারা। তাই উভয়ের মনে জাগে স্বাধীন ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটা নিজস্ব আশ্রয়। সেই থেকেই তারা একটা ফ্ল্যাট কেনার ভাবনাচিন্তা করে। কিন্তু চরম আর্থিক সংকট দেখা দেয়। স্বপ্ন থেকে আশাভঙ্গের কাহিনিই 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

আবাহন কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির অফিসে পঁচাশি হাজার টাকা অগ্রিম জমা দেবার পরেও শেষ কিস্তির সাড়ে বারো হাজার টাকা দিতে না পারায় জয়া ও হিমাদ্রি ফ্ল্যাটের 'পজিশন' পায়নি। অবশিষ্ট টাকা কীভাবে জোগাড় করবে তা ভেবে দুজনেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষকরে চৌত্রিশ বছরের হিমাদ্রিকে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ ক্রমাগত অসহায় করে তুলেছে। অবশেষে শেষ কিস্তির টাকা কিনারা করতে রাতের অন্ধকারে হিমাদ্রির চোখে পড়ে জয়ার বিছে হার ও দুটো সোনার বালা।

অপরদিকে অবনীবাবু বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে জয়াকে মডেল করার জন্য হিমাদ্রিকে প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে মডেল হিসাবে দেখতে মন চায়নি হিমাদ্রির। তার মনে জয়ার প্রতি অধিকার হারানোর ভয় জেগে উঠে। চরম আর্থিক সঙ্কটে অবনীর প্রস্তাব না মেনে অন্য উপায়ও খুঁজে পায়নি। ফলে স্ত্রীর মডেলিং করাকে কেন্দ্র করে হিমাদ্রির মনে প্রবল দ্বন্দ্বের জন্ম হয়। স্ত্রীর প্রতি সে রুক্ষ হয়ে ওঠে।

জয়ার মনে হয়েছিল অভাবী মানুষের কাছে টাকাই সবকিছুর ঊর্ধ্বে। কোনোরকমে টাকা জোগাড় করে দেনা শোধ করলে আবার আগের মতো সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এরকম অভিজ্ঞতা তার আগেও হয়েছিল। বাপের বাড়িতে সে দেখেছিল অভাবের তাড়নায় কিভাবে দিশাহীন হয়ে পড়েছিল তার বাবা। সেরকম দশায় হিমাদ্রি যেন না পড়ে তার জন্যই সে সাধুখাঁর স্টুডিয়োয় মডেলিং করতে রাজি হয়। মাত্র দু'হাজার টাকার বিনিময়ে জয়ার

পোশাক পরিচ্ছদে আসে অপরিচয়ের আদল। যার মধ্যে হিমাদ্রি কোনো অধিকার দেখাতে পারেনি। ঘরের এক কোণে বসে জয়ার থেকে নিজের দূরত্ব অনুভব করে সে। অপরদিকে হিমাদ্রির সামাজিক অনুশাসনকে উপেক্ষা করা জয়ার পক্ষে সহজ হয়ে ওঠেনি। তাই তাকে কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পেতে আত্মবলিদানের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

'আড়াল' (১৯৮৬) উপন্যাসে রুচি আর সোমেনের দীর্ঘ চব্বিশ বছরের দাম্পত্যসম্পর্কের মধ্যে দেখা দেয় ক্লান্তি বা অবসাদ। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস তখন আর থাকে না। পরস্পরের মধ্যে দূরত্বটাই তখন মুখ্য হয়ে ওঠে। আভা আর দীপঙ্করের দাম্পত্যজীবনেও সুখ আসেনি। তাদের দাম্পত্যজীবনে ক্লান্তি বেড়েছে সন্তান না হওয়ার নিঃসঙ্গতায়। সংসার জীবনের একটানা অভ্যাসে বদ্ধ রুচি নাটকে অভিনয় করার সূত্রে সোমেনের বন্ধু দীপঙ্করের কাছাকাছি আসে। রুচি আর দীপঙ্করের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। এক সান্ধ্য আড্ডায় দীপঙ্কর মদ্যপ অবস্থায় রুচির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে গিয়ে ধরা পরে যায় সোমেনের কাছে। সেই থেকে সোমেনের মনে স্ত্রী সম্পর্কে জেগেছে সন্দেহ। যা ক্রমশ তার ও রুচির মধ্যে দূরত্ব তৈরী করে।

সন্তান-সন্ততি এবং স্বামী থাকা সত্ত্বেও বিয়াল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে রুচির মনে দেখা দেয় তার জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। চব্বিশ বছর ধরে সোমেনের সঙ্গে ঘর-সংসার করার পরেও দীপঙ্করের স্পর্শ তার কাছে হয়ে ওঠে এক ধরনের পরম তৃপ্তি। চব্বিশ বছর ধরে যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে আড়ালে রেখেছিল সে তা এখন দীপঙ্করের মধ্যদিয়ে পূরণ করতে চেয়েছে। দীপঙ্করও আভাকে ডিভোর্স দিতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের সেই অবৈধ ভালোবাসা স্বপ্নই থেকে গেছে। জরায়ু ক্যানসারে রুচির মৃত্যু হয়।

বিবাহবিচ্ছিন্ন দুই নিঃসঙ্গ নরনারীর আকস্মিক মেলামেশায় গড়ে উঠেছে 'মাইন নদীর জল' (১৯৮৮) উপন্যাসটি। এই উপন্যাসটির পটভূমি কলকাতা নয়, জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট শহর। লেখক এই সময় পর্বে বেশ কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৯৭৮ সালে আমেরিকা এবং এরপর জার্মানি, ইতালি প্রভৃতিসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশ যান সেমিনারে কিংবা বক্তৃতা দেবার জন্য। সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসের মূল পুরুষচরিত্রকে অবশ্য কলকাতার মধ্যবিত্ত পুরুষকেই রেখেছেন। পেশায় অধ্যাপক অমিতাভ সেন স্ত্রীর কাছে অপমানিত হয়ে প্রথমে লন্ডন এবং পরে জার্মানি যান সেমিনারে

বক্তৃতা দেবার জন্য। সেখানে তাকে দেখাশোনার জন্য গাইড করে ইউনিভার্সিটির গবেষিকা রোজমেরি কাত্‌জ্‌ নামের একটি মেয়ে। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে অমিতাভের নিঃসঙ্গ মনের চিত্র এবং সেই সঙ্গে রোজমেরির সঙ্গে ক্ষণিকের মেলামেশায় অমিতাভের মানসিক টানাপোড়েনকে লেখক তুলে ধরেছেন।

অমিতাভ ভালোবেসে বিয়ে করেছিল রুবিকে। সাত বছরের দাম্পত্য সম্পর্কে তাদের এক ছেলে হয় কুশ। তাদের সম্পর্কে হঠাৎই তৃতীয় পুরুষের আগমন ঘটে রুবির বন্ধু অতীনের। অতীনের সঙ্গে রুবির মেলামেশাকে মেনে নিতে পারেনি অমিতাভ। অন্যদিকে অমিতাভের সন্দেহকেও মেনে নিতে পারেনি রুবি। রুবি অমিতাভকে একপ্রকার অপমান করে বলে, 'আদিবাসী নিয়ে পড়াশুনো করতে করতে তুমি নিজেও আদিবাসী হয়ে যাবে, এটা বুঝলে এগোতাম না!' এরকম অপমান জীবনে আর কখনো বোধ করতে পারেনি অমিতাভ, সহ্য করতে পারেনি এই অপমানবোধ। তীব্র এই অপমানে ডিভোর্সের দিকে এগোয় তাদের সম্পর্ক। কিন্তু অমিতাভের মনে প্রশ্ন ওঠে—

> "কোনো মানুষ কি সত্যিই একা থাকতে পারে— কি পুরুষ, কি নারী, প্রত্যেকেরই নির্ভরতার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু কিছু চাওয়ারও থাকে, যার মধ্যে নিজের পূর্ণতাকে খুঁজে পাওয়া যায়— "[৪১]

অনুভব করে, "সম্পর্কের আগুনে একবার হাত পোড়ালে ঘা হয়তো শুকোয় কিন্তু দাগটা থেকেই যায়। যদি রুবির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তার, তাহলেও কি রুবি সম্পূর্ণ মুছে যাবে মন থেকে?"[৪২] একপ্রকারের অনিশ্চিতবোধ থেকে একা হতে থাকে অমিতাভ। নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গ খোঁজে যে কোনো একজনের। জার্মানিতে এসে সেই নিঃসঙ্গ জীবনের আনন্দ ফিরে পায় রোজমেরির কাছে। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে এসে আকস্মিকতায় জড়িয়ে পড়ে রোজমেরির ভালোবাসায়। সেই ভালোবাসা ক্রমে শারীরিক সম্পর্কে এগোতে থাকে। বিবাহবিচ্ছিন্না রোজমেরিও তার পঁচিশ বছরের নিঃসঙ্গ জীবনে অমিতাভকে পেয়ে সবকিছু উদার করে দেয়। তখন তাদের সম্পর্কটা গাইড আর ভিজিটরের নয়, সেই চিরন্তন নারী-পুরুষের হয়ে ওঠে।

নষ্ট দাম্পত্য সম্পর্কের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় রচিত 'সিনেমায় যেমন হয়' (১৯৯০) উপন্যাসটি। সিনেমার মতোই মধ্যবিত্ত সংসারে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে সামঞ্জস্যের আস্তরণ দেখা যায়, এই উপন্যাসে গার্গী ও দীপঙ্করের মধ্যে তার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। এদের দাম্পত্য সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে প্রবল টানাপোড়েন। সেই সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার মধ্যদিয়ে সমাপ্ত হয়েছে উপন্যাসটি।

প্রথম থেকেই গার্গীকে দীপঙ্করের পরিবারের লোকজন কেউই পছন্দ করতো না। বাবা-মার অমতে দীপঙ্কর বিয়ে করেছিল অপেক্ষাকৃত অসবর্ণ জাতির মেয়ে গার্গীকে। তাছাড়া স্বাবলম্বী হওয়ার দিকে গার্গীর বাড়তি ঝোঁক ছিল। এখান থেকেই সমস্যার সূত্রপাত। বিয়ের কয়েকদিন পরই স্ত্রীকে নিয়ে দীপঙ্কর চলে আসে ফ্ল্যাটে। দীপঙ্করের ইচ্ছে চাকরি ছেড়ে গার্গী গৃহবধূ হয়েই থাকুক। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রায়ই মান-অভিমান এবং ঝগড়া লেগেই থাকতো। ছেলে জন্মানোয় সেই অশান্তি আরো বাড়তে থাকে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করার ফলে একমাত্র সন্তান দীপ্রকে দেখার কেউ ছিল না। তাই দীপঙ্কর গার্গীর অসহায়তার সুযোগ বুঝে চাকরি ছাড়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু দাম্পত্যজীবনের আড়ালে অর্থনির্ভরতার জন্য গার্গীর চাকরি ছাড়ার জেদ আরো বাড়তে থাকে। কারণ বিয়ের পরও সে বৃদ্ধ বাবাকে সাহায্য করার জন্য প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা করে পাঠাতো। সেই টাকা দীপঙ্কর দিতে চাইলে গার্গী রাজী হয়নি। কারণ দীপঙ্কর শ্বশুর বাড়ি যেত না।

দীপঙ্করের জীবনযাপন ছিল একরোখা প্রকৃতির। বড়োলোক বাবার একমাত্র পুত্র হিসাবে সে অশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। স্ত্রী-সন্তান কাউকেই সময় দিতে পারেনি। উপরন্তু তাদের উপর জোর খাটিয়েছে। সামাজিক অনুশাসনে বদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিল গার্গীকে। গার্গীকে সন্দেহ করেছে। গার্গীর বৌদির দাদা ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে। সবশেষে দীপঙ্কর গার্গীকে ডিভোর্স দিয়ে শান্তা নামের আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে।

গার্গী আর দীপঙ্করের দাম্পত্য সম্পর্ক মাত্র সাত বছর টিকে ছিল। লেখক এখানে দেখিয়েছেন, দাম্পত্যজীবনের কতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও নানামুখী ফাটলের সৃষ্টি করে। সম্পর্ক একটা সংস্কার হয়ে দাঁড়ায় মাত্র। এর অন্তরালে যে যার নিজের মতো আচরণ করে চলে।

বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে দিব্যেন্দু পালিতের একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস ‘সোনালী জীবন’। উপন্যাসটি ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক এটি উৎসর্গ করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারের কাহিনি উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ সৈনিক আর্থার পাইবাস বার্মামুলুকে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আর দেশে ফিরতে পারেনি। এখন তার বয়স আশি। স্ত্রী ডরোথি, ছেলে রবিন, পুত্রবধূ সারা, তাদের ছেলে স্যামুয়েল, আর্থারের তিন মেয়ে রোজালিন, অড্রি এবং লরা— এদের নিয়ে কলকাতার রিপন স্ট্রিটে সোনালী জীবন শুরু করেছিল। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সারা। সে বাঙালি মেয়ে। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে কলেজে ঢোকবার আগেই আর্থার পাইবাসের ছেলে রবিনের সঙ্গে বিয়ে হয়। তখন আর্থার বলেছিল, ‘তুমি এক সোনালী জীবনে এসে প্রবেশ করছ, তোমার সংস্পর্শে যেন সকলের ভাল হয়’।[৪৩] সারা গোটাজীবন ধরে সেই চেষ্টাই করেছিল। নিজের দেহসর্বস্ব দিয়েও বাঁচাতে চেয়েছিল পরিবারটিকে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে তাকে আত্মহত্যার পথ খুঁজে নিতে হয়। আর্থার পাইবাসের স্বপ্নে দেখা সোনালী জীবন নষ্ট হয়ে যায়।

উপন্যাসে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে বিনা লাইসেন্সে গাড়ি চালানো এবং অ্যাক্সিডেন্ট করার অপরাধে স্যামুয়েলের পুলিসের হাতে ধরা পড়া এবং ছেলেকে ছাড়াতে গিয়ে পুলিসের সঙ্গে বচসায় রবিনেরও জেল হওয়াতে। পাইবাস পরিবারের সঙ্কটে রিপন স্ট্রিটের আর পাঁচটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবার সহানুভূতি দেখালেও সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। স্বামী ও ছেলেকে ছাড়াতে সারাকেই থানায় একা যেতে হয়। সারার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে থানার বড়বাবু তাকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করে। শুধু তাই নয়, স্বামী আর ছেলেকে জেল থেকে ছাড়াতে সারাকে বড়বাবুর বন্ধু সিং-এর কাছেও ধর্ষিত হতে হয়। সারা পুরোপুরি উপভোগ্যের পণ্য হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত নারী সারা কলঙ্কের ভয়ে কাউকে বলতেও পারেনি। আড়ালে থেকে গেছে বিষয়টা। এই পরিস্থিতিতে সারা আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে। কিন্তু পারে না। বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি, ক্ষ্যাপাটে স্বামী আর বাউণ্ডুলে ছেলেকে ফেলে একা মুক্তির কথা ভাবতে পারেনি। তাই তো সংসারকে ফেরাতে বড়বাবুর বন্ধু সিং-এর দেওয়া চাকরি নিতে হয়েছিল সারাকে। চাকরি দেওয়ার পিছনে বড়বাবুর মতলব বুঝতে পারে সারা। একটুখানি বাঁচার মতো বেঁচে থাকার জন্য স্বামী আর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে

অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে তার মানসিকতার অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অপমান, ক্ষোভ আর যন্ত্রণা নিয়ে সে আত্মহত্যা করে। রোজালিনকে চিঠি লিখে শেষ হয় তার বক্তব্য—

> "অন্যকে নিয়ে বাঁচার আগে মানুষকে আগে বাঁচতে হয় নিজেকে নিয়ে— নিজের শুদ্ধতাই অন্যকে স্পর্শ করে, পরিশুদ্ধ করে। আমার সব জবাবদিহিও তো আমার নিজেরই কাছে! সেটা করতে গিয়ে দেখছি, যে-সারাকে আমি চিনতাম সে আর কোথাও নেই।"[৪৪]

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির আত্মপ্রকাশ চোখে পড়ার মতো ছিল। ব্যবসা, পুঁজি, লেনদেন, মুনাফা অর্জনের নেশায় পরস্পরের মধ্যে ভয়ংকর রেষারেষি চলেছিল। জনগণের বিলাসিতা ও ভোগসুখকে কাজে লাগিয়ে বাজার ধরার জন্য মেতে উঠেছিল, তাতে প্রতিষ্ঠানের আগে ব্যক্তিমানুষ কোনোদিনই গুরুত্ব পায়নি। নিজের যাবতীয় দক্ষতা ও তৎপরতা সত্ত্বেও ব্যক্তিমানুষ একা হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদ নারীর দৈহিক সৌন্দর্যকে নিয়েও বাণিজ্যে নেমেছে। রাজনৈতিক নেতারাও অবতীর্ণ হয়েছিল শোষকের ভূমিকায়। তারাও মুনাফার নেশা আর ক্ষমতার স্বপ্নে মেতে উঠেছিল। এসব নিয়েই দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস 'ঢেউ' (১৯৮৭)।

'ঢেউ' উপন্যাসটি বিজ্ঞাপন ও বিপণন বিষয়ে দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র তিনটি— অপরেশ গুপ্ত, অপূর্ব বসু এবং সীতা চৌধুরী। অপরেশ গুপ্ত অ্যাকশন গ্রুপ অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাণ্ড মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েটস কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ঔপনিবেশিক বেনিয়াবুদ্ধি তার মাথায়। তার কাছে আগে ব্যবসা, তারপর ব্যক্তির স্থান। তার মতে—

> "পাবলিক মানেই মুখ নেই, চোখ নেই, কান নেই, পেট নেই, খিদে নেই। সুতরাং পাবলিকের টাকা নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো— ।"[৪৫]

অপরেশের কোম্পানীর পুরনো ও দক্ষকর্মী অপূর্ব বসু এবং নতুন ও অনভিজ্ঞ কর্মী সীতা চৌধুরী। কোম্পানিতে সীতা চৌধুরীর প্রাধান্যের জোরে তীব্র অভিমান নিয়ে অপূর্ব বসু অপরেশের কাছে রেজিগনেশন লেটার জমা দিয়েছে। তাতে ব্যবসায়িক সম্পর্কের

টানাপোড়েনে তিনজনের মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে। অপরেশের চোখে মুখে শুধু মুনাফার স্বপ্ন। গিলবার্ট মরিসন হিকস্-এর চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই একটা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি খোলে— অ্যাকশন গ্রুপ অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাণ্ড মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন। তার ব্যবসা পাঁচ বছরে কুড়ি লাখ থেকে দেড় কোটিতে পৌঁছায়। সেই সময় এই সাফল্য ছোটোখাটো একটা আলোড়ন বাজারে ফেলেছিল। অপরেশের সাফল্যের উপর আস্থা রেখেই হাইগ্রেনের মার্কেটিং ডিরেক্টর শিবাজী রাও গিলবার্ট মরিসন থেকে একটা বড়ো এবং পুরনো অ্যাকাউন্ট তুলে দিয়েছে অ্যাকশন গ্রুপকে। অপরদিকে বিউটি প্রোডাক্টস লিমিটেডের কুড়ি-পঁচিশ লাখ টাকার অ্যাকাউন্ট পেতেও মরিয়া হয়ে যায় অপরেশ। বিউটি প্রোডাক্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর লাডলীমোহন সরকার তুখোড় বেনিয়াবুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু মদ ও মেয়ে পেলে সব কিছু ভুলে যায়। অপরেশ বিউটি প্রোডাক্টের অ্যাকাউন্ট পেতে সীতাকে ব্যবহার করেছে। সীতার ছিল অফুরন্ত আকর্ষণী শক্তি ও যৌবনের মাদকতা। বিজ্ঞাপন এবং ব্যবসার জগতে যার প্রয়োজন অপরিসীম। এই সীতা সম্পর্কে অপূর্বর বক্তব্য—

> "মানুষও দ্রব্য কিংবা প্রোডাক্ট, মানুষেরও আছে উপযোগিতা এবং টিকে থাকার সময়সীমা। সুতরাং, ওকে পাবার জন্য কেউ দাম দেবে, ওকে স্পর্শ করার, চুম্বন করার, ওর মাংসের স্বাদে ও সৌন্দর্যে সঞ্জীবিত হবার জন্যেই ভাগ্যবান হবে সে।"[৪৬]

আসলে নারীর শরীর নিয়ে পুঁজিবাদ বাণিজ্যে নেমেছে। বিক্রম দাসের স্টুডিওয় ছবি তোলার সময় অ্যাসিস্ট্যান্ট মনোজ জানিয়েছে, 'শুধু ব্রা দেখা গেলে চলবে না, লাস্ট লাইনেরও এক্সপোজার চাই'। এর জন্য নিজেকে মেলে ধরতে সীতা নিজের শরীরে ক্রিস্টিয়ান দিওরের চড়া গন্ধ ফেলে। কোমরের উন্মুক্ত মাংস জুড়ে তার সোনালি আভা। আঁচল নামানো, লোট-কাট স্লিভলেস ব্লাউজ, সুগঠিত বুক, মুখে মিলিয়ন ডলারের হাসি। সীতা হাসলে তার শরীরও হাসে। নারী শরীরের এই পণ্যায়ন দিব্যেন্দু পালিতের 'বিনিদ্র', 'সম্পর্ক', 'অনুভব' প্রভৃতি উপন্যাসেও দেখা যায়।

কংগ্রেস পার্টির কনফারেন্স উপলক্ষে দেওয়া ফুল পেজ বিজ্ঞাপনে কোম্পানির রোজগার পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা। অপরেশ ব্যবসায়ী। সে জানে, কোম্পানির লাভের জন্য একজন দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন। তাই পুরনো দক্ষ কর্মী অপূর্বর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। এর জন্য তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সীতাকে তার ফ্ল্যাটে পাঠিয়েছে। কিন্তু অপূর্বর

দক্ষতা আর অভিজ্ঞতার কাছে সীতার রূপ আর সৌন্দর্যের কোনো দাম থাকে না। বিউটি প্রোডাক্টসের মার্কেটিং ডিরেক্টর লাডলীমোহন সীতাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছে বলে অপরেশ অ্যাকশন গ্রুপ থেকে অবলীলায় তাকে বহিষ্কৃত করেছে। ব্যবসার খাতিরে সীতা বা অপূর্ব দুজনকেই ব্যবহার করেছে অপরেশ। দুজনের মধ্যেই শূন্যতা দেখা দিয়েছে। সীতা নতুন একটি অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি খুললেও তার ব্যবসা টিকেনি। আত্মহত্যার মধ্যদিয়ে সে মুক্তির পথ খুঁজেছে।

'মধ্যরাত' উপন্যাসের দু-দশক পর দিব্যেন্দু পালিত লেখেন 'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসটি। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। উপন্যাসটি লেখক উৎসর্গ করেন সাংবাদিক আশীষ বর্মনকে। 'মধ্যরাত'-এ দিব্যেন্দু পালিতের যে অপরিণত বা অসম্পূর্ণ মনোভাব ধরা পড়েছে, 'স্বপ্নের ভিতর' তাঁর সফলতা বা পরিপূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। 'মধ্যরাত'-এ যে নারী চরিত্রগুলি তিনি অঙ্কন করেছেন সেগুলির মনের গভীরতা খুবই কম। চরিত্রগুলি মনের মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলে না। চরিত্রগুলি শুধু নিজেদের কথা বলে গেছে, আনন্দঘন পরিবেশে কাটিয়েছে। কিন্তু 'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসে চরিত্ররা অনেক বেশি অন্তর্মুখী স্বভাবের। লেখক তাদের অনেক বেশি মনের গভীরের কথা বলেছেন। ফলে কাহিনি বা ঘটনাকে বেশি প্রাধান্য দেননি। মাত্র পাঁচটি ছোটো অধ্যায়ে উপন্যাসটি শেষ করেছেন।

এই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রে রয়েছে মেয়েদের থাকার জন্য 'দক্ষিণী' নামক একটি আবাসন। এখানকার মেয়েরাও সবাই পেশাগত দিক থেকে চাকরিজীবী। মেয়েরা স্বাধীনভাবে থেকেছে। কিন্তু আগের উপন্যাসের মেয়েরা যেভাবে নিজেদের কথা একে অপরকে জানিয়েছে। এই উপন্যাসে তারা সহজ সরল হতে পারেনি। নিজেদের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করেনি। সবসময় চরিত্ররা একা একা থেকেছে। নিঃসঙ্গ সময়ে আড়াল খুঁজেছে। অতীত স্মৃতি বারবার মনে করতে গিয়ে মনে আঘাত পেয়েছে। দিব্যেন্দু পালিত নারীমনের অন্তর্জগতকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই হয়তো এই উপন্যাসের অবতারণা করেছেন।

সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত থাকায় দিব্যেন্দু পালিত নিরুদ্দেশ, অপহরণ বিষয়ে কয়েকটি গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। কমবয়সী মেয়ে, নববিবাহিতা যুবতীর অপহরণ স্থান পেয়েছে 'অন্তর্ধান' (১৯৮৯), 'অনুসরণ' (১৯৯০), 'সোহিনী এখন কোথায়' (২০০০) প্রভৃতি

উপন্যাসে এবং 'পুরুষ' গল্পে। এই উপন্যাসগুলিতে দিব্যেন্দু পালিত সংবাদপত্রের কিছু কিছু সংবাদ তুলে ধরেছেন। এতে আমরা তাঁর সাংবাদিক সত্তার পরিচয়ও পাই। যেমন, 'অন্তর্ধান' উপন্যাসের শেষে তিনি বলেছেন—

> "সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু সংবাদ বিচ্ছিন্ন ও পরিবর্তিতভাবে ব্যবহার করা হলেও এই উপন্যাসের সব চরিত্র এবং যাবতীয় ঘটনাই কাল্পনিক।"[৪৭]

'অন্তর্ধান' উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু এক অষ্টাদশী তরুণী ইনার (পুতুল) অন্তর্ধান রহস্যকে কেন্দ্র করে। তারপর ইনার পিতা সুশোভনবাবুর মেয়েকে নিরন্তর খোঁজা চলতে থাকে। বড়দাদা হার্ট আট্যাক করার খবরে সুশোভন একমাত্র মেয়ে ইনাকে পাঠিয়েছিলেন খবর নিতে। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে সে হারিয়ে যায়। হঠাৎকরে মেয়ের নিরুদ্দেশে সুশোভন এবং তার স্ত্রী লীনা স্তম্ভিত, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মেয়েকে খুঁজতে গিয়ে সব রকমের চেষ্টা থেকে ব্যর্থ হন। পুলিস, আইন, সরকারের সবরকম তল্লাশি খুঁজতে ব্যর্থ হয় ইনাকে। পুলিসকে না জানিয়ে প্রথমে উকিল বীরেন দত্তের শরণাপন্ন হন। ইনার বন্ধু টুংকার কাছ থেকে জানতে পারেন বরুণ নামে একটি ছেলের সাথে ইনার অ্যাফেয়ার ছিল। ইনাকে শেষ দেখা গিয়েছিল গড়িয়াহাটের মোড়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ। টুংকার দাদা নকুল দেখেছিল বরুণের সঙ্গে একটা ট্যাক্সিতে উঠতে।

এরপর সুশোভনবাবু থানায় ডায়েরি করেন। পুলিস আশ্বাস দেন কয়েকদিনের মধ্যে তার মেয়েকে খুঁজে বের করবেন। কিন্তু এভাবে দু'সপ্তাহ কেটে যায়। কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না ইনার। থানায় বারবার গেলে সুশোভনবাবুকে অপমানিত হতে হয়। পুলিস-প্রশাসনের ব্যর্থতা উপন্যাসে উঠে আসে। সুশোভনবাবু সংবাদপত্রে মেয়ের নিখোঁজের খবরটা দেন— 'অষ্টাদশী তরুণী নিখোঁজ' বলে। কিন্তু এতে তার বিপদ বাড়ে। কেউ বেনামি চিঠি লিখে তাকে ধমকান। হুমকি দেন, মেয়ের ভালো চাইলে যেন তার খোঁজ নেওয়া না হয়।

এই পর্যন্ত উপন্যাসের গতি একটা সরল পথে চলছিল। এরপর শুরু হয় সুশোভনবাবুর মেয়েকে নিরন্তর খোঁজা। সেপথে তিনি একা। কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজেই মেয়ের খোঁজে বের হন। জনৈক এক বিশ্বস্ত লোকের সাথে ধানবাদ, জামসেদপুরে

যান। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারেন তার মেয়ে যে ছেলেটির সাথে পালিয়েছে সে আসলে একটা কুচক্রের সঙ্গে জড়িত। ছেলেটি তার মেয়ের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে।

সংবাদপত্রের খবরে আমাদের চমকিত হতে হয়, 'সুশোভন মুখার্জিও হারিয়ে গেলেন?' শুনে মেয়েকে খুঁজতে গিয়ে নিজেও হারিয়ে গেলেন সুশোভনবাবু। আমাদের হতাশ হতে হয় পুলিস-প্রশাসনের ব্যর্থতা দেখে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রদবদল হয় পুলিসে। নতুন অফিসার লোহিত রায় দায়িত্ব নেন। খবরের কাগজে তার সাক্ষাৎকার বের হয়—

> "শুধু এই রাজ্যে বা এই দেশেই নয়, বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই, বিশেষত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অন্তর্ধানজনিত ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে।...অন্তর্ধানজনিত ঘটনার চরিত্রও পাল্টে যাচ্ছে ক্রমশ এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলির সঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণ জড়িত থাকছে না। অনেক ক্ষেত্রেই এর পিছনে থাকছে বৃহত্তর রাজনৈতিক কিংবা বাণিজ্যিক কারণ।"[৪৮]

'অনুসরণ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। আঠাশ বছর বয়স্কা একজন বিবাহিতা যুবতী এষাকে নিয়ে গভীর রাতে উধাও হয় একটি ট্যাক্সি। ড্রাইভারসহ আরো দুজন সন্দেহজনক চরিত্রের পুরুষ ছিল ঐ ট্যাক্সিতে। উধাও হবার আগে এষার স্বামী অনীশ দত্তকে মারধোর করে ফেলে দেয় রাস্তার ধারের গর্তে। অনীশ দত্ত ঘটনাটি পুলিশের কাছে জানালেও সবার কাছে গোপন রেখেছেন।

দিব্যেন্দু পালিত কাহিনিকে এদিকে না নিয়ে গিয়ে কাহিনির আপতিক প্রভাব ছাড়িয়ে আমাদের সবাইকে নিয়োজিত করেন নিরন্তর অনুসরণের কাজে। যে অনুসরণ একসময় নিজের দিকেই। অর্থাৎ সমাজ-শ্রেণি-সময়ের অনুসরণ। পেশায় সাংবাদিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি অনীশ দত্ত এষার দুর্বৃত্তদের দ্বারা অপহৃত হওয়ার ঘটনাটি খবরের কাগজে দিতে পারতেন। কিন্তু দেননি। আগের রাতের ঘটে যাওয়া ঘটনাটি তিনি এক আঙ্কিক শৃঙ্খলায় ভাবতে থাকেন। যতো সময় যাবে সমস্যা ততোই বাড়বে বলে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

> "অনীশ ভাবল, এখন মানেই এই মুহূর্ত। পরের মুহূর্তগুলি সৃষ্টি হবে আরও ব্যাপক সময়ের। এবেলার পর আছে ওবেলা। আজকের পর কাল, তারপর পরশু, এইভাবে।"[৪৯]

তার চলাফেরা, ভাবভঙ্গি বদলাতে থাকে। পুলিস তার কথায় অসঙ্গতি পেলে তার পিছনেই লোক লাগায়, অনুসরণ করে। এষাকে না খুঁজে তাকেই গ্রেপ্তার করে, কোর্টে নিয়ে যায়। অনীশ বুঝতে পারে না, কোন কেসের জন্য পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করেছে। বিচারকের সামনে পুলিস কারণ দেখায়—

প্রথমত, এষা দত্ত নিখোঁজ হওয়ার পর তার স্বামী অনীশ দত্ত নিজের আত্মীয় ও পরিচিতদের কাছে নানা ধরনের পরস্পরবিরোধী কথা বলেছে। যেমন, এষা দত্তের শ্বশুর-শাশুড়ি জানতেন না যে তাদের পুত্রবধূ নিখোঁজ হয়েছে। এষার মাকে অনীশ দত্ত বলেছে এষা কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেছে।

দ্বিতীয়ত, এইরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে স্ত্রীর অন্তর্ধান বিষয়ে অনীশ দত্তের কাছে কোনো দুশ্চিন্তা, শোক এবং উদ্বেগ তৈরী হয়নি। বরং স্ত্রী নিখোঁজ হওয়ার পর তার আচরণ ও কথাবার্তায় সেরকম কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায়নি।

তৃতীয়ত, এষা দত্তেরই সমবয়সী একজন বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে এইসময় অনীশ দত্তকে ঘনিষ্ঠভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।

চতুর্থত, অনীশ দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক রিপোর্টে তিনি কয়েকজন মহিলা এবং পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেন। ঐ রিপোর্টে মধ্য কলকাতার একটি গলির নাম করে সেখানে থাকেন বলে একজন লেডি ডাক্তারের উল্লেখ করেন অনীশ দত্ত। কিন্তু ওখানে কোনো লেডি ডাক্তার ছিলেন না আর ঐ গলিটি দুটি বড়ো রাস্তার মধ্যে সংযোজক মাত্র, ওখানে একটি বস্তি আছে।

অনীশ দত্ত অবশ্য জামিনের আবেদন করেননি। কিন্তু সুবিচারের স্বার্থে তিনি তার বক্তব্য আদালতে পেশ করেন। তিনি জানতে চান, ব্যক্তিগত কারণে গোপনীয়তা রক্ষা ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত কিনা? এষা এখানে দুর্বৃত্তদের দ্বারা অপহৃত— একথা সত্য কিংবা কনসেপ্ট। কিন্তু অনীশ দত্ত নিজেই এক অনুসরণের প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

> "গ্রেপ্তার হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত যেমন নিরপেক্ষ ছিল, তেমনি নিরপেক্ষভাবেই সে অনুসরণ করল পুলিসকে।"[৫০]

ঘ. চতুর্থ পর্ব ['সংঘাত' (১৯৯২) থেকে 'একদিন সারাদিন' (২০০৩)] :

এই পর্বের উপন্যাসগুলি হলো— 'সংঘাত' (১৯৯২), 'ভোরের আড়াল' (১৯৯৩), 'অনুভব' (১৯৯৪), 'অচেনা আবেগ' (১৯৯৫), 'সেকেণ্ড হনিমুন' (১৯৯৭), 'মৌনমুখর' (১৯৯৮), 'মাত্র কয়েকদিন' (১৯৯৮), 'যখন বৃষ্টি' (১৯৯৯), 'হঠাৎ একদিন' (২০০০), 'সোহিনী এখন কোথায়' (২০০০), 'বহুদূর অভিমান' (২০০২) এবং 'একদিন সারাদিন' (২০০৩)।

সিনেমা, নাটক, থিয়েটার, চলচ্চিত্র প্রভৃতি বিষয়ে দিব্যেন্দু পালিত যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। নির্মাল্য আচার্য্যের সঙ্গে সম্পাদিত চলচ্চিত্র বিষয়ক রচনা 'শতবর্ষে চলচ্চিত্র' (দুই খণ্ড-১৯৯৬ ও ১৯৯৮) প্রবন্ধ গ্রন্থে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

> "তিনি দেখেন, শোনেন তো বটেই। কিন্তু সব থেকে বড় কথা তিনি অনুভব করেন গাঢ়, তিনি তাঁর বিষয়ের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যান গভীর থেকে গভীরে। তাঁর লেখায় ভিন্ন মাধ্যমের প্রতি আগ্রহের বিষয়টি আমরা আগেই বলেছি। ফিল্মের পাশে গ্রুপ থিয়েটারও তাঁর আগ্রহের বিষয়।"[৫১]

নাট্যজগৎকে কেন্দ্র করে তিনি দুটি উপন্যাস লিখেছেন— 'সংঘাত' (১৯৯২) এবং 'মৌনমুখর' (১৯৯৮)। 'সংঘাত' উপন্যাসে দল ভাঙা-গড়া, নাটকের মহড়া, উত্থান-পতন ইত্যাদির কথা আছে। আর 'মৌনমুখর' তো একটি নাট্যদলেরই নাম। বিভাস চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, মৃণাল সেন প্রমুখরা এখানে নাটক দেখতে আসেন। শুধু তাই নয়, আনন্দবাজার, স্টেটসম্যান প্রভৃতি পত্রিকায় নাটক সম্পর্কে চমৎকার রিভিউয়ের কথাও উঠে আসে। নাট্য জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের স্বাদু উপস্থিতি এই উপন্যাসের সম্পদ। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা, এই উপন্যাসে নাটক থেকে জীবন, জীবন থেকে নাটকে অনায়াস যাতায়াত চলতে থাকে।

'সংঘাত' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঋতুপর্ণা সংসারকে আর্থিক সংকট থেকে মুক্ত করতে নাটকে অভিনয় করে। একদিকে সংসার আর একদিকে নাটক— এ দুইয়ের মাঝখানে তার মধ্যে চলতে থাকে মানসিক দ্বন্দ্ব। সংসারকে বাঁচাতে নাটক ছেড়ে একসময় তাঁকে পেশাদারি থিয়েটারে যোগ দিতে হয়। কিন্তু তার ভালোলাগার প্রাণকেন্দ্র নাট্যজগৎ।

অর্থের প্রয়োজনে শিল্পীর শিল্পসত্তা নষ্ট হতে থাকে এখানে। 'মৌনমুখর' উপন্যাসেও অন্যতম চরিত্র ব্রততী অর্থের মোহে নাটক ছেড়ে একসময় টিভি সিরিয়ালে নাম লিখিয়েছিল।

বিশ শতকের সাত-আটের দশক থেকে বাজার অর্থনীতি সমাজকে গ্রাস করেছিল। ফুটপাত জুড়ে বসা শুরু করেছিল এই বাজার অর্থনীতি। কোনোকিছুই এই গ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি। শিল্পের জগৎও এর থেকে বাদ পড়েনি। ছোটো-বড়ো যে কোনো নাট্যদলই পেশাদারি থিয়েটার বা সিনেমার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। শিল্পের জগতে নতুন নতুন মুখ প্রতিমুহূর্তেই পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় মেতেছে। সিরিয়াল কিংবা সিনেমার সঙ্গে গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পীদের অভিনয়ের দ্বন্দ্ব 'মৌনমুখর' উপন্যাসে লেখক দেখান। অন্যদিকে নাটককে কেন্দ্র করে একশ্রেণির মুনাফালোভীর দলও গড়ে উঠেছিল। সরোজ কিংবা অশোকের কাছে শিল্পের কোনো মূল্য নেই, মুনাফা অর্জনের জন্য তারা প্রতি মুহূর্তে শিল্পীকে কাজে লাগিয়েছে। ব্যক্তিগত মুনাফালাভের জন্য সরোজ নারীর চেহারা, সৌন্দর্য অর্থদিয়ে কিনে নিতে চেয়েছিল। নিজের কমার্শিয়াল নাটকে সে আরো জনপ্রিয় করে তুলতে চেয়েছিল। সিগারেট ব্যবসায়ী অশোক তার স্ত্রীকে নাটকের জগতে এনে ব্যবসা করতে চেয়েছিল। নাট্যশিল্পী ব্রততী এই সব ব্যবসায়িক ব্যক্তির কাছে বিভ্রান্তে পড়েছিল। অর্থের মোহে পড়ে সে নিজের খ্যাতিকে নষ্ট করে ফেলেছিল। নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। গ্রুপ থিয়েটার থেকে টিভি সিরিয়ালের দিকে ঝুঁকেছিল। কিন্তু টিভি সিরিয়ালে ব্রততীর ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগেনি। সেখানে জীবনের স্পন্দন খুঁজে পায়নি। স্বামীর মুনাফালাভকে ফেলে চলে আসে। গ্রুপ থিয়েটারে ফিরে আসতে চায় আবার। মনে পড়ে যায়, গ্রুপ থিয়েটারে নাটকের জন্য শিল্পীর ভালোবাসা, আবেগ, আত্মত্যাগকে। শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে এখানে।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তড়িৎ, একজন নিবেদিতপ্রাণ নাট্যকর্মী। সে থিয়েটারকে কখনোই টিভি সিরিয়াল বা ফিচার ফিল্মে পৌঁছবার মাধ্যম হিসেবে দেখেনি। থিয়েটার তার কাছে একটা আলাদা প্ল্যাটফর্ম, অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েও সে নাটককে ছাড়েনি। তার চোখের সামনে অন্য নাট্যকর্মীরা গ্ল্যামার, অর্থের মোহে দিগভ্রান্ত হয়ে গ্রুপ থিয়েটার ছেড়ে চলে গেছে। থিয়েটার চালানোর মতো সাংগঠনিক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে তড়িৎ। একসময় ভেঙে যেতে থাকে সে। কিন্তু দ্রুত সাফল্য আর সিরিয়াল-সিনেমায় চান্স

পাওয়ার জন্য সে কোনোদিন আগ্রহ দেখায়নি। সহজসরল গতিতে, বহু উত্থানপতনকে অঙ্গীকার করেই সে লড়ে গেছে আজীবন। থিয়েটার তার জীবনচর্চা। শুধু সাফল্য আর আত্মতৃপ্তিতে সে নিমগ্ন থাকেনি। নাটক তার স্বপ্ন আর তৃষ্ণা বুনে দিয়েছে।

টিভি-সিরিয়াল টাকা দেয়, এক্সপোজার দেয়— এটাতেই অনেকের মোক্ষ। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর্টের আশপাশ দিয়েও পথ হাটে না টিভি-সিরিয়াল। দিব্যেন্দু পালিত খুব সুন্দরভাবেই তার নিজস্ব মনোভাব উপন্যাসের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। আলো কিংবা মঞ্চনির্মাণ প্রসঙ্গেও দিব্যেন্দু পালিতের গভীর জ্ঞান উপন্যাসে ফুটে উঠে। যেমন, একটি লাইন— "আলো বাউন্স পাওয়ার জন্যে চওড়া কাঠে সাদা রঙ লাগাচ্ছে তমাল।"[৫২] কিংবা "বিভাস বললেন, লাইটের ব্যাপারে আর একটু ভাবো। দু'এক জায়গায় ভুল এমফ্যাসিস পড়ছে মনে হল। ওই যে ব্রততীর 'তোমাকে চিনতে পারছি না কেন-কেন-কেন' ওখানে তোমাকে ধরেছে একটু দেরিতে। আগে ব্রততী, পরে তড়িৎ— এরকম ডিভিশন হবে কেন? লাইটও ইন্টার অ্যাক্ট করুক'।[৫৩]

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে মেয়েরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বন্ধন থেকে বেরোতে চেয়েছে। মাতৃত্বে নয়, পত্নীত্বে নয়, নারীত্বেই তাদের নিজের পরিচয় খুঁজতে চেয়েছে। এ খোঁজা যে সবসময় সফল হয়েছে তা নয়। কিন্তু এই খোঁজার মধ্যেই তাদের চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে। 'আড়াল' কিংবা 'অবৈধ' উপন্যাসের রুচি কিংবা জিনা এই আত্ম-আবিষ্কারের প্রবল তাগিদেই হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী। কিন্তু সমাজের ব্যাধি তাদের সফল হতে দেয়নি। বরং পরবর্তীতে লেখা 'স্বপ্নের ভিতর' (১৯৮৬), 'সংঘাত' (১৯৯২) এবং 'অনুভব' (১৯৯৪) উপন্যাসে মেয়েদের দিব্যেন্দু পালিত বেশি স্বাধিকার দিয়েছেন। স্বনির্ভর এবং স্বাধিকার পেতে চাওয়া মেয়েরা আলাদা জমি খুঁজেছে নিজেরা দাঁড়াবার জন্য, বাঁচবার জন্য। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়েছে মেয়েরা। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসার ফলে অসুবিধা হয়েছে ঠিকই কিন্তু অদম্য আত্মবিশ্বাস তাদের পৌঁছে দিচ্ছিল কোথাও, যেখানে তারা অন্যের জন্য কেবল নিজের হাতই বাড়িয়ে দেয়নি, বাড়িয়ে দিয়েছিল আশ্বাসের হাতও।

দিব্যেন্দু পালিতের লেখায় নারী ও পুরুষ— উভয়ের সংকট তীব্রভাবে এসেছে। মেয়েরা তো প্রথানুগ খেলার পুতুল নয়ই, বরং সময়ের প্রেক্ষাপটে নানা সংঘাতের মধ্যে তারা লড়াই করে বেঁচে থাকে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে হেরে যাওয়াকে জীবনের শেষ বলে

দেখাতে চাননি লেখক। মেয়েদের বাঁচাতে, জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে নতুন নতুন পথ দেখিয়েছেন তিনি। 'সংঘাত' (১৯৯২) উপন্যাসে এরমকমই একটা বিষয়কে তুলে ধরেছেন লেখক। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঋতুপর্ণার জীবন সংগ্রাম আমাদের মধ্যে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস তৈরী করে দেয়। বিয়ের দুমাস পরে বিধবা হয়ে অভাবের সংসারে ফিরে আসতে হয় তাকে। অসুস্থ বাবার চিকিৎসা আর সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেয়। সামান্য বেতনের একটি পার্ট-টাইম চাকরি পায় স্কুলে। কিন্তু তাতে সংসারের অর্ধেকও চলে না। থিয়েটারে অভিনয় করে বাকিটা পূরণ করে।

অফিস থিয়েটারের কিংবা গ্রুপ থিয়েটারের মহড়া দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে লেখক দেখিয়েছেন মধ্যমগ্রামের নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের জীবননাট্যের কয়েকটি দৃশ্য। অভিনয় করে বেশি রাতে অন্য পুরুষের সাথে বাড়ি ফিরলেও তার মা ভারতী দেবী তাকে কোনো প্রশ্ন করে না। বরং বলে, "তোর বাবার চশমার পাওয়ারটা বোধহয় বেড়েছে। সামনের মাসে একটা চশমা করিয়ে দিস তো!"[৫৪] তার মা সম্ভবত ভেবেছিল উপার্জনের টাকা টাটকা থাকতে থাকতেই দাবিটা জানিয়ে রাখা দরকার। এইভাবেই অর্থ চেনায় সম্পর্ককে। সদ্য যুবতী ছোটোবোন সুপর্ণার উগ্র সাজকে ধমক দিলে সে-ও বলে ওঠে, 'বিধবা হয়ে তুমি সাজতে পারো, আমি পারি না কেনো!' এর সঙ্গে যুক্ত হয় তার মায়ের মন্তব্য, 'যা দেখছে তাই শিখছে! ওর আর দোষ কী'। ঋতুপর্ণার কিছু বলার থাকে না। দর্শকহীন নাটকের শেষ দৃশ্যের মতো নিজের ভূমিকাটা সে বোঝে।

এই উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা ও মধ্যমগ্রাম। তবে পরিবার আর নির্দিষ্ট কয়েকটি চরিত্র ছাড়া পরিপার্শ্ব তেমন স্পর্শ করেনি এর কাহিনিকে। অন্তত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণাকে পাড়াপড়শির কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে হয়নি কাউকে। লেখক এখানে দেখিয়েছেন শিল্প আর শিল্পী কীভাবে এক হয়ে যায়। জীবনের সংঘাত কীভাবে কখনো কখনো মূর্ত হয়ে ওঠে শিল্পের শিরোনামে। তিন স্তরে তিন অঙ্কে 'সংঘাত' নাটকে সীতার নারীজীবনের পঞ্চাশটি বছর দেখান নাট্যকার মৃণালবাবু। সাধারণ এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত যুবতী থেকে স্ত্রী হয়ে মা, তারপর বিধবা হয় সে। ঘর ও বাইরের টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত হতে হতে প্রৌঢ়া, তারপর বৃদ্ধা হয়। পঞ্চাশ বছরে তাকে ঘিরে সংসারের চেহারাই শুধু পাল্টায় না। নানা আর্থ-

সামাজিক, রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যদিয়ে পাল্টে যায় দেশের ইতিহাসও। উপন্যাসের নায়িকা ঋতুপর্ণারও জীবন কাহিনি অনেকটা এইরকম।

দিব্যেন্দু পালিতের 'অনুভব' উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৯৩ সাল। উপন্যাসটি ১৯৯৮ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পায়। এই উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র আত্রেয়ী। আত্রেয়ীর লন্ডনে বিয়ে হওয়ার পর সে বুঝতে পারে তার স্বামী অন্য নারীর প্রতি আসক্ত। অপমানিত হয়ে দেশে ফিরে আসে। শুরু হয় অপূর্ণতা, নিঃসঙ্গতা ও অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত তার বদলে যাওয়া জীবন। আগের জীবন আর ফিরে আসে না। বাড়ির লোকজনও আগের মতো আর ব্যবহার করে না। তার নিজের মা'ও বলে, আত্রেয়ীর এই অবস্থা হলে বিয়ের আগেই বাড়ির প্ল্যানে আর একটা ঘর রাখতো। বোনের রুমে তাকে থাকতে হতো। বোনরাও অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে, তাই বাড়ির বাইরেও বের হয় না। আসলে মধ্যবিত্ত পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি হওয়ায় অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। আত্রেয়ী বুঝতে পারে নিজেকে টিকে রাখতে গেলে স্বাবলম্বী হতে হবে। তাই বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে। দাদার বন্ধু উৎপল এই সময় তার জীবনে দেবদূত হয়ে আসে। সেই একমাত্র ভরসা। অবশেষে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টায় সে একটি রিসার্চ এজেন্সিতে চাকরি পেয়ে যায়। সেখানে বিশ্বের সর্বত্র মেয়েদের কীভাবে বাধ্য করা হচ্ছে পতিতা বা কলগার্লের বৃত্তিতে তার রিপোর্ট তাকে তৈরী করতে হয়। এইভাবে রিসার্চ রিপোর্টের মধ্যদিয়ে এগোতে এগোতে একটা সময় আসে রিপোর্টের বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে তার জীবনের বাস্তবের কিছু কিছু ঘটনা মিলে যাচ্ছে। সে যদি আর একটু এগোয় তাহলে সেও এদের দলেই পড়বে। যখন দেখে নির্যাতিতাদের শোষণ করা হচ্ছে বা তাদের প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে দেহদানে বা বিক্রয়ে বাধ্য করা হচ্ছে মেয়েদের তখন তার মধ্যে একটা প্রতিবাদ জেগে ওঠে। সে রিসার্চ এজেন্সির চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়।

এই বিষয়টা বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বের স্বাদ এনেছিল। সাহিত্য অকাদেমির প্রস্তাবে এই উপন্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে উপন্যাসটি বাংলায় লেখা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এটি হিন্দি, তামিল, তেলেগু, গুজরাতি ইত্যাদি যে কোনো ভাষাতেই লেখা হতে পারতো। এমনকি যে কোনও বিদেশি ভাষাতেও লেখা যেত। কারণ এর বিষয়টা এতোই সর্বজনীন ও সামগ্রিক।[৫৫] এর কাহিনিতে এক জায়গায় ইউনেস্কোর একজন ডিরেক্টর মিসেস তামজালির দীর্ঘ বক্তৃতার

মধ্যদিয়ে দিব্যেন্দু পালিত তৃতীয় বিশ্বের এক ক্রমবর্ধমান সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। এশিয়া, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে যেভাবে দেহোপজীবিনীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং বৃত্তিটাকে যেভাবে টিঁকিয়ে রাখা হয়েছে, তাতে সুস্থ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা ভাবা ও সমাধান করা উচিত। মিসেস তামজালি এখানে দেশ-বিদেশে নির্যাতিত, ধর্ষিত মেয়েদের যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তা চিনিয়ে দেয় আমাদের সভ্যতার তথাকথিত প্রগতিকে।

সিমার্‌স্‌-এ যে প্রোজেক্টে কাজ করেছিল আত্রেয়ী তা হলো কলকাতার দেহোপজীবিনীদের নিয়ে একটি সমীক্ষা— তারা কোন আর্থ-সামাজিক শ্রেণিতে পড়ে, কোন অবস্থায় তারা এই পেশা বেছে নিয়েছে ইত্যাদি। লেখক সাধারণ একটি মেয়ের স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলতে গিয়ে পাঠকের অনুভবকে বিদ্ধ করেন। প্রশ্ন তুলেন, "মানুষের ইতিহাস, সভ্যতা, মানবিকতা, নীতিবোধও অগ্রগতির দাবি করে, কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা যাচ্ছে, এই একটি ক্ষেত্রে নারীর অসহায়তা, নারীকে হৃদয়, বোধ, অনুভূতি বর্জিত শুধু ধর্ষণের বস্তু হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা অতীতের ঘটনার তুলনায় একেবারেই কমেনি।"[৫৬]

'অচেনা আবেগ' (১৯৯৫) দিব্যেন্দু পালিতের এক অসামান্য প্রেমের উপন্যাস। তিন বছর প্রেম করার পর শমিতা হঠাৎ জানতে পারে তার প্রেমিক জয়দীপের আগেই এক বিয়ে হয়ে গেছে এবং এক সন্তানও আছে। জয়দীপের স্ত্রী বন্দনার আবির্ভাবে শমিতা জানতে পারে জয়দীপ তার কাছে নিজের আত্মপরিচয় গোপন করেছে। এই প্রবঞ্চনা সহ্য করতে না পেরে জয়দীপকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরই কিছুদিন পরে টেলিফোনে খবর পায় এক ভোররাতের অদ্ভূত পরিবেশে জয়দীপ আত্মহত্যা করেছে। এখানেই উপন্যাসের কাহিনি শেষ হয়ে যেতে পারতো। "কিন্তু, প্রায় অভাবনীয় তাৎপর্যে শেষের পরেই শুরু হয়েছে এই অসামান্য প্রেমের উপন্যাস : অচেনা আবেগ— যেখানে স্মৃতি ও নিঃসঙ্গতার অন্তর্লীন অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে ক্রমশ আবেগের পূর্ণতায় পৌঁছে যায় শমিতা, ফ্রেমে বাঁধানো ছবির সাদৃশ্যে মৃত্যু ও জীবন ছুঁয়ে থাকে পরস্পরকে।"[৫৭]

উপন্যাসে লেখক শমিতার প্রেমের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একান্নবর্তী পরিবারের মেয়ে শমিতা। সরকারী অফিসে চাকরি করে পরিবারের ভার সেও কিছুটা নিয়েছিল। তাই নিজের পছন্দ মতো জীবনসঙ্গী খুঁজে নিতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি। যত্রতত্র যাওয়ার কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। বাড়িতে বিয়ের কথা বলেছিল। অনেক দূর

এগিয়েও ছিল। শমিতা জয়দীপের উপর নির্ভর করে নতুন নতুন স্বপ্ন দেখেছিল। জয়দীপ পেশায় অফিসকর্মী হলেও সে ছিল আর্টিস্ট। ভালো-মন্দ বিচার আর অনুভূতির জগৎটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতীত আর ভবিষ্যৎকে ভুলে সে বর্তমানকে বেশি বিশ্বাস করতো। বর্তমানের ভালোবাসাকে গুরুত্ব দিয়েছিল বলে প্রথম পক্ষের স্ত্রী আর সন্তানের কথা জানায়নি। সে চেয়েছিল বিয়ে করে শমিতাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে।

জয়দীপ ধুতি, পাঞ্জাবি পড়ে বরের বেশে আত্মহত্যা করেছিল। সে মরে গিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল তার ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না। আর ভালোবাসার এই আবেগকে আঁকড়ে ধরেই শমিতা বাকি জীবনটা কাটাতে চেয়েছিল। তাই বাড়িতে যখন আরো বিয়ের খবর আসে সে নিজেকে 'বিধবা' বলে দেয়। এমনকি আর এক পুরুষ অফিসের বস দেবপ্রিয় তার কাছে আসতে চাইলে সে না নাকচ করে দেয়। জয়দীপের ভালোবাসা, শরীরী আকর্ষণ শমিতা কোনোদিনই ভুলতে পারেনি। তার এই ব্যক্তিগত আবেগ কাউকে বলতেও চায়না। তার মনে হয়, "কিছু সত্য থাকে যা ব্যক্তিগত, শুধু অনুভূতিতে জড়ানো... যা নিজের মধ্যেই আড়াল করে রাখতে হয়।"[৫৮]

জয়দীপের মৃত্যুর পর তাকে ঘিরে সেসব স্মৃতি সবসময় এক অচেনা আবেগে আচ্ছন্ন করে রাখে শমিতাকে। একসময় ভাবে জয়দীপের মৃত্যুর জন্য বন্দনাই দায়ী। কেন সে তাদের সম্পর্কে ঘি ঢালতে এসেছিল। কেন দেখাতে এসেছিল ডিভোর্সি সার্টিফিকেট আর ছেলে কোলে নেওয়া জয়দীপের ছবি। না হলে তাদের সম্পর্ক ভাঙত না আর জয়দীপ বেঁচে যেত। সাময়িকভাবে ভেঙে পড়ে সে। তার অভাববোধ, অপরাধবোধ— যেভাবেই ভাবুক না কেন শমিতা আজকে একা হয়ে পড়েছে। বাস্তব তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তাই উপন্যাসের শেষে তার উক্তি—

> "যতদিন যাচ্ছে ততই তোমাকে জড়ানো আমার অনুভূতিগুলো কীরকম তীব্রতায় ফিরিয়ে আনছে আমার মধ্যে! দেখছ না, কীভাবে ভরে উঠছে তোমার পাশের শূন্যতা!"[৫৯]

দুই বিবাহিত নারী ও পুরুষের গোপন প্রেমের সম্পর্কের কুশলী উন্মোচন দিব্যেন্দু পালিতের 'মাত্র কয়েকদিন' (১৯৯৮) এবং 'হঠাৎ একদিন' (২০০০) উপন্যাস। বিয়ে করে

ছেলে অন্যত্র চলে গেলে অদিতি একা হয়ে পড়ে। বিয়ের পর স্বামী আর স্বামী মারা যাওয়ার পর ছেলের উপর নির্ভর করে বাঁচতে চেয়েছিল অদিতি। কিন্তু ছেলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ের পর বাড়ি বদল করে অন্যত্র চলে যায়। শুরু হয় অদিতির নিঃসঙ্গ জীবন। একাকীত্ব গ্রাস করে চারিদিকে। একা, স্বজনহীন, নিঃস্ব এবং নিঃশেষিত— এই আবর্তের ঘূর্ণিপাকে অদিতির মনে হয়েছিল এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কী? সে চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে একটা আশ্রয়, একটা অবলম্বন চেয়েছিল। যা কেবল অন্য পুরুষ দিতে পারে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিষ্ণুর মৃত্যুর পর অদিতি আর তার ছেলের প্রতি একসময় দায়িত্ববান হয়ে উঠেছিল বিষ্ণুর বন্ধু প্রিয়ব্রত। প্রিয়ব্রতর কাছেই সে অবলম্বন চেয়েছিল, প্রিয়ব্রতও ফিরিয়ে দেয়নি। নিজের অপূর্ণ জীবনের ক্ষোভ ও অভিমান সব মিলিয়ে দিতে চেয়েছিল প্রিয়ব্রতর সান্নিধ্যে এসে। কিন্তু পারস্পরিক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও অদিতি স্বামীর স্মৃতি আর পুত্রের প্রতি ভালোবাসাকে অস্বীকার করেনি। তাই প্রিয়ব্রতর কাছ থেকে দূরে সরে এসেছিল। প্রিয়ব্রতও অদিতির উপর নিজের অধিকার আরোপ করতে পারেনি। হঠাৎ শুরু হয়ে হঠাৎই যেন শেষ হয়ে যায় অদিতি আর প্রিয়ব্রতর সম্পর্কের পূর্ণতার সম্ভাবনা। পূর্ণতার তাৎপর্য তাদের কাছে অন্যভাবে ধরা দিয়েছে।

> "নিজেদের জন্যে কবেই আর কী ছিল আমাদের! তবু আমরা তো আমাদের মধ্যেই ছিলাম— সেই কোন যুগ থেকে এতগুলো বছর! দুঃখ নিয়ে, বাঁধা নিয়ে, দূরত্ব নিয়ে এইভাবেই কি কাছাকাছি থাকতে পারব না বাকি দিনগুলো!"[৬০]

দুই প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর জটিল অথচ তীব্র মানবিক সম্পর্ক আশ্চর্য নৈপুণ্যে উদ্ঘাটিত করেছেন লেখক তাঁর এই ভিন্ন স্বাদের উপন্যাসে।

'হঠাৎ একদিন' উপন্যাসেও লেখক প্রেমের এক অন্য মাত্রাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমেরিকায় একটা ফটোগ্রাফির পুরস্কার আনতে গিয়ে শ্রীজিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কলকাতার এক খবরের কাগজের সিনেমা-সাংবাদিক আনন্দকমলের স্ত্রী অনুজার। শুরু হয় তাদের অবৈধ প্রেমের খেলা। নায়গ্রা জলপ্রপাতে 'মেড অব দ্য মিস্ট' ট্যুরের অতি সুন্দর পটভূমিতে দুজনের সেই আকস্মিক পরিচয় এমনই এক বন্ধনে জড়িয়ে ফেলে যে কলকাতায় ফিরেও চলতে থাকে তাদের উদ্দাম লুকোচুরি খেলা। অনুজা বুঝতে পারে না তাদের এই আকর্ষণটা শুধুই শারীরিক কি না। অবৈধ, অসামাজিক জেনে শ্রীজিতকে তার শরীর

ব্যবহারের সুযোগ দিলেও, মন দেয়নি। শ্রীজিতের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক সত্ত্বেও সে তার স্বামী আনন্দকমলকেই ভালবাসে। শ্রীজিতের উদ্দাম আকর্ষণ টানেও সে কখনো আনন্দকমলকে ছেড়ে যেতে চায়নি। আনন্দকমলের ভালোবাসাও তার কাছে মিথ্যে হয়ে ওঠেনি।

চরিত্রে কিছুটা লাগাম ছাড়া হলেও নামকরা ফটোগ্রাফার শ্রীজিতও তার স্ত্রীর প্রতি এমন কোনো অবহেলা দেখায়নি। যার ফলে পরবর্তীতে তার স্ত্রী বিপাশা কোনো অনুযোগ করতে পারে। সেজন্য সেও বিপাশাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবেনি। প্রায় অহেতুক একটি সম্পর্কের টানাপোড়েনে তীব্র এই কাহিনি প্রেম ও প্রেমহীনতার এক আপাত-ধূসর আখ্যান, হয়তো তা থেকে উত্তরণও।

স্ত্রী অপহরণ নিয়ে লেখা দিব্যেন্দু পালিতের আর একটি উপন্যাস 'সোহিনী এখন কোথায়' (২০০০)। উপন্যাসটি 'অনুসরণ' উপন্যাসের কিছুটা পরিবর্তিত রূপ। মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করার জন্য লেখক কাহিনি ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। 'অনুসরণ' উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র অনীশ ও এষার বদলে 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসে ধীমান ও সোহিনীকে এনেছেন। অনীশের মধ্যে যে দ্বিচারিতা দেখা গিয়েছিল, ধীমানের মধ্যে তা আরো প্রবল হয়ে উঠেছিল। এষা আর সোহিনী— দুজনেই উপন্যাসের কেন্দ্রে থেকেও উপলক্ষমাত্র।

এই উপন্যাসেও দেখা যায় শুরুতেই সোহিনীকে কয়েকজন দুষ্কৃতি অপহরণ করে নিয়ে গেছে। যথেষ্ট গোপনীয়ভাবে ধীমান সেই রাত্রেই থানায় ডায়েরি করে। অনীশের মতো ধীমানও একটি সংবাদপত্রে কাজ করে ঠিকই কিন্তু অপহৃত স্ত্রীর খবরটা সংবাদপত্রে ছাপায়নি। স্ত্রীকে খোঁজা বাদ দিয়ে সংবাদপত্রের ঘটনাগুলিকে পরপর বিশ্লেষণ করে। মিলিয়ে নিতে চায় নিজের জীবনের ঘটনাগুলির সঙ্গে। চিকিৎসার খরচ মেটাতে না পেরে এক প্রৌঢ় দম্পতি আত্মহত্যা করেছেন। কোন ডাক্তার তাদের চিকিৎসা করেছিলেন সেই তথ্যটি খবরের কাগজে না থাকায় সে বিপন্নবোধ করে। আরো বিপন্ন হয়ে পড়ে খবরের কাগজে টিভিস্টার নিশা দত্তের সুইসাইডের খবরটি প্রৌঢ় দম্পতির খবরের থেকে বেশি বড়ো করে ছেপেছে বলে। এই উপন্যাসে অনীশের আত্মদ্বন্দ্বকেই লেখক বেশি করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন বিষয়ক উপন্যাস 'সেকেন্ড হনিমুন' (১৯৯৭)। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শিলাজিৎ আর সুপর্ণার আঠারো বছরের দাম্পত্যজীবন ভেঙে যায়

পারস্পরিক সন্দেহের কারণে। শিলাজিৎ মদ্যপ, তাস খেলে, অন্য মেয়ের প্রতিও তার আসক্তির শেষ নেই। এই সব জানার পর শিলাজিতের সঙ্গে সুপর্ণার নিত্য ঝগড়া, কথা কাটাকাটি, এমনকি শিলাজিৎ সুপর্ণার গায়ে হাতও দিয়েছিল। উপন্যাসে জটিলতার সৃষ্টি হয় সুপর্ণা আর অভিমন্যুকে ঘিরে। চাকরিজীবী সুপর্ণার অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হয় এবং তাকে ড্রপ করে দেয় অভিমন্যু। এই দৃশ্য দেখার পর শিলাজিৎ স্থির থাকতে পারেনি। সুপর্ণার সঙ্গে অভিমন্যুর অবৈধ সম্পর্কের কথা শিলাজিৎ অফিসের কলিগ, এমনকি তার বোন দেবজানীর কাছে পূর্বেও শুনেছিল। সেই রাতে শিলাজিতের ক্রোধ শারীরিক হয়ে ওঠে। অপ্রত্যাশিতভাবে সুপর্ণাও পাল্টা আঘাত করে। এবং মধ্যরাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এক গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে। আঠারো বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক নিমেষেই ভেঙে যায়। আসলে 'আঠারো বছরের গড়ে ওঠার মধ্যেই থেকে যায় ভাঙার উপলক্ষ, সম্পর্কজনিত অভ্যাসের মধ্যে ধরা পড়ে না ভিতরের ক্ষয়। আস্তে আস্তে ছড়ায়। হঠাৎ আঘাতের ধকল সহ্য করতে না পেরে মট করে ভেঙে যায় একদিন।"[৬১]

ষোলো-সতেরো বছরের দাম্পত্যসম্পর্ক যদি হঠাৎ করে ভেঙে যায়— একথা শুনে অনেকে হাসবে, আবার অনেকে আঘাত পাবে। এই আশঙ্কা থেকে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের ঘটনা প্রফেসর দেবমাল্য আর শ্রেয়া সবার কাছ থেকে আড়াল করতে চেয়েছে। তাদের একমাত্র কিশোরী মেয়ে রিয়াকে জোর করে হস্টেলে পাঠিয়েছে। সম্পর্কের শিকড় এতোটাই আলগা হয়ে গেছে যে কোর্টের রায় বেরোবার আগেই পরস্পরের থেকে আলাদা থেকেছে। কিন্তু একবারও ভেবে দেখেনি পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণুতা, ঈর্ষা, সন্দেহ থেকে যে-বিচ্ছেদের শুরু, তার মূলে কতোটা সত্য আর কতোটা অনুমান— এই বিচ্ছেদ তারা নিজেরাই সহ্য করতে পারেনি। ফলে উভয়ে অতীত স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগেছে। দেবমাল্য অনুতপ্ত হয়েছে—

> "যখনই নিজেদের ভেঙে যাওয়া সম্পর্কটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তখনই অবধারিতভাবে মনে পড়ে সতেরো বছরের টুকরো টুকরো অনেক ঘটনা যার মধ্যে সুখ ছাড়া কিছু নেই। তখন অনুতপ্ত লাগে নিজেকে, কখনওবা আচ্ছন্ন হয়ে যায় দৃষ্টি, মনে হয় ইচ্ছে করলেই এই বিচ্ছেদ এড়ানো যেত।"[৬২]

পরাগের সঙ্গে শ্রেয়ার সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ করেছিল দেবমাল্য। আর রণিতার সঙ্গে দেবমাল্যর অ্যাফেয়ার চলছিল এই নিয়ে সন্দেহ করেছিল শ্রেয়া। কিন্তু কাউকে পছন্দ করা বা কারো সঙ্গে একটু বেশি মেলামেশা করলে এই রকমের সন্দেহ হয়েছে দুজনের, পরে তা উভয়েই বুঝতে পেরেছে। সেপারেশনে থাকলেও শ্রেয়া এখনো তার স্ত্রী। কথাবার্তা এবং যোগাযোগ থাকলেও দেবমাল্য বুঝতে পারে যতো দিন যাচ্ছে ততোই একান্ত হতে হতে ইচ্ছেগুলো হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ। অপরদিকে তাদের সম্পর্কের অবনতির ফলে তাদের মেয়ে রিয়াকে 'ভিক্টিমাইজ্ড' হতে হয়েছে। তবে রিয়ার 'সেনসিটিভ' মনকে লেখক এখানে তুলে ধরেননি। 'বহুদূর অভিমান' (২০০১) উপন্যাসে রাজদীপের মধ্যে দিয়ে সেই 'সেন্সিটিভ' কিশোর মনকে লেখক তুলে ধরেছেন।

বিবাহ বিচ্ছিন্ন বাবা-মার কাছ থেকে ক্রমশ দূরে চলে যেতে থাকে রাজদীপ। বাড়িতে থাকার সময়ই বাবা-মার সম্পর্কের অবনতিটা টের পেয়েছিল। কখনো কখনো রিঅ্যাক্টও করতো। একবার বাবা-মার কথা কাটাকাটি উত্তাল হয়ে উঠলে সে ফল কাটার ছুরি নিয়ে তাদের বেডরুমে ঢুকে পড়েছিল। ঐদিনের পর রাজদীপের সামনে ব্রতীন আর অনিশা ঝগড়া করেনি।

'যখন বৃষ্টি' উপন্যাসে রিয়াকে তার বাবা-মা 'সেপারেশন'-এর কথা গোপন রেখেছিল। রিয়ার পড়াশুনার কোনো ক্ষতি যেন না হয় তাই মাঝে মাঝে দেখা করতে গিয়েছিল রিয়ার হস্টেলে। পরবর্তীতেও মেয়েকে আঘাত না দেওয়ার জন্য দেবমাল্য আর শ্রেয়া দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবেনি। কিন্তু 'বহুদূর অভিমান' উপন্যাসে 'সেপারেশন' পর্ব থেকেই বাবা-মা'র স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে— এটা বোঝানো হয়েছিল রাজদীপকে। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে রাজদীপকে আশ্বাস দিয়েছিল স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হলেও রাজদীপের কাছে তার বাবা-মার সম্পর্ক একই রকম থাকবে। কিন্তু জীবন ও সম্পর্কে জড়ানো এই উপন্যাসের চরিত্ররা ইতিমধ্যেই সরে এসছে তাদের নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে। আলগা হয়ে গেছে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো। অনিশার সঙ্গে ব্রতীনের সম্পর্ক আর নেই। যদিও ব্রতীন আর অনিশা— দুজনেরই রাজদীপের সঙ্গে এখনো সম্পর্ক আছে। কিন্তু ব্রতীনের মুখে অনিশা দ্বিতীয় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুনে রাজদীপের মন রুক্ষ ও এলোমেলো হয়ে যায়।

"যেখানে এক অবরুদ্ধ স্রোতের মতো অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে থমকে আছে বহুদূর অভিমান। তার ছোট বুদ্ধি দিয়ে পরমহংস বুঝতে পারে রাজুর এই অভিমান যতই সত্য ও বাস্তব হোক, দাম পাবে না তত; তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে জমা হবে স্মৃতিতে। মনে পড়বে, মনে পড়াবে।"[৬৩]

'ওঠা কিংবা নামা' উপন্যাসে নীলা ও অসীমের দশ বছরের দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন ধরেছে অসীমের সন্দেহে। নীলা ও অসীম দুজনেই অফিসে চাকরি করে। অসীম চাইতো নীলা চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরেই থাকুক। কিন্তু নীলার উচ্চাশা অন্য। অফিসের বসের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেছে। অনেক টাকা বেতন বেড়েছে তার, এখন সে ওপরে ওঠার মুখে। তার কাছে টাকা মানে আরো সুখ, আরো স্বাচ্ছন্দ্য। ওপরে ওঠার সিঁড়ির মাঝামাঝি তাকে দিশেহারা করতে চায় অসীম। তার ওঠা মানে যে অসীমেরও ওঠা তা অসীম বুঝতো না। কিন্তু নীলাও নাছোড়বান্দা। সে ভেবেছিল সময় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। অসীমের স্বভাব একগুঁয়েমি; নিজের ভাবনার বাইরে সে এক চুলও এগোয় না। কেউ বোঝালেও বোঝে না। শ্যামলেন্দুর সঙ্গে নীলার মেলামেশাটা সে ভালো চোখে দেখেনি। দিন যতো গেছে সন্দেহ ততোই বেড়েছে। এদিকে শ্যামলেন্দুর সঙ্গে না মিশলে নীলার যে পদোন্নতি হবে না সেটা নীলা ভালো করেই জানে। বেসরকারি অফিসে এটাই সত্য। বসকে খুশি করতে হয় নীলাকে। যে কোনোদিন মদ ছোঁয়নি, সে বসের সঙ্গে বসে বিয়ার খায়, পার্টিতে যায়, ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক গভীর হতে থাকে। নীলা এই অবস্থা থেকে আর বেরোতে পারে না। এদিকে অসীমের সঙ্গে নীলার কোনো কথাবার্তা নেই বললেই চলে। একই ফ্ল্যাটে থাকলেও অসীম নিজের মতো চলে। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক যে ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে নীলা বুঝতে পারে। সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে টিনার কথা ভেবে নীলা অসহায় বোধ করে।

"তখনই ভয়টা চেপে আসে। অসীম আর শ্যামলেন্দু নিজেদের নিয়ে আলাদা— সে পা রেখেছে দু নৌকায়। ঢেউয়ে সমতা নেই কোনও। এর মধ্যে যে কোনও একটি টাল খেলেই ডুববে।"[৬৪]

দুই পুরুষের মাঝখানে নীলা মানসিক দ্বন্দ্বে পড়ে। অসীমের সন্দেহ তাকে মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছে। সে বিবাহিত বলে অসীমকে ছাড়তেও পারে না। অফিসকর্মী রঞ্জনার ইঙ্গিতে শ্যামলেন্দুকে নিয়ে টানাপোড়েনে তার মনকে আরো জ্বালিয়ে দিয়েছে। নীলা মনে মনে স্থির

করে তিনজনের মধ্যে একজনকে সরে যেতে হবে। নিজেকে তাদের একজন ভাবে। মনের ভিতর ক্রমাগত শূন্যতা অনুভব করে। শেষে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে—

> "গাড়ির সিটে ভারী ঘাড়টা যতটা সম্ভব এলিয়ে দিয়ে নীলা ভাবল, এই যাওয়াটার ভুল নেই কোনও। উচ্চাশা তাকে অনেক দিয়েছে, নিয়েওছে অনেক! হয়তো এবার সে আরও এক ধাপ উঠবে। হয়তো নামবে। সে জানে না।"[৬৫]

তথ্যসূত্র :

১. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত, বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি - মার্চ ২০০৩, পৃ. ১৬

২. পালিত, দিব্যেন্দু : সিন্ধু বারোয়াঁ, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৬

৩. তদেব : পৃ. ৬০

৪. পালিত, দিব্যেন্দু : সেদিন চৈত্রমাস, বসু চৌধুরী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১, পৃ. ৬২

৫. পালিত, দিব্যেন্দু : ভেবেছিলাম, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৭৯

৬. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ১০৭

৭. পালিত, দিব্যেন্দু : ভেবেছিলাম, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৮৩

৮. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ১০৭

৯. পালিত, দিব্যেন্দু : ভেবেছিলাম, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৯১

১০. তদেব : পৃ. ২২৭

১১. পালিত, দিব্যেন্দু : মধ্যরাত, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৩২

১২. পালিত, দিব্যেন্দু : প্রণয়চিহ্ন, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৫৯

১৩. তদেব : পৃ. ৩৭৯

১৪. তদেব : পৃ. ৩৬৮

১৫. পালিত, দিব্যেন্দু : সন্ধিক্ষণ, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠমুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১১

১৬. তদেব : পৃ. ১৬

১৭. পালিত, দিব্যেন্দু : বৃষ্টির পরে, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ২৫৬

১৮. তদেব : পৃ. ২৫৫

১৯. পালিত, দিব্যেন্দু : একা, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৩৯৪

২০. তদেব : পৃ. ৪১৩

২১. তদেব : পৃ. ৪২১

২২. তদেব : পৃ. ৪৪১

২৩. তদেব : পৃ. ৪৫৭

২৪. পালিত, দিব্যেন্দু : সবুজগন্ধ, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৬৫৭

২৫. তদেব : পৃ. ৬৭৮

২৬. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র : কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ষষ্ঠদশ মুদ্রণ, ১৪১৭, পৃ. ৬৮

২৭. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ১০৬

২৮. পালিত, দিব্যেন্দু : সম্পর্ক, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৭৫

২৯. তদেব : পৃ. ৭৫

৩০. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৫

৩১. পালিত, দিব্যেন্দু : বিনিদ্র, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ২৮১

৩২. পালিত, দিব্যেন্দু : আমরা, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৭৯

৩৩. পালিত, দিব্যেন্দু : উড়োচিঠি, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫ পৃ. ৪৬৮

৩৪. তদেব : পৃ. ৪৬৮

৩৫. তদেব : পৃ. ৪৬৮

৩৬. তদেব : পৃ. ৪৭৩

৩৭. পালিত, দিব্যেন্দু : সহযোদ্ধা, দশটি উপন্যাস (২), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৬৭

৩৮. ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত) : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, শারদীয়, ১৪০০, পৃ. ৫১

৩৯. পালিত, দিব্যেন্দু : গৃহবন্দী, দশটি উপন্যাস (২), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৭১৪

৪০. তদেব : পৃ. ৭১৫

৪১. পালিত, দিব্যেন্দু : মাইন নদীর জল, কলকাতা, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ-মে ১৯৮৮, পৃ. ৪৪

৪২. তদেব : পৃ. ৪৫

৪৩. পালিত, দিব্যেন্দু : সোনালী জীবন, দশটি উপন্যাস (২), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ২৫৪

৪৪. তদেব : পৃ. ২৫৪

৪৫. পালিত, দিব্যেন্দু : ঢেউ, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ২৭৫

৪৬. তদেব : পৃ. ২৮২

৪৭. পালিত, দিব্যেন্দু : অন্তর্ধান, দশটি উপন্যাস (২), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৫২৫

৪৮. তদেব : পৃ. ৫১৮

৪৯. পালিত, দিব্যেন্দু : অনুসরণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৮, পৃ. ৪৫

৫০. তদেব : পৃ. ৭২

৫১. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত, বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১৪৩

৫২. পালিত, দিব্যেন্দু : মৌনমুখর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১০৭

৫৩. তদেব : পৃ. ১১০

৫৪. পালিত, দিব্যেন্দু : সংঘাত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪১

৫৫. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : লেখকের মুখোমুখি, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৪৬৯

৫৬. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : পঞ্চাশের দশকের কথাকার, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ৩১৬

৫৭. পালিত, দিব্যেন্দু : অচেনা আবেগ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, ভূমিকা, পৃ. ০১

৫৮. তদেব : পৃ. ৩২

৫৯. তদেব : পৃ. ৯৪

৬০. পালিত, দিব্যেন্দু : মাত্র কয়েকদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৯৬

৬১. পালিত, দিব্যেন্দু : সেকেণ্ড হনিমুন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৩৬

৬২. পালিত, দিব্যেন্দু : যখন বৃষ্টি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২, পৃ. ৬৮

৬৩. পালিত, দিব্যেন্দু : বহুদূর অভিমান, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৭৩

৬৪. পালিত, দিব্যেন্দু : ওঠা কিংবা নামা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ১০৮

৬৫. তদেব : পৃ. ১৫০

তৃতীয় অধ্যায়

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের বিচিত্রতা

দিব্যেন্দু পালিত উপন্যাসে ঘটনার দিকে নজর দেননি। বরং চরিত্রের অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভূতির জগৎটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। চরিত্র নির্মাণের সময় তাই সমাজের প্রতিটি শ্রেণির ক্ষেত্রেই তিনি উৎসুক। একেবারে অতিতুচ্ছ সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত, সচ্ছলতা সন্ধানী মধ্যবিত্ত কিংবা হৃদয়হীন উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে বস্তিবাসী পরিচারিকা, সরকারি-বেসরকারি অফিসের মেজকেরানি, রাজনীতি করা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক কিংবা কোম্পানি-ফার্মের ডিরেক্টর, বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্মচারী— এদের সকলকেই দিব্যেন্দু পালিত নিজ অভিজ্ঞতায় নির্মাণ করেছেন। তবে বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় তাঁর উপন্যাসে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণিরই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো— ১. উপন্যাসের প্রধান চরিত্রচিত্রণ এবং ২. উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রচিত্রণ।

১. উপন্যাসের প্রধান চরিত্রচিত্রণ :

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলিকে আলোচনার সুবিধার্থে দুটি ভাগে করে আলোচনা করা হলো— (ক) প্রধান নারী চরিত্র এবং (খ) প্রধান পুরুষ চরিত্র।

১. ক. প্রধান নারী চরিত্র :

অরুন্ধতী :

'সিন্ধু বারোয়াঁ' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এবং নায়িকা অরুন্ধতী। সে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সে এক বছরের সিনিয়র ইংরেজি বিভাগের ছাত্র সৌম্যর প্রেমে পড়ে। কিন্তু সেই প্রেম বেশিদিন টেকেনি। তার বাবা চাকরিজীবী ছেলে বিভাসের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। সৌম্যকে বিয়ের কথা বললেও সৌম্য নিজের কেরিয়ারের কথা ভাবে। সে কাপুরুষের মতো পালিয়ে যায়। প্রেমে প্রত্যাখ্যান অরুন্ধতী মেনে নিতে পারেনি। ফলে বিবাহ জীবন তার সুখের হয়নি। সৌম্যর উপর ওঠা তীব্র রাগ-অভিমান সে স্বামীর উপর দেখায়। ফুলশয্যার রাত থেকে আলাদা বিছানায় শোয়। সৌম্যকে না পেয়ে স্বামীকে যতোটা না কষ্ট দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে নিজে। পাড়ার বখাটে ছেলে সুনীলকে ঘৃণার চোখে

দেখলেও সেই ঘৃণাকে অবলম্বন করে ক্রমশ সে নিজের যন্ত্রণা বাড়িয়েছে। যাকে একপলক দেখলে ঘৃণা হতো, তার সঙ্গেই সে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে সুনীলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।

দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে অরুন্ধতীর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। সে সবার সাথে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারেনি। সবসময় একা একা থাকে, একলা মনে ভাবতে থাকে। পৃথিবীর সব কিছু তার কাছে অসাড় মনে হয়। কিছুদিন পর সে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। পেটের ভিতরের অঙ্কুরটার কথা ভেবে ভয় পায়। যদি অঙ্কুরটি বিভাসের মতো না হয়ে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো হয়। মনে-প্রাণে ঘৃণা করতে গিয়েও একটা মমতা এসে পড়ে।

অরুন্ধতী নবজাত সন্তানকে সহ্য করতে পারেনি। হাসপাতালের নার্স থেকে বাড়ির কাজের ঝি সকলেই সন্তানের আকারগত সাদৃশ্য না থাকায় প্রশ্ন তুলে। তীব্র জ্বালায় জ্বলতে থাকে সে। সন্তানের কান্না তার কাছে 'জানোয়ারের মতো অলুক্ষণে চিৎকার' মনে হয়। বিভাসের অলক্ষ্যে নিজের হাতে সন্তানের শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং নিজেও কিছুদিন পর আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

কুড়ি বছর বয়সে লেখা এই উপন্যাসটিতে লেখক চরিত্রচিত্রণে সেরকম দক্ষতা দেখাতে পারেননি। উপন্যাসটিতে কাহিনি যেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে, চরিত্রেরও তেমন বিকাশ ঘটেনি।

এষা :

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নারীশিক্ষার অগ্রগতির ফলে মেয়েরা আর চার দেওয়ালের মাঝে আবদ্ধ থাকতে চায়নি। বেরিয়ে এসেছে বদ্ধ ঘরের আগল ভেঙে। নিজের মন মতো পুরুষের সঙ্গে বিয়ে না দিলে তারা ঘর-সংসার করতে রাজী হয়নি। পারিবারিক-সামাজিক বাধাকে তোয়াক্কা না করে নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছে। নিজের মন মতো প্রেমিক পুরুষ খুঁজে নিয়েছে। সেই প্রেমিক পুরুষের সঙ্গে যদি মনের মিল না হতো তাহলে তারা স্বাবলম্বী হয়ে একাই থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মুক্তি খুঁজেছে পুরুষের বন্ধন থেকে। দিব্যেন্দু পালিতের দ্বিতীয় উপন্যাস 'সেদিন চৈত্রমাস'-এর এরকমই একটি নারী চরিত্র এষা। নিজের অমতে

অল্প বয়সে বিয়ে দেয় বাড়ির লোকজন। তারা ভেবেছিল বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু বাসররাতেই এষার স্বামীস্পর্শ সহ্য হয়নি। তার মনে হয়েছিল—

> "মৃণালের দৃষ্টিতে বন্য ক্ষুব্ধ, নাকের পাটা অস্বাভাবিক স্ফীত।... মৃণালের নিশ্বাসের বিষ, গালে ফোসকা পড়ে যাচ্ছে যেন।"[১]

এষার স্বামী মৃণাল বড়ো চাকরিজীবী, বিদেশে থাকে। এষাকে নিয়ে যেতে চায় বিদেশে। এষা চায় এদেশে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় এষা নতুন করে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। সহপাঠী অমলেন্দুকে সে ভালোবেসে ফেলে। অমলেন্দুকেই তার মনের মতো পুরুষ মনে হয়। গভীর নিশুতি রাতে অমলেন্দুর কথা ভেবে অনুকম্পা জেগে ওঠে তার শরীরে। অনেকবার অমলেন্দুর সঙ্গে শরীরী খেলায় মেতে সুখ পায় সে। অমলেন্দুকে বিয়ে করতে বলে। সামাজিকতায় তার বিশ্বাস নেই। ন্যায়-অন্যায় সে ভালো করেই বোঝে। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে নিজের আত্মাকে সে বিক্রি করে দিতে চায়নি। সে জানায় মৃণালকে ডিভোর্স দেবে।

মৃণাল বিদেশ থেকে ফিরে এলে এষাকে নিয়ে যেতে চায়। এষা রাজি হয়নি। সে শ্বশুরবাড়ি স্বামীর ঘর করতে যায়নি। বাড়িতে এসব নিয়ে মা, দাদার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলে এষা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায়। স্থির করে একটা চাকরি খুঁজে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকবে। আর অমলেন্দুর জন্য অপেক্ষায় থাকবে। কিন্তু অমলেন্দু তার প্রেমের মর্যাদা দিতে পারেনি। বিয়ের কথা শুনে অমলেন্দু পিছিয়ে গেছে। অমলেন্দু সমাজের বিরুদ্ধে যেতে পারেনি। পারেনি বিবাহিত মেয়েকে বিয়ে করতে। প্রেমের দিক থেকে মেয়েরা বেশি সাহস দেখিয়েছে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে। এষার মনে হয়েছে সব পুরুষই এক। সবাই শুধু শরীরকে চায়, মনকে কেউ চিনতে পারে না। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতে এষা ভয় পায়। দুই পুরুষ— স্বামী আর প্রেমিকের টানাপোড়েনে সে ক্ষতবিক্ষত হয়, আত্মদ্বন্দ্বে ভুগে। দুটি পরস্পর বিপরীত ধারণার জন্ম হয় তার মনে। প্রথমে তার স্বামী মৃণাল সম্পর্কে—

> "আমি কেন মৃণালকে পছন্দ করতে পারলুম না! মৃণাল অভদ্র নয়, মৃণাল শিক্ষিত, ভালো উপার্জন করে; চেহারায় পৌরুষ আছে, স্বাস্থ্য ভালো।"[২]

আর প্রেমিক পুরুষ অমলেন্দু সম্পর্কে—

> "অমলেন্দুর আবেগ রয়েছে, একটু বেশিই হয়তো। অমলেন্দু ভালোবাসতে পারে প্রচণ্ডভাবে; কিন্তু আশ্রয় দিতে পারে কি? শুধুই ভালোবাসার জন্যে কেউ বাঁচতে পারে না।"[৩]

পরস্পরবিরোধী এই দুই অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় তৃতীয় এক অভিজ্ঞতার, যা ক্রমাগত পারাপার করে প্রথম দুই অভিজ্ঞতার মধ্যে—

> "কোনো কিছু দাবি করবার জন্য প্রয়োজনীয় চরিত্র আমার নেই। এই জ্বালা, যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্তি চাইছি। আমি নিঃসঙ্গ হয়ে বাঁচতে পারি, কিন্তু নিঃসঙ্গ হয়ে একা-একা বাঁচবার মতো মনের জোর আমার আছে কি? কিংবা, অমলেন্দু যদি আমাকে গ্রহণ করত, তার সঙ্গে যেতে পারতাম কি? একটি সমস্যা এবং আমি যেতে পারতাম না। কেন জানি না। লোকনিন্দা? হয়তো। আত্মীয় পরিজন? সম্ভবত। সংস্কার? সত্য হতে পারে। সুতরাং দেখতে গেলে, সমস্যা অমলেন্দু কিংবা মৃণাল নয়; তারা তাদের মতো, উপলক্ষ মাত্র; আমার সমস্যা আমি নিজে। আমি চাইছি; আবার একই সময়ে চাইছি না।"[৪]

এই অবস্থায় আত্মহত্যার কথা তার মনে হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণে তার মনে হয়েছে মৃত্যু কোনো বিশেষ সমাধান নয়, মৃত্যু মানে পরাজয়, পশ্চাদ্‌সরণ। তাতে পাপ বাড়ে। সেটা সাময়িক নিবৃত্তিমাত্র। সে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস অঞ্জলিদির কাছে পরামর্শ নেয়। নিঃসঙ্গ হয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণা খুঁজে। স্বাবলম্বী হয়ে একা একা থাকতে চায় স্বাধীনভাবে।

এই উপন্যাসটিতে লেখক এক সুন্দরী ও শিক্ষিতা আধুনিক নারীর বিদ্রোহী চেতনার ক্রমোন্মোচন দেখিয়েছেন। যে নিজেকে একটি পুরুষের যৌনতার কেন্দ্রে নিঃশেষ করতে চায়নি। যে বিবাহকে অস্বীকার করে অন্যতর সম্পর্কে মুক্তি খুঁজেছিল। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ হয়ে অবসন্ন শূন্যতার ভেতর হাঁটতে হাঁটতে মৃত্যুকে পরাজয় ভাবলো এবং পাপ আর স্মৃতিচারণের মধ্যে শুনতে পেলো প্রতিকূলতার অমোঘ কণ্ঠ— "ন চ দিন্নমাদিয়ে।"[৫]

দিব্যেন্দু পালিতের পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে মেয়েরা যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তার সূত্রপাত আমরা এষার মধ্যদিয়ে প্রথম পাই।

তপতী :

'মধ্যরাত' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তপতী। সে সুরমা দেবী গার্লস কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর সে একা ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। দূর সম্পর্কের কাকার আশ্রয়ে থাকলেও কাকিমা আটাশ-ঊনত্রিশ বছরের ধিঙ্গি আইবুড়ো মেয়েকে সহ্য করতে পারেনি। ফলে চাকরি করা সত্ত্বেও তপতীকে চলে যেতে হয় মেয়েদের থাকার আশ্রয় মেসবাড়িতে। তপতী ছিল অন্তর্মুখী স্বভাবের। জীবন সম্পর্কে বিশেষ কোনো ধারণা তার ছিল না। প্রেম, ভালোবাসা, বিচ্ছেদ ইত্যাদি সম্পর্কে সে কোনোদিন স্পষ্ট করে ধারণা করতে পারেনি। তার গতি ছিল সীমাবদ্ধ। স্কুলের সহপাঠিনীদের প্রেম-ভালোবাসা, মান-অভিমান, সম্পর্কের প্রসঙ্গে সে কাউকেই খুঁজে পেতো না। বন্ধুরা তার অনভিজ্ঞতায় কৌতুকবোধ করলেও তার মানসিকতার এই দূরত্বে সে কোনোদিন অস্বস্তিবোধ করেনি। অ্যাডাল্ট হওয়ার বয়সেও তার এ সম্পর্কে জ্ঞান হয়নি। লেখক তার সম্পর্কে জানান—

> "পরে যখন মেয়ে-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক আঁচ করার বয়স এল, সচেতনতা দেখা দিল শরীরে, সম্ভাব্য সম্পর্কের কথা তখনও মনে আসেনি।"[৬]

মেসের সঙ্গী রত্না তার এই স্বভাবের জন্য তাকে 'রেফ্রিজারেটর' আখ্যা দিয়েছে। তপতী অসহায় বোধ করলেও নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা সবসময় নিজের মনে চেপে রাখতো।

নীতীশকে ঘিরে তপতীর অবচেতন মনে প্রেমের আলোড়ন কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। নীতীশই তাকে তপতী দেবী গার্লস কলেজের চাকরিটা পাইয়ে দেয়। ফলে তপতী নীতীশের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। দুজনে গল্প গুজবের মধ্যদিয়ে নিজের প্রেমের কথা প্রকাশ করেছে। কিন্তু সরাসরি বলতে পারেনি কেউই। নীতীশ চিঠি দিয়েছে তপতীকে। চিঠি পড়ে তপতী অস্বস্তি করলেও আত্মমগ্নভাবে ধুলোর উপর নীতীশের নাম লিখেছে। নির্জন রাস্তায় দুজনে পাশাপাশি হাঁটার সময় নীতীশকে এক পরম আত্মীয় মনে হয়েছে তার। নীতীশও বলেছিল, "শুধু নিজেকে নিয়ে হয়তো বাঁচা যায় না। কোথাও না কোথাও এসে আমাকে থামতে হবেই"।[৭]

আকারে-ইঙ্গিতে ভদ্ররুচির নীতীশ তাকে ভালোবাসার নিবেদন জানালেও তপতী নিজের জড়তা কাটাতে পারেনি। নীতীশের সহজ সরল আন্তরিকতার কাছে তপতী ধরা

দিতে পারেনি, পারেনি তার সান্নিধ্যে আসতে। শেষে নীতীশের বিদেশযাত্রার কথা শুনে সে একমনা হয়ে পড়েছে। যেন নীতীশের যাওয়াটা তার কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়েছে। অনুভূতির কোশে কোশে তা উপলব্ধি করে তপতী নিজেকে দুর্বল ও অসহায় বোধ করেছিল।

এরকম একমুখী স্বভাবের মেয়ের চরিত্র দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে খুবই কম। যেখানে এষা কিংবা নমিতারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, তার পাশাপাশি তপতী অনেকটাই বেমানান। দিব্যেন্দু পালিত তাই হয়তো তপতী চরিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটাতে পারেননি।

নমিতা :

'প্রণয়চিহ্ন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নমিতা। ছয় বছর স্বামীর সঙ্গে ঘর করে আর একসাথে থাকতে পারেনি। আইনি মতে ডিভোর্স হওয়ার পর সে সম্পূর্ণ একা এবং আত্মনির্ভরহীন হয়ে পড়ে। তার নিজের কথায়—

> "আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি কোনো-না-কোনো অবলম্বন নির্ভর করে থেকেছি। বিয়ের আগে পর্যন্ত বাবার কাছে, তারপর স্বামীর কাছে। পায়ের পাতা এখনও তাই খুব নরম হয়ে আছে।"[৮]

নমিতার বিয়ে হয়েছিল একান্নবর্তী পরিবারে। স্বামীর ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তারা চলে আসে ফ্ল্যাটে। এতোদিন নমিতা যা পায়নি, ফ্ল্যাটে এসে তার মনে হয়েছে সবকিছু নিষেধের বেড়া সে ডিঙিয়ে এসেছে। সবকিছু নিজের করে পেয়েছে, সম্পূর্ণের অধিকার অর্জন করেছে। অন্যদিকে মহীতোষ তার ব্যবসার সুবিধার জন্য বন্ধুবান্ধব ও মক্কেলদের সঙ্গে তাকে ঘনিষ্ঠ করাতো। মহীতোষ চাইত স্ত্রীকে সামাজিক করে তুলতে। কিন্তু এরজন্য যে স্বতঃস্ফূর্ততা যে মানসিক ঔদার্য দরকার, মহীতোষের তা ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে মহীতোষের চোখে নমিতা ব্যভিচারিণী হয়ে উঠে। নমিতাকে অকথ্য গালিগালাজ শুনতে হয়েছিল— "তোমার জেদ কী করে ভাঙতে হয় জানি! বেশ্যা মাগি তোকে আমি মুরগি জবাই করব।"[৯] নমিতা এসব সহ্য করেনি। স্বামীর খারাপ ব্যবহারের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। অনেক সময় আত্মহত্যার চিন্তাও করেছে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি সাহসী হয়ে উঠেছে। মহীতোষের মতো কাপুরুষ, সন্দেহগ্রস্ত স্বামীকে সে কোনো তোয়াক্কা করেনি। একা ফ্ল্যাট

নিয়েছে। চাকরি খুঁজেছে। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে হারেনি। সমাজের চোখে হারলেও জীবনের কাছে হার মানেনি। বেঁচে থাকার সাধ, জীবনকে উপভোগ করার সাধ তার ফুরিয়ে যায়নি। এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী উপন্যাস 'সেদিন চৈত্রমাস'-এর নায়িকা এষার কথা স্মরণ করা যায়। এষার বিদ্রোহী চেতনা আরো প্রবল ছিল।

রুচি :

সামাজিক অনুশাসনকে লঙ্ঘন করতে পারেনি 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসের জয়া এবং 'আড়াল' উপন্যাসের রুচি। এই দুটি উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নারীর সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'আড়াল' উপন্যাসের রুচি শ্রেয় ও প্রেয়র দ্বন্দ্বে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এসে তার মনে হয়েছে স্বামীসুখের অপূর্ণতা। যা পূরণ করতে চব্বিশ বছরের সংসার জীবনকে অবহেলা করে প্রেমিকপুরুষ দীপঙ্করের কাছে আশ্রয় নিতে চেয়েছিল। দীপঙ্করের স্পর্শ তার কাছে মনে হয়েছে পরম আনন্দের। কিন্তু রুচির এই আশা সফল হয়নি। প্রবল সামাজিক বাঁধাকে সে লঙ্ঘন করতে পারেনি। প্রেমিকপুরুষের মোহে নিজেকে আত্মাহুতি দিতে পারেনি। নিজের কর্তব্যে সে সংযত থেকেছে। তার নিজের বিবেক তাকে পথ দেখিয়েছে, শাসন করেছে, নিজেকে আড়াল রেখেছে। তাই নিজের জরায়ু ক্যানসারেও সে স্বামীকে জানায়নি। সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে আত্মবলিদান দিয়েছিল জয়া। সে এক মধ্যবিত্ত গৃহবধূ। স্বামীর কথার প্রতিবাদ করতে পারেনি। স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা ও বিশ্বাস ছিল অসীম। ভারতবর্ষের সতীসাবিত্রীর মতো ছিল তার চরিত্র। স্বামীর সামাজিক অনুশাসনই একদিন তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছে।

মানসী :

'সবুজগন্ধ' উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র মানসী। বাবা-মার অমতে প্রেমিক দীপঙ্করের সঙ্গে সে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে। সামাজিক মতে বিয়ে বিয়ে হয়নি তাদের। বাবা-মাও এর পর আর মেনে নেয়নি। বিয়ের পর মানসী এক দুরারোগ্য মারণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। হাসপাতালের বেডে মৃত্যুশয্যায় শায়িত মানসীকে দেখতে দীপঙ্কর প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসে এবং যায়। বাকি সময়টা মানসী একা এবং নিঃসঙ্গে কাটায়। হাসপাতালের ঔষধিয় গন্ধযুক্ত পরিবেশ তার মনের আবেগ, ভালোবাসাকে ক্রমশ ফিকে করে দেয়। স্বামীকে সে অভিযুক্ত করে, 'যার স্ত্রীর এমন যায় যায় অবস্থা, সে কেমন করে অফিস করে'। তার বাবার কথা

মনে পড়ে। বিয়ের পর তার বাবা বলেছিল, 'আমাদের নাকি পুরো বিয়ে হয়নি। আমি নাকি তোমার পুরো স্ত্রী নই'। এসব অভিযোগ দীপঙ্করকেও মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সেও ভালোবাসার মানে ভুলে যায়। মানসী লক্ষ করে দীপঙ্করের একটু একটু করে বদলে যাওয়া।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে অস্তিত্বের লড়াই চরিত্রদের অন্য মাত্রা দিয়েছে। মানসী একটু সুস্থ হলে বাঁচার আশা দেখে। দীপঙ্করকে বলে আবার তারা পরস্পরকে ভালোবাসবে। সে সুস্থ হয়ে উঠলে দীপঙ্কর যেন এবার তাকে সামাজিক মতে বিয়ে করে। তারা নতুন করে ঘর সংসার বাঁধবে। সে দীপঙ্করের আগমনের অপেক্ষায় সবুজ পেড়ে, হলদে শাড়ি পরে হাসপাতালে সুসজ্জিত হয়ে থাকে। যাতে দীপঙ্কর আগের মতো তাকে আবেগ আর ভালোবাসা দিয়ে কাছে টানতে পারে।

বিশাখা ও অর্পিতা :

দিব্যেন্দু পালিত নারী চরিত্র অঙ্কনে দক্ষ কারিগর। নারী চরিত্রকে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'সোনালী জীবন' উপন্যাসে সারার মধ্যদিয়ে নারীর অসহায়তার চিত্র, 'সংঘাত' ও 'অনুভব' উপন্যাসে ঋতুপর্ণা ও আত্রেয়ীর মধ্যদিয়ে নারীর বিদ্রোহী সত্তা, আবার সামাজিক অনুশাসনে বাঁধা 'আড়াল' ও 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসের জয়া ও রুচিকে অঙ্কন করেছেন। 'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিত এমন দুটি নারী চরিত্রকে অঙ্কন করলেন যা এদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মনে রাখতে হয় এই উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা—

> "সময়ের অভিঘাত নয়। সময়ের প্রবর্তিত জীবনের নতুন ছাঁদ, নতুন প্রেক্ষাপট ও পটবিধৃত চরিত্র ও তাদের সংকট এ উপন্যাসে প্রধান কথা। দুটি কর্মরত জীবন জীবিকার সূত্রে নিবদ্ধ দুটি নারীর উচ্চাবত অস্তিত্বের আবর্ত এখানে প্রধান কথা। সন্দেহ নেই এও এক বিপন্ন সীমান্তের কথা।"[১০]

চাকরিজীবী মেয়ে বিশাখা ও অর্পিতা। বাবা-মা হারানো বত্রিশ বছর বয়সী বিশাখা কলেজের অধ্যাপিকা। স্বাধীন ও স্বনির্ভর মেয়ে। কিন্তু কোথায় যেন পুরুষের উপর নির্ভর তার থেকেই যায়। বাবা মারা যাবার পর নিরাশ্রয় বোধ করে। তারপর প্রেমিক পুরুষ সিদ্ধার্থের আশ্রয়ে

বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু সিদ্ধার্থ বিদেশে থাকে। গত তিন বছরে মাত্র একবার দেখা হয় তাদের। আর খবর নেওয়ার জন্য একবারই একটি চিঠি পাঠায় সিদ্ধার্থ। সেই চিঠি পেয়ে বিশাখা অপমানবোধ করে। তার জন্মদিনে শুভেচ্ছাটুকুও জানায়নি সিদ্ধার্থ। এই অপমান তার মনে তীব্র মানসিক দৈন্য আর নিঃসঙ্গতা এনে দেয়। জন্মদিনে অতীতস্মৃতি বিশেষকরে বাবার কথা মনে পড়ে তার। বাবার মৃত্যুর দিনে মার অসহায়তার কথা মনে পড়ে—

> "শুধু বিষাদ জড়ানো খুব আলগা এক অনুভূতির মধ্যে বুঝেছিল, বোধহয় মেয়ে হয়ে জন্মানোর একটা আলাদা অর্থ আছে।"[১১]

বিশাখা কম কথা বলার মেয়ে। তার দুঃখ-কষ্টের কথা মেসের অন্যান্য মেয়েদের সে বলতে পারেনি। তার চেপে রাখা কষ্ট থেকে উঠে এসেছে একরকম আবেগ। সিদ্ধার্থর চিঠি ছিঁড়ে ফেলতে চায় সে—

> "ও কি জানে কোনও শুভেচ্ছাহীন জন্মদিন কাটানোর মতো কষ্টকর আর কিছুই নেই, তখন বুকের ওপর কী ভীষণ ভাবে চেপে বসে মানসিক দৈন্য আর নিঃসঙ্গতার বোধ।"[১২]

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে মেয়েরা আশ্রয় খুঁজেছে। সেই আশ্রয়ের প্রথম পুরুষ অবশ্যই বাবা ও তারপর প্রেমিক বা স্বামী। বিশাখা অনুভব করে মেয়েদের জীবনে বাবা একটা ফ্যাক্টর হয়তে দাঁড়ায়। বাবা একটা ছাদ, একটা আশ্রয়, স্নেহ, দুটি সতর্ক চোখের পাহারা ও নিরাপত্তা। সিদ্ধার্থকে নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বিশাখা। কেবল অতীত স্মৃতি নিয়ে সে মনের গভীরে বিচরণ করেছে। 'মনে হয় এর গভীরে কোথাও বিস্তৃত হয়ে আছে এক ভীষণ স্তব্ধতা'।

অর্পিতার চরিত্র অঙ্কনে লেখক কিছুটা মধ্যবিত্ত মানসিকার পরিচয় দিয়েছেন। অর্পিতার বয়স সাতাশ। সে স্টুয়ার্ট মর্গানে কনফিডেনসিয়াল সেক্রেটারির কাজ করে। বিশাখা বলে, "অর্পিতার স্মার্টনেসের অনেকটাই ওর চাকরির পরিবেশ থেকে পাওয়া।... কথায় কথায় ইংরিজি বলে, বলার ব্যাপারে লুকোছাপি নেই, একটু বা ঠোঁটকাটা। তবে, মনটা সাচ্চা। স্বাধীন।"[১৩]

অর্পিতার পৈতৃক বাড়ি ভবানিপুরে। বাবা মারা যাওয়ার পর দাদা-বৌদির সংসারে তার বনিবনা হয়নি। একসময় বৌদির মামাতো ভাই চিরজিতের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু হবু বরের অসৎ আচরণে অর্পিতা সে বিয়ে ভেঙে দেয়। বিয়ে ভাঙলেও অর্পিতা ভাঙেনি। বরং এ থেকে তার মনে এক ধরনের জোর এসেছিল। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, আশ্রয় নেয় 'দক্ষিণী' হোমে। তারপর আর বাড়ি যায়নি। কেবল মাসে মাসে মাকে টাকা পাঠায়।

অর্পিতা অফিসের বস অনুপ রায়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অনুপ রায় ছিল বিবাহিত। তার স্ত্রী চন্দ্রা তাদের সম্পর্কের কথা আগে থেকেই জানতো। একদিন অনুপের স্ত্রীর ফোন পেয়ে হঠাৎই উচ্ছল হয়ে ওঠে অর্পিতা, নড়বড়ে হয়ে যায় তার সমস্ত ভাবনা। ফোনের ওপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে চন্দ্রার অসহায় কাতরতা—

> "ভিভোর্স চাইলে দেব।...কিন্তু, মেয়েমানুষ হিসেবে একটাই অধিকার ছিল আমার। কারুর স্ত্রী হয়ে থাকার অধিকার, সেটা তুমি কেড়ে নিচ্ছ কেন!"[১৪]

সিদ্ধার্থ একদিন বিশাখাকে আশ্বাস দিয়েছিল, তাদের সম্পর্ক কেবল পত্র বিনিময়ের মধ্যেই থেমে থাকে, তারপর একদিন সেই অভ্যাসেও ছেদ পড়ে। অর্পিতাও চন্দ্রার অধিকার ফিরিয়ে দেয়। অ্যাবরশন করিয়ে নেয় অর্পিতা। সঙ্গে থাকে বিশাখা। তখন বাঁচবার জন্য, বেঁচে থাকবার জন্য নিঃস্ব দুটি নারী পরস্পরের দিকে বাড়িয়ে দেয় বিশ্বাসের হাত। উপন্যাসের শেষে অর্পিতার বিষণ্ণ কিন্তু বলিষ্ঠ উচ্চারণ তাৎপর্য নিয়ে আসে, "দরকার নেই। আমি নিজেই যেতে পারবো— "[১৫] দিব্যেন্দু পালিত এখানে অবৈধ বা অসামাজিক সম্পর্ক থেকে অর্পিতাকে সরিয়ে এনে এক ধরনের সুস্থ পরিবেশ রচনা করেছেন। এদিক থেকে চরিত্রচিত্রণে তিনি নিপুণশিল্পী।

জিনা :

'অবৈধ' উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র জিনা। সে শিক্ষিতা এবং আধুনিকমনস্কা নারী। একুশ বছরে বি. এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকজন তাকে বিয়ে দেয়। ফলে মন কিংবা শরীর ঠিক কোন অনুভূতিতে কাতর ও সাড়া দেয় তা বোঝার আগেই সে স্বামীর প্রোপার্টি হয়ে যায়। জিনার মনে হতো অসীম তাকে ভোগ করতো। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালোলাগা,

আবেগ, ভালোবাসাকে বঞ্চিত করতো। অফিসের পার্টিতে কিংবা অন্য কোথাও অসীম যখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অন্যান্যদের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, 'দিস ইস মাই ওয়াইফ' তখন জিনার মনে হতো তার নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই।

স্বামীর বয়স বেশি হওয়ায় জিনার সঙ্গে মতের ছিল না। তার স্বামী ছিল কর্মময় মানুষ। কাজ নিয়েই পাগল থাকতো। অফিসের কাজে বেশিরভাগ সময়েই বাইরে থাকতো। ফলে ফ্ল্যাটে একা ও নিঃসঙ্গ জীবন কাটতো জিনার। জিনা সঙ্গ চাইতো। সেই সঙ্গ দিয়েছিল ফ্ল্যাটের যুবকপুরুষ পার্থ। জিনা পার্থকে খুব ভালোবেসেছিল। তাই আবেগের বশে জিনা পার্থর সঙ্গে পুরী ঘুরতে যায়। পার্থর সঙ্গে এক হোটেলে রাত কাটায়। কিন্তু পার্থ ছিল সুযোগসন্ধানী। সে জিনাকে পুরীর হোটেলে একা ফেলে পালিয়ে যায়। জিনা বুঝতে পারে না, সে কি করবে। যাকে সে ঘৃণা করতো সে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, সমাজে পরিচয় দিয়েছিল আর যাকে সে ভালোবেসেছে সে কাপুরুষের পরিচয় দিয়েছে। আশ্রয় তো দূরের কথা ভালোবাসার বিশ্বাসটুকুও ধরে রাখতে পারেনি। এই দুই পুরুষের মাঝে জিনার মানসিক টানাপোড়েন লেখক উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

সারা :

'সোনালী জীবন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সারা। সে বাঙালি মেয়ে। কিন্তু তার বিয়ে হয় একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারের ছেলে রবিনের সঙ্গে। সারা খড়্গপুরের মেয়ে। রেল কলোনিতে সে মানুষ হয়। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে কলেজে ঢোকবার আগেই তার বিয়ে হয়ে যায়। টেলিফোন অপারেটরের কাজ শিখেছিল সারা। দাম্পত্যজীবনের প্রথমদিকটা সুখেই কেটেছিল তার। কিন্তু স্বামীর চাকরি চলে গেলে প্রচণ্ড বিপাকে পড়তে হয় তাকে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারটি ছিল রক্ষণশীল। বাড়ির বাইরে মেয়েদের যাওয়া ছিল বিধিনিষিদ্ধ। সারার জীবনে ট্র্যাজেডি আসে ছেলে স্যামুয়েল যখন বিনা লাইসেন্সে গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে এবং পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে রবিন থানায় গেলে সেও পুলিসের সঙ্গে বচসায় জেলে ঢোকে। বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি ছাড়া বাড়িতে আর দ্বিতীয় কেউ না থাকায় সারাকেই থানায় যেতে হয়। থানার বড়োবাবু সারার স্বামী আর ছেলেকে ছেড়ে দেয় সারাকে গোপনে তার ফ্ল্যাটে যাবার পরে। বড়োবাবুর হাতে সারা ধর্ষিত হয় এবং ক্রমে বাড়তে থাকে বড়োবাবুর অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা। পুরুষের উপভোগ্যের পণ্য হয়ে ওঠে সারা।

মধ্যবিত্ত মানসিকতাসম্পন্ন নারী সারা কলঙ্কের ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারেনি। বড়োবাবুও জানতো, "মেয়ে মানুষ কলঙ্কে ভয় পায়, কলঙ্ক আড়াল করার জন্যেই কেউ কেউ জড়িয়ে পড়ে আরও বেশি কলঙ্কে। তখনই ধরে নিয়েছিল, এই মেয়েটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়েমানুষকে নরমে গরমে না রাখলে ঝোঁকের মাথায় যে-কোনও দিন যা-তা করে ফেলতে পারে।"[১৬] সারার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। লেখক দিব্যেন্দু পালিত নারী চরিত্রের অসহায়তার চিত্র সারার মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন।

ঋতুপর্ণা :

'সংঘাত' উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র ঋতুপর্ণা। লেখক ঋতুপর্ণাকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এক বৃত্তির প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঋতুপর্ণা থিয়েটারে অভিনয় করে। আকস্মিকতা বদলে দিয়েছিল তার জীবনকে। বিয়ের দুমাস পর তার স্বামী মারা যায়। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে আশ্রয় হয় বাবার সেই দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট অনটনের সংসারে। ছোটোবোন, অসুস্থ বাবা আর অসহায় মায়ের জন্য সংসারের হাল তাকেই ধরতে হয়েছিল। শুরু হয় তার বেঁচে থাকার লড়াই। একটি স্কুলে পার্ট-টাইম চাকরি পায় সামান্য বেতনের। কিন্তু উপার্জনের বেশিটাই আসে থিয়েটার করে। অফিস-থিয়েটার থেকে একদিন সে স্বপ্নের চূড়ায় পৌঁছায়। আর গুণমুগ্ধ যুবক শান্তনুর সাহায্যে গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয়ের সুযোগ পায়।

গ্রুপ থিয়েটারে 'সংঘাত' নাটকে সীতা চরিত্রের অভিনয়ের অভূতপূর্ব সাফল্য বদলে দেয় ঋতুপর্ণার জীবনকে। অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে যায়।

> "যতক্ষণ নাটকের পরিবেশে থাকে, ততক্ষণই নিজের অব্যবহিত বাস্তবের রূঢ়তা থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারে সে, ততক্ষণই মনে হয় সেই মুহূর্তে সেই মুহূর্তটিই সব, অন্যরকম সাবলীলতায় নিঃশ্বাস খেলা করছে পাঁজরের খাঁজে খাঁজে! মনে হয় অন্যের লেখা সংলাপ, অন্যের ভাবা চরিত্র, অন্যের দেখানো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও ভিতরের তাগিদে ওসবকে ছাপিয়ে নিজস্ব হয়ে উঠছে সে।"[১৭]

এভাবে প্রতিটি ঘটনার মধ্যে, চরিত্রের মধ্যে নিজেকে আলাদা করে আবিষ্কার করে সে। বাইশ থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে সে নিজেরই মনের জোরে। নিজেকে

নিয়ে ভাবতে ভাবতেই খুঁজে পেয়েছে স্বনির্ভরতার অর্থ। সে আরো এগোতে চায়। তার আত্মবিশ্বাস অবচেতনায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু জীবন বদলায় না, শুধু ক্বচিৎ রঙ পাল্টায়। অনেক আগে স্বপ্নে দেখা নিয়তি আহত করে ঋতুপর্ণাকে। ফিমারবোন ভেঙে সে হাসপাতালে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। মানসচক্ষে এক-একটা ইচ্ছার সমাধি দেখতে দেখতে আকস্মিকতায় কেঁপে ওঠে সে। নাটকের ডিরেক্টর অরিজিতের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সীতা চরিত্রে তাকে আর নেওয়া হবে না।

কিন্তু সংগ্রাম শেষ হয় না। শান্তনু এসে জানায়, এবার তারা স্ট্রিট থিয়েটার করবে। উন্মুক্ত পথে চারদিকে মানুষকে রেখে হবে জীবনেরই নাটক। প্রেক্ষাগৃহের চার দেওয়ালে আভিজাত্যে আটকে পড়েছিল যে নাটক এবং নাটকের পরিচালক, এগিয়ে এসে যখন আর কিছু ভাবতে পারছিল না, তখন এইভাবেই আসে নতুন যুগ। দল ভাঙ্গে, দল গড়ে, আবার শুরু হয় মহড়া। আর ঋতুপর্ণা এবার নিজেই হাত বাড়িয়ে খুঁজে নেয় শান্তনুর "কনুইয়ের ওপরের সেই জায়গাটা, অনেকদিন আগে একদিন মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজের ভারসাম্য রাখতে যে জায়গাটা চেপে ধরেছিল সে।"[১৮] এইভাবে ভাগ্যের শাসন ভেঙে দিব্যেন্দু পালিতের চরিত্ররা বাঁচতে শিখেছে।

আত্রেয়ী :

'অনুভব' উপন্যাসের আত্রেয়ী চরিত্রচিত্রণে দিব্যেন্দু পালিত উপলব্ধির শীর্ষতায় পৌঁছান। আত্রেয়ীর নারী হয়ে ওঠার উপন্যাস এটি। সে পত্নীত্বে আবদ্ধ থাকতে চায়নি, একজন নারী হয়ে ওঠাই তার মূল লক্ষ্য ছিল। বাংলা সাহিত্যে এরকম চরিত্র খুবই কম।

'অনুভব' উপন্যাসের কাহিনি নারীদেহকে যুগে যুগে ব্যবহারের কাহিনি, যা অতীত কাল থেকে ঘটে আসছে। বর্তমানে ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে, গ্লোবাল ট্যুরিজমের নামে যে 'সেক্স ট্যুরিজম্' প্রোমোট করা হচ্ছে, সেই বিষয়কে সামনে রেখে লেখক আত্রেয়ীকে এনেছেন। যৌনকর্মী বা কলগার্লদের নিয়ে আত্রেয়ী নমুনা সমীক্ষা করে। এই সমীক্ষা করাটাই তার চাকরি। কিন্তু শেষপর্যন্ত আত্রেয়ী বুঝতে পারে, এর পিছনে আছে কোম্পানির নারীদেহকে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করার চক্রান্ত। সে উপলব্ধি করে নিজেও এই সব মেয়েদের মতো হয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য মেয়েদের কেস হিস্ট্রিগুলি পড়ে নিজের মনের ভিতর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলে। হঠাৎকরে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে দেয়।

আত্রেয়ীর চরিত্র আমাদের ভাবিয়ে তোলে, চিন্তায় বিদ্ধ করে তোলে। যে মেয়ে স্বাধীন হওয়ার জন্য, নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য চাকরির জন্য কাঙাল ছিল, সে হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিল। বিবেকের তাড়নায় সে একটি নতুন যুগের সূচনা করে যায়।

আত্রেয়ীর সঙ্গে আরো দুই নারীর মানসিক দৃঢ়তার মিল রয়েছে— 'স্বপ্নের ভিতর'-এর বিশাখা এবং 'সংঘাত'-এর ঋতুপর্ণার। পুরুষের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেতে বিশাখার মনে দানা বেঁধেছে স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছা। 'উইমেনস্ লিব্' পড়াশুনা করেছে সে। জীবনে সফল হয়েছে। 'সংঘাত'-এর ঋতুপর্ণার সংগ্রাম সমাজের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। স্বামী মারা যাওয়ার পর আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল সে। তার সামনে কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না। তবে প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে যাবার মতো মানসিক দৃঢ়তা ছিল। অকারণ ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়নি। বাঁচার জন্য লড়াই করেছিল, প্রতিষ্ঠা খুঁজেছিল।

নীলা :

'ওঠা কিংবা নামা' উপন্যাসের নায়িকা নীলা। একটি বেসরকারি অফিসে চাকরি করে। তার স্বামী অসীম। দুজনের চাকরিতে তারা নতুন ফ্ল্যাটে আসে। বিশেষকরে নীলার পদোন্নতিতে তা আরো সুবিধা হয়। নীলার অফিসের বসের সঙ্গে ভাব থাকায় নীলার আরো পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকে। নীলারই কথায়—

> "শ্যামলেন্দু তার ওপরে ওঠার সিঁড়ি। এখন ওঠার মুখে, তরতর করে উঠছে শ্যামলেন্দু। সে এগোলে নীলাও এগোবে। তার মানে আরও টাকা, আরও সুখ, আরও স্বাচ্ছন্দ্য।"[১৯]

শ্যামলেন্দুর সঙ্গে নীলার ভাবটা অসীম ঠিকভাবে নেয়নি। তাদের মেলামেশায় অসীম সন্দেহ করেছে। বিশেষকরে প্রতিদিন শ্যামলেন্দু নীলাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটায়। নীলাকে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলে অসীম। সাবধান করে দেয়। নীলা অসীমকে বোঝায়, "সে উঠলে অসীমও উঠবে। আজ যা হচ্ছে কালও যে তা হবে তার মানে নেই কোনও, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।"[২০] এগোতে চাইলে চাকরিটাই তার আশ্রয়।

কিন্তু যতো দিন গেছে ততো শ্যামলেন্দুর সঙ্গে নীলার মেলামেশা বাড়তে থাকে। শ্যামলেন্দুর ফ্ল্যাট পর্যন্ত নীলা এগোয়। তাদের মেলামেশাটা আর গোপন থাকেনি। অসীমের

সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। অসীম বলে, "চাকরি ছাড়লেও স্বভাব তোমাকে ছাড়বে না। ... দেরি হয়ে গেছে।"[২১] ধীরে ধীরে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কটা ভাঙতে থাকে।

নীলা এতোদিনে অসীমকে চিনেছে। সন্দেহ ছাড়া আর কিছুই পায়নি অসীমের চোখে। নীলা দুই পুরুষের মাঝামাঝি থাকতে চায় না। আত্মহত্যা করে এর সমাধান খুঁজতে চায়। বোঝাতে চায় সে অসীমকেই ভালোবেসেছে। কিন্তু নীলা আত্মহত্যা করতে পারে না। মনের ভিতর এক অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভব করে সে। শূন্যতায় ছুঁয়ে যায় তার সমস্ত আকাশ। মনের ভিতর একটাই কথা ঘুরপাক খায়, অসীম বলেছিল, চাকরি নিয়ে বাঁচতে, তাকে নিয়ে নয়। নীলা কোনো কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারে না।

নীলা একবারে আধুনিক নারী। অসীমের শিকলবাঁধা হাত সে মেনে নিতে পারেনি। চাকরি করে নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছিল। নিজের ছোটো ছোটো স্বপ্নগুলোকে পূরণ করতে চেয়েছিল। অসীমের একগুঁয়েমি স্বভাব আর সন্দেহ তাকে সেটা করতে দেয়নি। তাই নীলা একা বেরিয়ে পড়েছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। মুক্তি খুঁজেছে নিজের মধ্যে।

১. খ. প্রধান পুরুষ চরিত্র :

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্ররা সুযোগ পেলেই সমাজের সব অনুশাসনকে গলাধঃকরণ করে নীতির বাইরে যেতে দ্বিধা করেনি। আবহমান সংস্কারেই সমর্পিত হয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে অনেকেই। অনেকে সুদিনের স্বপ্নে বিভোর থেকেছে। অনেকে ক্রমশ বদলে-যাওয়া এবং বদলাতে চাওয়া মানসিকতা নিয়ে দেখা দিয়েছে।

কথক (নামহীন যুবক) :

'ভেবেছিলাম' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একজন নামহীন যুবক। তার বয়স তিরিশ বছর। উপন্যাসে বেকারত্ব, প্রেমহীন জীবন, সংশয়, সংকট এবং ব্যর্থতার মধ্যে সে নিজেকে খুঁজে চলেছে। তার এই জীবনকাহিনির সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছবিও ধরা পড়ে।

যুবকটি একজন সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণির। একসময় সে বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতি পাগল ছিল। কিন্তু বয়স তিরিশের কাছাকাছি এসে কর্মহীনতার কমপ্লেক্স তাকে ঘিরে ধরে। তার চোখে তখন সবকিছু অবিশ্বাসে পরিণত হয়। একটি সংবাদপত্র অফিসে চাকরি পায়, কিন্তু

বিভিন্ন ঘটনাসূত্রে অফিসের ম্যানেজারসহ অন্যান্যদের প্রতি সে বিশ্বাস ধরে রাখতে পারেনি। অফিসে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির শিকার হতে হয় তাকে। সে মনেপ্রাণে কাজ করলেও কারো প্রতি আস্থাভাজন হতে পারেনি। অফিসকর্মীরা সুব্যবহারের আড়ালে তাকে ব্যবহার করেছে। বেশি সৎ হওয়ায় তাকে গণপতির মতো অসৎ মানুষের কাছে ব্যঙ্গের পাত্রও হতে হয়। আবার সেনগুপ্তর মতো অফিসারের মন পাবার জন্য, তাকে তার সুনজরে আসার চেষ্টা করতে হয়েছে। বন্ধু বীরেনের প্রেমিকা শ্যামলীর প্রতারণার খবর শুনে কথক আরো বেশি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের প্রতি ভণ্ডামি, প্রতারণা, বিশ্বাস হারানো— এসব কিছু তার মনকে বিষিয়ে তুলেছে। হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেন্টে তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারে, সন্তানসম্ভবা নার্স প্রীতিলতা সরকারকে কাজে অনুপস্থিত থাকার জন্য কাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তার মাসমাইনে নব্বই টাকা কেউ একজন প্রতিমাসে তুলে নিতে থাকে। বিধবা প্রীতিলতা যার খবরটুকুও জানে না। অনাহারে দিন কাটা প্রীতিলতার কথা খবরের কাগজে আনতে চাইলে হেল্‌থ্‌ অফিসারের কারসাজিতে কথককে ফেঁসে যেতে হয়। এই ঘটনার একমাস পরে কথককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী পাঁচ-ছয়ের দশকের বিপন্নতা এই চরিত্রটির মধ্যদিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন। একজন চাকরিহীন যুবকের আশা ও আশাভঙ্গের কাহিনির সঙ্গে নিজেরও জীবন মিলিয়ে দেন লেখক দিব্যেন্দু পালিত।

দাশরথি মিত্র :

'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দাশরথি মিত্র। খুবই সামান্য বেতনে কেরানীর চাকরি করেন। তার উপার্জনে সংসার চলে না। উপার্জনশীল বড়ো ছেলে কনক সংসারের যাবতীয় ভার বহন করতো। কনকের আকস্মিক মৃত্যুতে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তার উপর এসে পড়ে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সহ যে টাকা ছিল সবটাই ছেলের চিকিৎসায় ব্যয় করেন। ফলে সংসার চালানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার উপর বিবাহ উপযোগী দুই মেয়ে তার ঘাড় থেকে ঝুলছে 'প্যারালিটিক' হাতের মতো। তার চাকরিরও আর মাত্র দুই বছর বাকি। পুত্রের মৃত্যুতে সে নিস্তব্ধ, শূন্য ও বিষণ্ণতায় ক্ষতবিক্ষত হয়। লেখকের কথায়—

"দেখেই মনে হয় নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা মানুষটি— থলি হাতে বাজারে যান সকালে, অফিসের সময়ে অফিসে, ফেরার ভিড়ে অন্যমনস্ক চেয়ে থাকেন দূরে, আর চিন্তায় ঘুম হয় না রাতে।"[২২]

জীবনে চলার পথের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির কেরানী দাশরথি মিত্রর ট্র্যাজিক যন্ত্রণার কথা লেখক উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। পুত্রশোক নিয়ে দাশরথি নির্বিকার এবং উদাসীন। সবসময় তার মেজাজ রুক্ষ। মুখের ভাষা ও আচরণে বেসামাল হয়ে পড়েন। ছেলের শ্রাদ্ধশান্তির জন্য ব্রাহ্মণকে পাঁচ টাকা বেশি দিতে চাননি। বরং ব্রাহ্মণের গায়ে হাত দিয়েছেন। ব্রাহ্মণের নামাবলি রাস্তায় ফেলে দিয়েছেন। ক্ষিপ্ত মনে চিৎকার করে বলেছেন, "আটান্ন বছর বয়সে নিজের হাতে সন্তানকে পুড়িয়ে এসে গ্যাঁট হয়ে বসে আছি। কাউকে ভয় পাই না। শ্রাদ্ধের মুখে লাথি মারি— "[২৩]

সাময়িকভাবে জীবনযুদ্ধের লড়াইয়ে দাশরথি হেরে গেছেন। কয়েকটা টাকা বাঁচাবার জন্যই তিনি আজকের দিনে রাস্তায় নামলেন, মানসম্মান নষ্ট করলেন। তার যন্ত্রণাদগ্ধ বিকৃত আচরণ আরো ধরা পড়ে ছেলের ইনসিওরেন্সের টাকায় রেস্টুরেন্টে খেতে ঢোকার পর। কালাশৌচের সময়ও তিনি সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে কাটলেট ও কফি খেয়েছেন। অনেকটা লোভী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছেন তিনি। আসলে জীবনের কাছে হার মানতে পারেননি দাশরথি। বিবেকবোধে ছেলের বন্ধুদের একদিন ইনসিওরেন্সের টাকায় খাওয়াতে চেয়েছিলেন।

মনে রাখতে হবে, যে সময়ে উপন্যাসটি রচিত তখন বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরম টালমাটাল অবস্থা। আর্থিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ দিশাহীন। না খেতে পেরে মানুষ পথে বসেছে। এই অবস্থায় তবু ভাঙাচোরা রাজনীতিই ছিল নিরন্ন অসহায় মানুষের শেষ আশ্রয়। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় পুত্রশোকের যন্ত্রণাকে সহ্য করে অবলীলায় দাশরথি মিছিলে যোগদান করেছেন—

"মিছিলের মধ্যে মিশে অন্যদের সঙ্গে আকাশে মুঠি তুলে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলেছেন দাশরথি। এতো দিনে আরো শীর্ণ হয়েছেন, আরো ন্যুব্জ। কিন্তু এই মুহূর্তে অদৃশ্য কোনো শক্তি ওঁর মুখে তীব্র প্রত্যয় এনে দিয়েছে।"[২৪]

নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের রাজনীতিই ছিল প্রতিবাদের সুর। তারা সারাজীবন কিছু না পেলেও মিটিং-মিছিলে অনায়াসে যোগ দিয়েছে। মার খেয়েছে কিন্তু পিছিয়ে পড়েনি। দারিদ্র্যের সীমাহীনতায় ভেসে গেছে তাদের ঘর-সংসার, পরিবার। কিন্তু বাঁচতে ভোলেনি। স্বপ্ন দেখে গেছে যদি জীবনে কোনোদিন সুখ আসে। তাই উপন্যাসের শেষে দাশরথির মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরের দিকে ওঠানো এবং তাতে মিশ্রিত সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের সুর। লেখক এই চরিত্রটি সৃষ্টি করে আমাদের এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন হয়তো।

রামতনু সোম :

'সম্পর্ক' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রামতনু সোম। সে একটি বড়ো ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বিজ্ঞাপন জগতের একজন কৃতী পুরুষ বলে তার সুপরিচিতি। রামতনু সোম কাজপাগল মানুষ। কুড়ি বছরের চাকরি জীবনে সে একবারও ছুটি নেয়নি। কোম্পানির উন্নতির জন্য সে রুটিনমাফিক কাজ করে গেছে। অসম্ভব তার নিষ্ঠা। নিজের ধীশক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং আত্মবিশ্বাসের ফলে অন্যান্য কোম্পানির অ্যাকাউন্ট সে ছিনিয়ে নিতে পারে। ছোটো ছোটো প্রতিযোগী এজেন্সিগুলি তাকে সম্মান করে, ভয়ও পায়। এরকম একজন মানুষ অফিসকর্মী অল্পবয়সী নীরার প্রতি পাগল। তাকে ঘিরে অবৈধ সম্পর্কের সন্দেহে রামতনু পারিবারিক দিক থেকে বিপর্যস্ত। নীরার সান্নিধ্য তাকে পঞ্চান্ন বছর বয়সেও তারুণ্য ফিরে দিয়েছে। নীরার চুল, শরীরের গন্ধ তাকে বিবিধভাবে আকর্ষণ করে। অনেক সচেতন হয়েও সে নীরার মোহের গভীরে তলিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু নীরার প্রতি মোহগ্রস্ত, দুর্বল হলেও কখনই রামতনু তার আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেয়নি। নীরাকে কেন্দ্র করে পরিবারের লোকজন, পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই তাকে ভুল বুঝেছে কিন্তু নীরার প্রতি সে কোনো খারাপ ব্যবহারের সুযোগ নেয়নি। তার প্রতি সকলের অহেতুক সন্দেহ তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে সে। আবার পুত্রের কাছে স্ত্রীর অপমানের কথা শুনে নিজের মর্যাদাপূর্ণ আসন স্থানচ্যুত হওয়ার দুঃখে তার মন অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

এরপর রামতনু পারিবারিক জীবনে নিজের ভূমিকার বদল ঘটায়। এখন সে বেশিকরে পরিবারকে সময় দেয়। অসংখ্য কাজ থাকা সত্ত্বেও পুত্রবধূকে নিজে গাড়ি করে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিতে গেছে। সেখান থেকে ফিরে দীর্ঘদিন পর স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে মিলিত হয়। শারীরিক তৃপ্তি পেলেও মনের শান্তি পায়নি। কাজের চাপ আর

পরিবারের বন্ধন থেকে বেরতে পারেনি। ফলে প্রবল আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়। ক্রমশ অন্ধকার ছেয়ে ফেলে তার মনকে। সবকিছু থেকে মুক্তি চেয়ে শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। নিঃসঙ্গ, একাকীত্বে কাটতে থাকে তার দিন। উপন্যাসের শেষে স্ত্রী-সন্তানহীন হয়ে রামতনু নীরার ফ্ল্যাটে আসে শেষ আশ্রয়ের জন্য, কিন্তু নীরাও তাকে আশ্রয় দেয়নি। সমস্ত সম্পর্কের বন্ধন ছিঁড়ে সে ক্রমশ একা হতে থাকে।

রামতনু চরিত্রের মধ্যে দুটি দিক ফুটে উঠেছে। একদিকে কাজপাগল এক কৃতী পুরুষ— যেখানে সে সৎ, কর্মপটু, শৃঙ্খলাপরায়ণ। আর অন্যদিকে পারিবারিক চাপে কিংবা অপমানে নীরার অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত অসহায় এক বৃদ্ধের ছবি ফুটে ওঠে।

প্রিয়নাথ মজুমদার :

'আমরা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র উপন্যাসের কথক প্রিয়নাথ মজুমদার। তার বয়স চৌত্রিশ। এম. এ পাশ করে একটি বেসরকারি অফিসে চাকরি করে সে। নিজের বসতবাড়ি কিংবা সম্পত্তি বলতে তার কোনোকিছুই নেই। নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির এই চরিত্রটির মধ্যদিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন জগৎ ও জীবনের অনিবার্য গতিবেগে চরিত্রের বিবর্তন। সেই সঙ্গে লেখক নিজেকেও প্রিয়নাথের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা 'কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান' গ্রন্থে বলেন—

> "প্রিয়নাথ মজুমদারের স্বচ্ছ অস্তিত্বের মধ্যে ক্রমাগত খেলা করে চলেছে ব্যক্তি ও লেখক।...প্রিয়নাথ, আর যে তাকে সৃষ্টি করেছে সে, এক লোক নয় ; কিন্তু তার বুকে ও অনুভবে তার সৃষ্টি কর্তার হাতের ছাপ কি থাকবে না।"[২৫]

প্রিয়নাথ মজুমদার বস্তুসচেতন এবং আবেগহীন এক ব্যক্তি। নদীর জল, জাহাজের বাঁশি কিংবা সূর্যাস্তের লাল রঙের প্রতি তার কোনো দুর্বলতা নেই। তবে অপমান তার খুব মনে থাকে। 'ইন্ডিপেন্ডেন্স' আর 'রিপাবলিক' শব্দ দুটো তার লেখায় একবার জায়গা বদল করলে অফিসে তাকে নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়। অফিসের বস তাকে আলাদা করে ডেকে বলেন, 'কী রকম মানুষ মশাই আপনি!' ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির এমন ইম্পরট্যান্ট একটা দিন, তাও গুলিয়ে ফেললেন'। প্রিয়নাথ সেই অপমানের দিনটা মনে রেখেছিল চৌদ্দই অগাস্ট।

এই প্রিয়নাথের জ্বালা প্রচুর। সবকিছুতে গ্রহণীয় না হবার জ্বালা। সে সোজা রাস্তায় হাঁটে চলমান ভিড়ের গায়ে গায়ে ঘাম ও বেঁচে থাকার গন্ধ শুকতে শুকতে। প্রচণ্ড ক্ষোভে, রাগে চারপাশের গতানুগতিক বেঁচে থাকার বৃত্ত থেকে বেরোতে পারে না। একসময় প্রিয়নাথ নিজেকে বলতো, 'নিশ্চিন্তে পেচ্ছাপ করার মতো একটা নিরাপদ জায়গা পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছিস না!' অতীতহীন, ভবিষ্যৎহীন প্রিয়নাথ কোনো নির্দিষ্ট কাহিনির মধ্যে ঘোরাফেরা করে না। চলমান অথচ নিত্যক্ষয়িষ্ণু এক বর্তমানের উদাসীন অংশীদার সে। বিধানচন্দ্র রায় বলতে এখন সে বিধান সরণীই বোঝে। ক্ষণিকের ভালোবাসায় প্রেমিকা তনুশ্রীর জন্য বেশি রিস্ক নিতে পারে না। তাকে বিয়ে করবে, সে আশ্বাসও দিতে পারে না। এইভাবে নৈর্ব্যক্তিকতায় প্রিয়নাথ আত্ম-উন্মোচন করে যায়। দেখিয়ে দেয় কীরকমভাবে বেঁচে আছি আমরা।

এই প্রিয়নাথ গল্প লেখে, কোনোটা ছাপা হয়, কোনোটা হয় না। ট্রাফিক পুলিস শম্ভু কিংবা বিধবা অমলাদিকে নিয়ে লেখা গল্প সম্পাদক কেন ফেরত দেয় তা বুঝতে পারে না। সুধা, তনুশ্রী, কৌশিক, মীনাকে নিয়েও একটা গল্প লিখে ফেলে 'আমরা'। এই গল্পে জীবন গতি পায়। চরিত্ররা নিজেদের জীবনে থেমে থাকে না। তারা 'বিষয়কে সিম্বলাইজ' করেছে। কিন্তু প্রিয়নাথ এ গল্পের চরিত্র হয়ে ওঠেনি। কেননা তার চলা নিজের ভিতরের দিকে, কোথাও না কোথাও নিজের সঙ্গে।

এই উপন্যাসে রাজনৈতিক পালাবদলের ইঙ্গিত আছে। পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের মন্ত্রীসভাকে ভেঙে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণ ধ্বনি দেয় 'যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ'। কিন্তু প্রিয়নাথের মনে এই রাজনৈতিক পালাবদল কোনো সাড়া ফেলেনি। সে তার অর্ধচেতন, অসাড় মন নিয়ে নিজের মনোবৃত্তে ঘুরপাক খায়। আসলে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনীতির চাপে সবকিছুই তার মনে হয় আবেগহীন এবং গুরুত্বহীন। ভোগ ও ভোগহীনতার মধ্যে কোনো সদর্থক দিক সে খুঁজে পায় না। এই চরিত্রটির মধ্যদিয়ে লেখক একক মানুষের অস্তিত্বহীনতার কথা তুলে ধরেছেন।

দীপ্ত রায় :

এইরকমই আর একটি চরিত্র 'বিনিদ্র উপন্যাসের দীপ্ত রায়। সেও কাজপাগল মানুষ। হিন্দুস্থান ফস্টার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সে। বিজ্ঞাপন জগতে লড়াকু মানসিকতা

নিয়ে সে নিজের সাফল্য এনেছে। আরো সাফল্যের আশায় নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে। সে একই সঙ্গে রামতনু সোমের সমগোত্রীয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী।

নিরলস কাজের চাপে রামতনু সোমের মতো সেও পরিবারকে সময় দিতে পারেনি। সংসার তার কাছে নেহাত এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। দায়িত্ব আর কাজের জন্য সে সমস্ত সম্পর্কে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে। তাই অর্থ আর সচ্ছলতা দিয়েই সংসারের অবশিষ্ট দায়িত্ব তাকে পূরণ করতে হয়।

গভীর অধ্যবসায়, দক্ষতা আর আত্মবিশ্বাসে বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রতিষ্ঠিত কৃতী পুরুষ রামতনু সোমকে পিছনে ফেলে দিয়েছে দীপ্ত রায়। তার কাছে অভীষ্ট পূরণই মূল কথা। স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের স্ত্রীকেও সে অস্বস্তিতে ঠেলে দিয়েছে। অফিসকর্মী সুনীতাকে ব্যবহার করেছে অন্য কোম্পানির অ্যাকাউন্ট হস্তগত করতে। 'সম্পর্ক' উপন্যাসে রামতনু সোমও নীরাকে একইভাবে ব্যবহার করেছিল। তাদের কাছে নারী হয়ে উঠেছিল পণ্য। আবার অ্যাকাউন্ট হাতে চলে এলে সুনীতাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবার পর দ্বিতীয়বার আর তার দিকে তাকাবার প্রয়োজনও মনে করেনি দীপ্ত। এইভাবে দীপ্ত রায় এক স্বার্থবাদী, সুবিধাবাদী চরিত্র হয়ে উঠেছে।

রামতনুর মতো দীপ্তর জীবনও পালটে গেছে। সময় আর পরিস্থিতি এক থাকেনি। তার জীবনেও একটা অপূর্ণতা ছিল। যা তাকে ক্রমশ নিঃসঙ্গতা আর শূন্যতার দিকে ঠেলে দিতে থাকে। বাইরে যতোটা শক্তিশালী, ভিতরে ততোটাই ক্ষয়ে যেতে থাকে সে। পঞ্চান্ন বছর বয়সে রামতনু সোম স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ-মেয়ে-জামাই— সকলের সফল সচ্ছল বৃত্তে থেকেও অল্প বয়সী নীরার আকর্ষণে নিজেকে জড়াতে থাকে। রাত্রে ঘুম না-আসা পর্যন্ত শূন্যতার অনুভবে ভয়ঙ্কর অসহায় লাগে তার। যেন দাঁড়াবার মতো কোনো জায়গা নেই। ভরসা করার কোনো অবলম্বন নেই। নিজের গড়া সুখ-স্মৃতি-লাবণ্যময় সংসারে নিজেই আজ সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দীপ্ত রায়ও উপন্যাসের শেষে একা হয়ে পড়ে। বহুদিন পর মৃত পিতাকে স্বপ্নে দেখে চোখে জল আসে তার। মা-কে টাকা পাঠানোর ব্যাপারটা যাতে ভুলে না যায় সেজন্য স্লিপ বক্স থেকে কাগজ নিয়ে লিখে রাখে। ছেলে পাপুর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আত্মজিজ্ঞাসায় বলে ওঠে—

"বিহেভ ইওরসেলফ্! লোকে তোমাকে 'হার্টলেস্' বলে জানে— শরীর, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি আর লক্ষ্যের একাগ্রতায় হৃদয় বলে কিছুর প্রয়োজন তুমি বোধ করোনি কখনও। একরাতের দুঃস্বপ্ন আর স্মৃতির ভারে এতখানি বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। মৃত্যু স্বাভাবিক।"[২৬]

এইভাবেই সময়ের চাপে জীবন আর জীবনের অর্থ কতোখানি বদলে গেছে লেখক তা দীপ্ত চরিত্রের মধ্যদিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

ব্রতীন :

'চরিত্র' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ব্রতীন। সে কলেজের অধ্যাপক। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে তৃতীয় পুরুষের প্রবেশে সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। স্ত্রীকে বেশি স্বাধীনতা দিতে গিয়ে ভুল করেছে। কলেজের অধ্যাপক বন্ধু নৃসিংহর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে তার স্ত্রী আহামরি। ব্রতীন অনেকটা খামখেয়ালি, ভাবুকপ্রকৃতির। পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ মেলামেশা করা সত্ত্বেও সে স্ত্রীকে কিছু বলতে পারে না। শুধু টের পায় তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙনের মুখে। উল্টো দিকে পাশ ফিরে শোয় তারা। এই দূরত্ব দুজনকেই ভাবিয়েছে। এক ধরনের অস্বস্তি আর মানবিক ক্লান্তিতে দিন কাটতে থাকে তাদের। "ইচ্ছে করে আজকাল অনেকটা সময় বাইরে কাটায় ব্রতীন।...মনে হয় ইতিমধ্যেই অনেকটা হেরে গেছে সে— সম্ভবত কোনো দিনিই ফিরে পাবে না পুরনো আবহ।"[২৭]

ব্রতীন বদলে যেতে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব ব্রতীন ভিতরে ভিতরে মেনে নিতে পারে না। তাই সে কলেজ ছাত্রী তৃণার সঙ্গে এক ধরনের জোর করে মিশতে থাকে। তৃণার সঙ্গে মেলামেশায় ব্রতীনের মনে লোভ সৃষ্টি হয় কিন্তু নিজের নীতিবোধ থেকে ব্রতীন সরে আসতে পারে না। নৃসিংহ যতোটা সহজে তার স্ত্রীর সঙ্গে স্বাভাবিক হতে পেরেছে ব্রতীন ততোটা তৃণার সঙ্গে হতে পারেনি। আহামরিকে সে একসময় খুব ভালোবাসতো। তৃণার মধ্যে সে নিজের স্ত্রীর ছায়া দেখতে পায়। তাই কোথাও কোনো আশ্রয় পায়নি ব্রতীন। তার সম্পর্কে লেখক বলেছেন— "সম্ভবত একটু বদলে গেছে ব্রতীন। স্বভাব এমনিতেই তার চোখমুখ জুড়ে ছড়িয়ে রাখে ভাবুকতা; কথা যতো না বলে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসে শুনতে। বন্ধু, সহকর্মী বাঁ ছাত্রদের সামনে হাসিই তাঁর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। এ ক'দিনে একটু একটু করে বদলে গেছে সে। কলেজ আসে, ক্লাসে যায়— সবই প্রায় যন্ত্রচালিত; স্টাফরুমের বিভিন্ন

আলোচনা থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখে খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিনের প্রতি মনোযোগ বাড়িয়ে। একসময় চলে যায়।"[২৮]

শিশির রায় :

'একা' উপন্যাসের শিশির রায় এদেরই উত্তরাধিকারী। সে প্রচণ্ড আত্ম-অহংকারী। খ্যাতির দম্ভে তার পা মাটি স্পর্শ করে না। সে সুবিধাবাদী, স্বার্থবাদী। মদ আর যৌনতা তার বেড়ে ওঠার মূল আশ্রয়স্থল। একজন ভীরু মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে সে। সে স্যান্ডহাম কোম্পানির তিন নম্বর পদমর্যাদার অধিকারী। তার কাছে নারী কোনো মর্যাদা বা সম্মান পায়নি। স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মদের নেশায় অন্য নারীর প্রতি সহজেই আসক্ত হয়ে পড়েছে। নিজের স্ত্রী তার কাছে একটি 'প্রাণহীন বস্তুমাত্র'।

শিশির রায় আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র। সে শুধু নিজেকে নিয়েই ভেবেছে। স্ত্রীর চাহিদা বা ব্যক্তি গত ইচ্ছার কথা একবারও ভাবেনি। তাই তার স্ত্রী শ্রীলা ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যার মধ্যদিয়ে মুক্তি খুঁজেছে। এতো প্রাচুর্য, এতো স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও হঠাৎই শ্রীলার মৃত্যুতে শিশির একা বোধ করে। নিঃসঙ্গতা গ্রাস করে শিশিরের কাজের সময়, বেঁচে থাকার সময়। তার বিবেক হয়ে আসে গ্রামের বৃদ্ধ মাস্টার নীরদ ভট্টাচার্যের মতো। পুরনো ছাতা হাতে আটপৌরে পোশাকে যে দাঁড়িয়ে থাকে। শিশির ফিরে যায় দেশ-গাঁয়ের স্মৃতিমেদুর সহজসরল শৈশবে। এখানেই সে তার শেষ আশ্রয় খোঁজে।

'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'একা' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে চরিত্রগুলোকে এক নিঃসীম একাকীত্বের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন লেখক। কিন্তু এরই কিছুটা সময় পরে লেখা 'ঢেউ' উপন্যাসে আগেকার অনেক সংশয়, সংকটের পথ পেরিয়ে একটা আশ্বাসের পথ দেখিয়েছেন। একটা স্থির বিশ্বাসে উপনীত থেকে চরিত্রগুলোকে বাঁচিয়েছেন। সমালোচক বলেছেন, "সম্পর্ক আর সম্পর্কহীনতার যে জটিলতা বিনিদ্র রেখেছিল রামতনুকে, দীপ্তর ঘুমের মধ্যে হানা দিয়েছিল হঠাৎ, একা করে দিয়েছিল শিশিরকে, সেই বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল 'ঢেউ'-এ এসে।"[২৯]

রাজনৈতিক বাবার নীতিহীনতার বিরোধিতায় অপূর্ব বাড়ি ছাড়লেও সীতার মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। 'আমরা' উপন্যাসের প্রিয়নাথের মতো সেও অপমান

সহ্য করতে পারেনি। অপমানবোধ অস্তিত্ব চিনিয়েছিল তাদেরকে। এরফলে তীব্র অভিমান নিয়ে কোম্পানিতে রেজিগ্‌নেশন লেটার দিয়েছিল। তারপর প্রায় উদ্দেশ্যহীন এক শূন্যতার অনুভূতি ঘিরে ধরে তাকে। সীতার প্রতি যে ক্রোধ, ঘৃণা, অভিমান তা অন্য এক বোধে সঞ্চারিত হয়। অন্যান্য চরিত্রের মতো এখানেও অপূর্ব আকাশের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুক্তি খুঁজেছে। উপন্যসের শেষে হাসপাতালের সামনে ট্রলির উপর সাদা চাদরে ঢাকা সীতার বুকের মধ্যে নিজের ভাঙাচোরা মুখটা নামিয়ে নিয়ে এসে অপূর্বর কান্না হাহাকারে ভেঙে পড়ে— 'নো, ইউ কানট্ গো লাইক দিস'। 'সম্পর্ক' উপন্যাসে কম বয়সী মেয়ে নীরার সঙ্গে রামতনুর সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি তার স্ত্রী, নীরাও শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছিল রামতনুকে। ফলে রামতনু একা হয়ে পড়ে। এই একাকীত্বের মধ্যে লেখক তাকে রেখে দিয়েছিলেন। 'বিনিদ্র' উপন্যাসেও দীপ্ত রায় স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে গেলে একা হয়ে পড়ে। 'একা' উপন্যাসের শিশির রায় নিঃসীম একাকীত্বে ভোগে। কিন্তু 'ঢেউ' উপন্যাসের শেষে অপূর্ব ভেসে যায়নি। সীতার নাবালক ছেলে বাবলুকেও অসীম মমতায় বিমলকৃষ্ণ আগলে রেখেছে।

অশোক :

'বৃষ্টির পরে' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অশোক। অশোক গ্রাম বাংলার ছেলে। চাকরির সূত্রে কলকাতায় থাকে। তিন কূলে তার কেউ ছিল না। গ্রাম বাংলাকে ভালোবাসার ছেলে অশোক কলকাতায় আসার সময় তার মনে হয়েছিল, জীবন অর্থহীন হয়ে পড়বে। একসময় অব্যক্ত অভিমানে তার আত্মহত্যার চিন্তা আসে। কিন্তু কলকাতায় এসে গঙ্গা নদী তীরবর্তী প্রকৃতি আর তার আশপাশের মানুষগুলোর সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানকার নদী, ঘাস, মাটির সংস্পর্শের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে যায়।

> "একা এসে দাঁড়ালে পৃথিবীর নির্জনতম জায়গা বলে চেনা যায়। জলের পর জলের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সহজেই এলোমেলো করে দেয় ভাবনাগুলো।...শুধু বুঝতে পারে নদীটা তাকে টানে। নির্জনতা তার খুব প্রিয় নয়, নিঃসঙ্গতায় বরং একটু ভয়ই লাগে। তবু আসে, দাঁড়িয়ে দেখে।"[৩০]

নিজের গ্রাম থেকে এসে প্রথমে অশোক শ্যামশ্রীদের বাড়িতে সাত দিন কাটায়। এই কয়েকদিনেই তাদের বাড়ির সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শ্যামশ্রীর মা রাজবালা দেবী তাকে

নিজের সন্তানের মতো দেখে। শ্যামশ্রীর দাদা বিষাণের সঙ্গে তার গলাগলি ভাব। একসঙ্গে নদীতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে যায়, ফুটবল খেলে, সিনেমা দেখতে যায়। এইভাবে তার দিনগুলো ভালোই কাটছিল। কিন্তু পরপর কয়েকটি ঘটনা তাকে এবং পাড়াপ্রতিবেশীদের এতোটা বিপর্যস্ত, অসহায় করে দিয়েছে যার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাই যেন নষ্ট হয়ে গেছে। তার মনে হয়েছে, সময় ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে, কমে যাচ্ছে ভালোবাসার মানুষ। সে জানে এখানকার মানুষ তার কেউ নয়। স্মৃতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে হয়তো কিছুটা যাওয়া যেতে পারে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুনতে পায় নিঝুম হয়ে যাচ্ছে শহরটা। একদিন সব থেমে যাবে। শুয়ে থাকতে থাকতে আদ্যন্ত বিষাদে মগ্ন হয়ে পড়ে। এই শহরের ভাঙাচোরা, বিবর্ণ অস্তিত্বের মধ্যে থেকে এখন কোথায় সে নিজেকে খুঁজে পাবে তার চেষ্টা করে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে গ্রামবাংলার কথা নেই। সবই নগর কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তাই অশোকও স্বাভাবিক ভাবে নগর কলকাতার ব্যস্ত জীবনে এসে পড়েছে। শহর জীবনের অভিজ্ঞতা, কদর্যতা একজন গ্রামবাংলার ছেলেকে কেমন প্রভাবিত করে তাই লেখক তার মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রজত :

দিব্যেন্দু পালিত ছয়-সাতের দশকের অস্থিরতার আবর্তে নিরাপত্তা হারানো তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে পূর্ণবয়স্ক মানুষের অসহায়তার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজনীতি নয়, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পুলিসি ব্যবস্থার সম্মিলিত ফাঁদের মধ্যে পড়ে যাওয়া ভিক্‌টিম্ যারা তাদের কথা তুলে ধরেছেন— 'উড়োচিঠি', 'সহযোদ্ধা', 'গৃহবন্দী' প্রভৃতি উপন্যাসে। সাতের দশকের রাজনীতি আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ ছিল। 'উড়োচিঠি' উপন্যাসের চরিত্ররা তাদের চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়স থেকে চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। এদেরই প্রতিনিধি রজত। সে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। মধ্যবিত্ত সমাজের ভীরু, দুর্বল, অসহায় বাঙালি চরিত্র থেকে সে সম্পূর্ণ পৃথক। সমাজের সবরকম আবদ্ধতাকে সে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সে নির্ভীক। স্কুলের উঁচু ক্লাসে থাকার সময়ই একদিন তাকে বিনা কারণে পুলিস ধরে নিয়ে যায়। স্কুলের হেড মাস্টারসহ অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরা কেউই এর কোনো প্রতিবাদ করেননি। বরং হেডমাস্টার মশাইয়ের

উক্তি ‘আমি প্রতিবাদ করার কে? পুলিসের অর্ডার!’ নিরাপদে গাঁ বাঁচানো হেডমাস্টারের দুর্বল, ভীরু স্বভাব সমাজের নির্ঝঞ্ঝাট মধ্যবিত্ত বাঙালি চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়।

রজত পনেরো মাস জেল খাটে। জেলে অনেক মার খায়। কিন্তু ভেঙে পড়েনি। জেল থেকে ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এবার সে তার সাহসিকতার পরিচয় একাই দিয়েছে। ক্লাস চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়নের ইলেকশনের জন্য ভোট চাইতে আসা রাজনৈতিক কর্মীদের সরাসরি আক্রমণ করে। ভোট চাইতে আসা প্রার্থী ও তার সমর্থকদের সঙ্গে মারপিট করে। রজতের পাশে কেউ এসে দাঁড়ায়নি। ক্ষমতার রাজনীতির অত্যাচারকে রজত মেনে নিতে পারেনি।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে বলা যায় রজতের নবজন্ম হয়েছিল। কান্নাকাটি কিংবা ভাগ্যের উপর কোনো দোষারোপ করেনি। তার বাবা-দাদা কেউ আর আশ্রয় দেয়নি তাকে। এমনকি তার দাদা মাসে মাসে যে টাকা পাঠাত পড়াশুনার জন্য, সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। রজতের পক্ষে পড়াশুনা চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে নিজের লড়াই নিজে করে গেছে সে, কোনোরকম ভাগ্যের দোহাই দেয়নি। বরং ঘুণধরা পঙ্গু সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। তার অন্তরাত্মা বলে ওঠে, ‘আমি শুধু চিনে রাখছি এই ঘা-গুলোকে, আর তোমাদের।...তোমরাই আমার জোর বাড়িয়ে দিচ্ছ’।

এই বয়সেই রজতের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নীতিবোধসম্পন্ন একটি মানুষকে। যে সমাজের সমস্ত পঙ্কিলতাকে দূরে রাখতে চায়। সমাজকে গড়ে তুলতে চায় সুস্থ ও স্বাভাবিক। প্রেমিকা টুপুরের ভালোবাসা তার এই মনোভাবকে আরো বাড়িয়ে দেয়। টুপুরের সমস্ত লজ্জা, সংকোচ মুছে দিয়ে সহানুভূতিতে তাকে কাছে টেনেছে। আলোর পথ দেখিয়েছে।

উপন্যাসের শেষে মধ্যবিত্ত আপসকামী মনোভাবাপন্ন তার বাবার কাছে রজত ঘৃণায় যায়নি। রজতের লড়াই ছিল সমগ্র সিস্টেমের বিরুদ্ধে। কিন্তু একার পক্ষে বদল ঘটানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই লেখক সচেতনভাবে ‘সহযোদ্ধা’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আদিত্য রায়কে নিয়ে এলেন।

বিমান মজুমদার :

'অহঙ্কার' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিমান মজুমদার। সে মার্কেন্টাইল ফার্মের একজন ভালো কর্মী এবং সে বুদ্ধিমান। খুব সহজেই নিজেকে বিশ্লেষণ করে নিতে পারে এবং প্রয়োজন মতো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে তার অসুবিধা হয় না। সে ধীর, স্থির, সামান্য ব্যাপারে বিচলিত হবার মতো মানুষ নয় সে। সে যুক্তিবাদী, কিন্তু মধ্যবিত্ত মানুষের মতোই সময়নিষ্ঠ এবং ছকে বাঁধা জীবনে অভ্যস্ত। সে অবিবাহিত। উপন্যাসে জ্যোতি আর নীপার দাম্পত্য সম্পর্কে সে তৃতীয় পুরুষ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কুড়ি বছর ধরে জ্যোতি আর নীপার বাড়িতে ভাড়া থাকে বিমান। এই দীর্ঘ সময় ধরে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙা গড়াকে লক্ষ করে সে। জ্যোতির রোগ, অসুস্থতা ও দাম্পত্যজীবনে ব্যর্থতার আড়ালে নীপার প্রতি তার ভালোবাসা জন্মায়। কিন্তু পৌরুষের চেয়ে স্বামীত্বের জোর বেশি বলে সে ভয় পায়। আশ্রয় দিতে পারে না নীপাকে। কর্তব্য আর নীতিবোধের শিকলে বাঁধাকে সে এড়াতে পারেনি। শুধু বুঝতে পারে জ্যোতি-নীপার দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েনে সেও ক্ষতবিক্ষত।

বিমান একজন কাপুরুষের পরিচয় দিয়েছে। সে সবসময় আত্মরক্ষা করে চলেছে। সুদেষ্ণা আর নীপার মধ্যে শুধু নিজের ভালোটুকু বজায় রাখতে চেয়েছে। মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার জন্য নীপা বা সুদেষ্ণার কাছে নির্লিপ্ত থেকেছে। ভালোবাসার মর্যাদা দিতে পারেনি। উপন্যাসের শেষে জ্যোতি মারা গেলে মা ও মেয়েকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই দেখায়নি সে।

আদিত্য রায় :

আদিত্য রায়ও একটি একক প্রতিবাদী চরিত্র। সে একটি বড়ো কোম্পানির এক্সিকিউটিভ এবং প্রতিবাদী লেখক হিসাবে তার খ্যাতি। 'স্বকাল', 'শঙ্খ' প্রভৃতি পত্রিকায় তার লেখা নিয়মিত বের হয়। সে বলে, "লেখক হিসেবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে আমি রাইফেল হাতে রাস্তায় নামব না; শ্রেণী সংগ্রামের জিগির তুলে সস্তা হাততালি পাবার দিকেও যাব না। আপনি তো জানেন, আমি কংগ্রেস, কমিউনিস্ট কি নকশাল— কোনও রাজনৈতিক দলেরই সদস্য নই।"[৩১] একটি খুনের ঘটনার কোনো সাক্ষী নেই বলে আদিত্যকে একা লড়াইয়ে নামতে হয়েছে। লড়াইয়ের চেহারাও পৃথক। সে এক নিঃশব্দ বিপ্লব। আদিত্য বুঝতে পারে সে একটা অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। যে সময় মানুষের মনের মধ্যে হারিয়ে গেছে

বিশ্বাস, প্রতিবাদ করার ন্যূনতম ভাষাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে মানুষ। গণতন্ত্রের কণ্ঠকে রোধ করার জন্য সরকার তৎপর হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রপতি শাসনে দেশ চলছিল। কোনো স্তরের মানুষেরই বাক্‌স্বাধীনতা ছিল না। সাংবাদিক এমনকি শিল্পীরও নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা ছিল না। পুলিসি হামলায় বহু যুবকের মৃত্যু হয়েছে। দেশের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন অনেকেই— "গত চার-পাঁচ বছরে আমাদের বেস্ট বয়েজদের একটা জেনারেশন শেষ হয়ে গেল! বিপ্লবের স্বপ্ন না দেখে এরা পড়াশুনা করে সহজেই চাকরি-বাকরি, প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেতে পারত। ভুল হোক ঠিক হোক, কী অসম্ভব সাহস, আত্মত্যাগ! দেশ একদিন এদের মিস করবে। একদিন বুঝতে পারবে— "[৩২]

আবার লেখক সুবন্ধু মিত্র প্রশাসনকে আক্রমণ করে 'জহ্লাদের প্রশাসন' লেখার জন্য অ্যারেস্ট হয়েছে। বিদ্রোহী লেখা প্রকাশিত হওয়ায় 'স্বকাল' পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেছে। সম্পাদক দেবু চৌধুরী সরকারি রোষে প্রকাশনা বন্ধ হওয়ায় চরম আতঙ্কের মুখে পড়েছে। এরকম অবস্থায় আদিত্য রায়ের সরকার বিরোধী লেখা প্রকাশ করতে সে দ্বিধাগ্রস্ত। এই পরিস্থিতিতেও আদিত্য মনে মনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে।

তবে এরকম লড়াইয়ে সে ক্রমশ একা হতে থাকে। মনে একটা প্রবল ধাক্কা লাগে। ক্রমশ অস্থির হয়ে পড়ে। সে প্রত্যক্ষ কোনো রাজনীতি করে না। সবসময় নিজের কাছে সৎ থাকতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই সময় তাঁর লড়াইটা শুধু গোটা সিস্টেমের বিরুদ্ধেই নয়, নিজেরও বিরুদ্ধে। ঘটনাটি বন্ধু ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অশোক দত্তকে জানালে সে আদিত্যকে সতর্ক করে দেয়। স্ত্রী শ্বেতাও তাকে সন্দেহ করেছে, প্রশ্ন করেছে— 'তোমার হেঁয়ালি কিছুই বুঝি না। নিজেও মরবে, আমাদেরও মারবে'। স্ত্রীর কাছে আদিত্য খোলামেলা হতে পারেনি। সে বুঝতে পেরেছে এই লড়াইটা তার একার। তার এই ভাবনা চেঁচিয়ে বললেও কেউ বুঝতে পারবে না। আসলে তার অবস্থা হয়েছে—

'আলো-অন্ধকারে যাই— মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয়— শান্তি নয়— ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;' ('বোধ'/জীবনানন্দ দাশ)

লোকাল থানার পুলিস গভীর রাতে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির হয় আদিত্যর বাড়ি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না থাকলেও এই মুহূর্তে আদিত্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে এক অলৌকিক শক্তি। সাধারণ মানুষ বিমূঢ় অবস্থায় যা করতে বাধ্য হয়। মেয়ে পৃথা ভবিষ্যতের ভয়ংকর পরিস্থিতি বুঝে ভয় পেলে আদিত্য দৃঢ় কণ্ঠে জানায়, "মারা সহজ নয়। বুঝতে পারছিস না, ওরা ভয় না পেলে আমাকে অ্যারেস্ট করার কথা ভাবত না।"[৩৩]

আদিত্য সাহসী, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, সামাজিক বোধ এবং বিবেকধর্মী। উপন্যাসের শেষে তার মনন মৃত্যুঞ্জয়ী উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ। এমনকি তার স্রষ্টা দিব্যেন্দু পালিতের জীবনদর্শনও তাই। উপন্যাসের শেষে আদিত্যকে যখন পুলিস নিয়ে যেতে এসেছে তখন মেয়ে ভয় পেয়ে বলেছে 'ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে বাবা', তখন আদিত্যর কণ্ঠস্বর 'ওরা আমাকে মারতে পারবে না ওরা ভয় পেয়েছে'। এই সাহস, আত্মবিশ্বাস একজন সাহসী শিল্পীর। আর এই উপলব্ধিতে পৌঁছানোতেই দিব্যেন্দু পালিত আদিত্য চরিত্রের শুরু থেকে শেষ অবধি ক্রমবিবর্তন ঘটিয়েছেন।

আদিত্যর উৎস আমরা 'উড়োচিঠি' উপন্যাসের রজতশুভ্রর মধ্যে খুঁজে পাই। রজত স্কুলে পড়াকালীন বিনা কারণে পুলিসের ফাঁদে পড়ে। মিথ্যা খুনের অপবাদে পুলিশের মার খায় ও তিন বছর জেল খাটে। কিন্তু জেল থেকে বের হয়ে ভেঙে পড়েনি। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। টুপুরের ভালোবাসা তার কাছে জীবনাশ্রয় হয়ে উঠে। আদিত্য যেন সেই রজতেরই পরিণত বয়স্ক একজন মানুষ। সেদিন পুলিসের যে অত্যাচার রজত গায়ে সয়েছিল, সেই মিথ্যা খুনের অপবাদে ক্ষমতার রাজনীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছিল। সেদিন হয়তো একা সাহস পায়নি রজত লড়াই করতে। কিন্তু আদিত্য সাতচল্লিশ বছর বয়সে একা পুলিসের অমানবিক দমননীতিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। তাকে শেষে জেলে যেতে হয় ঠিকই, কিন্তু প্রশাসন ভয় পেয়েছিল বলেই মুষলধারা বৃষ্টিতে গভীর রাতে তাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছিল। আদিত্যর বিশ্বাস ছিল—

"রাতের অবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তার মধ্যে
শুধু ঐ প্রতিশ্রুতিই
হঠাৎ হঠাৎ জাগিয়ে দেয় আমাকে—
দেখো, ঠিকই ফিরে আসবো।" ('বড় ছেলে ছোট ছেলে'/দিব্যেন্দু পালিত)

দিব্যেন্দু পালিতের এরকম অসম্ভব সংবেদনশীল মন এবং কলম, যা আমাদের মধ্যবিত্ত রাজনীতি সচেতন অনুভূতিপ্রবণ মনগুলিকে মুচড়ে দেয়।

শুধু তাই নয়, দিব্যেন্দু পালিতেরও পুলিসের আচরণ আর মানবিক ন্যায়বোধের মধ্যে যে ফারাক তার প্রতি রয়েছে অসমর্থন এবং ঘৃণা। আসলে লেখক ভিতরে ভিতরে বহুদিন ধরে এরকম একটি চরিত্র হয়তো খুঁজেছেন কিন্তু রজতের মধ্যে তা পূর্ণতা পায়নি বা যুবক বয়সের যে রক্তের গরম তা দিয়ে তিনি প্রতিবাদ করতে চাননি। তাই সচেতনভাবে আদিত্যকে নিয়ে এলেন।

সুশোভন মুখার্জী :

'অন্তর্ধান' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুশোভন মুখার্জীও একটি একক প্রতিবাদী চরিত্র। 'সন্ধিক্ষণ'-এর দাশরথি মিত্র কিংবা 'সহযোদ্ধা'র আদিত্য রায়ের মতো সুশোভন মুখার্জীরও লড়াই প্রশাসনের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে। রিটায়ার্ড অধ্যাপক সুশোভন মুখার্জীর বড়োদাদার মৃত্যুর দিনেই নিরুদ্দেশ হয় তার একমাত্র মেয়ে ইনা। অনুসন্ধান যতোই এগোতে থাকে পিতৃহৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসের বিপ্রতীপে ততোই খুলে যেতে থাকে সমাজ ও প্রশাসনের নির্লজ্জ চেহারা। থানার ও-সি, ডি-আই-জি, কমিশনার, উকিলের কাছে অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়ান তিনি। এভাবে একসময় অপমান ও লাঞ্ছনার শেষ সীমায় পৌঁছে যান। মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু বিন্দুমাত্র আশা ছাড়েননি। মনের মধ্যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যয় নিয়ে আসেন—

> "আমি ছাড়বো না— যতদিন না ওর অন্য কোনো খবর পাচ্ছি, ততদিন জানবো ও বেঁচে আছে। আমি খুঁজবো।"[৩৪]

মেয়ের জন্য শূন্য বুক পেতে চুপ করে থাকেননি সুশোভন মুখার্জী। নিজের আত্মবিশ্বাসে ভাঙন ধরলেও বিশ্বাসে চিড় ধরেনি তার। বিশ্বাসই তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অদ্ভুত এক ব্যর্থতাবোধ সারাক্ষণ ছিঁড়ে খাচ্ছিল তাকে। এক মুহূর্তও স্থির থাকতে পারেননি। তাই স্ত্রীকে না জানিয়ে মেয়েকে খোঁজার উদ্দেশ্যে একা বেরিয়েছেন। জনৈক এক বিশ্বস্ত লোকের কাছে জানতে পারেন মেয়ের খোঁজ। কিন্তু মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েন।

"আমার নিজেরই দ্বিধা ও সন্দেহ আমাকে বঞ্চিত করল। এখন অনুশোচনা হচ্ছে এই ভেবে যে ঈশ্বর আমাকে সাহস দিয়েছেন, কিন্তু দেননি নিজেকে জয় করার সম্পূর্ণতা।"[৩৫]

নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভেবে ভয় পেয়েছেন। মেয়েকে ফিরে এনে যদি লোকে ঘৃণা করে। মেয়ে অক্ষত অবস্থায় আছে কিনা ভেবে আশঙ্কা অনুভব করেছেন। তিনি স্ত্রীকে জানান—

"পুতুর জন্মদিনে, যেদিন তুমি রাতের ভয়ানক অন্ধকারে বেরিয়ে গিয়েছিলে, সেদিনই আমি অনুভব করেছিলাম আমরা আর স্বাভাবিক মানুষের মতো নেই; এই ক'মাসে হয়ে উঠেছি অন্ধকারেরই প্রাণী। আমাদের সম্মুখে কোনও দিশা নেই। এই সত্য স্বীকার মৃত্যুরই সমান।"[৩৬]

শেষপর্যন্ত মেয়ের খোঁজে গিয়ে সুশোভন মুখার্জীও হারিয়ে গেলেন। স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তার গভীর যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত হয়। লেখক তবু আশা ছাড়েন না। তাই জেদে, প্রত্যয়ে কঠিন হয়ে ওঠে নতুন তদন্তকারী অফিসার লোহিত রায়ের মুখ—

"সে জানে, যে কোনো সন্ধানেরই শেষে থাকে হয় জীবন, না হয় মৃত্যু। মাঝখানে কিছু নেই। যেভাবেই হোক দুটির একটিতে পৌঁছতে হবে তাকে।"[৩৭]

অনীশ দত্ত :

'অনুসরণ' উপন্যাসের মূল চরিত্র অনীশ দত্ত। সে পেশায় সাংবাদিক। বন্ধু পুলকেশের বাড়ি থেকে ডিনার সেরে আসার সময় মধ্যরাতে তার স্ত্রী এষা কিডন্যাপ হয়। পুলিসকে খবর দিলেও ঘটনাটি যাতে জানাজানি না হয় তার জন্য সে অনুরোধ করে। স্ত্রীর খোঁজ কেন সে আড়াল করতে চায়— এই প্রসঙ্গে তার চরিত্রে অসঙ্গতি দেখা যায়। পরবর্তীতে স্ত্রীকে খোঁজার কোনো উদ্বেগ সে প্রকাশ করেনি। বরং স্বাভাবিকভাবেই অফিসের কাজ করেছে সে। এষার থাকা কিংবা না থাকার মধ্যে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেটা তাকে স্পর্শ করে না। কিডন্যাপের সময়ই সে নিজেকে ছাড়া আর স্ত্রীর কথা ভাবেনি। আত্মরক্ষার জন্য সে জ্ঞান হারানোর ভান করেছিল। স্ত্রীকে বাঁচানোর কথাও ভাবেনি।

স্ত্রী অপহৃত হওয়ার পর অনীশের ভূমিকা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এই দুর্ঘটনাটি কেন সে গোপন রাখতে চায় তা উপন্যাসে স্পষ্ট নয়। কিন্তু এটা বোঝা যায়, স্ত্রীর না থাকাতে সে একরকমের স্বস্তি কিংবা মুক্তি পেয়েছিল। অপহৃত স্ত্রীর কথা না ভেবে বন্ধু প্রলয়ের স্ত্রী বর্ণার কাছে গেছে। উজ্জ্বল চেহারার যুবতী বর্ণার শরীরে ডুবে থাকতে চেয়েছে।

অনীশ স্বার্থবাদী এবং মিথ্যাবাদী। তার স্ত্রীর কথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করলে সে সবাইকে মিথ্যা কথা বলেছে। কাজের মেয়ে সীমাকে আর তার বাবা-মাকে বলেছে এষা তার বাপের বাড়ি গেছে। এষার মাকে বলেছে এষা শান্তিনিকেতনে ঘুরতে গেছে। অফিসের সহকর্মী বন্ধু অশোককে বলেছে, এষা তার অসুস্থ বাবাকে দেখতে গেছে। পুলিসের কাছেও মিথ্যা কথা বলেছে। পুলিস এষাকে খোঁজার জন্য তার সহযোগিতা চাইলে অনীশ সত্য কথার সঙ্গে কিছুটা মিথ্যাও বলেছিল। পুলিসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সে বলে, মধ্য-কলকাতার একটি গলিতে একজন লেডি ডাক্তারের কথা। কিন্তু গলিটি দুটি মধ্য রাস্তার মধ্যে সংযোজক, ওখানে একটি বস্তি আছে আর কোনো দিনই সেখানে কোনো লেডি ডাক্তার ছিলেন না।

অনীশ এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। পত্রিকায় ধর্ষিত মায়ারানীর খবর পড়ে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে। ছাব্বিশ বছরের গৃহবধূ মায়ারানী অপহৃত ও ধর্ষিত হওয়ার পর তার স্বামী তাকে ঘরে ফিরে আনে। যদি এষাকে খুঁজে পায় পুলিস, সে কি পারবে তাকে আবার গ্রহণ করতে? পাড়াপ্রতিবেশী কি বলবে এ ব্যাপারে? কীভাবে তাদের দিকে তাকাবে? অনীশ মায়ারানীর ঘটনাটি মেনে নিতে পারেনি বলে নিজের স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিল। মধ্যবিত্ত মানুষের সন্দেহপ্রবণতা অনীশের মধ্যে প্রবলভাবে লেখক তুলে ধরেছেন।

ধীমান :

মানুষের চরিত্রে যে গভীর রহস্য থাকে তা দিব্যেন্দু পালিত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একজন মানুষ একই সঙ্গে কীভাবে উদার এবং স্বার্থপর হতে পারে, একইসঙ্গে কীভাবে ভালোবাসা এবং ঘৃণায় জর্জরিত হতে পারে— এই বৈপরীত্যকে তিনি দেখান 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসের ধীমান চরিত্রের মধ্যদিয়ে।

ধীমান পেশায় সাংবাদিক। সে খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি খবরকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে। চিকিৎসার খরচ মেটাতে না পেরে যে প্রৌঢ় দম্পতি আত্মহত্যা করে, সেই

খবরের ভেতরে কোন ডাক্তার তাদের চিকিৎসা করেছিল ভেবে ধীমান বিপন্ন বোধ করে। আবার সেই খবরটি সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি। অন্যদিকে একইদিনে টিভিস্টার নিশা দত্ত সুইসাইড করে, কিন্তু সেই খবর ধীমানদের খবরের কাগজ 'জনকণ্ঠ' মিস করেছে। অন্য কাগজটি দুটি খবরই দিয়েছে, কিন্তু টিভিস্টারের সুইমিং কস্ট্যুম পরা ছবির নিচে তার আত্মহত্যার খবরটিকেই প্রধান করে প্রৌঢ় দম্পতির আত্মহত্যার খবরটি গুরুত্বহীনভাবে ছেপেছে। এরফলে ধীমানের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। একজন সুন্দরী টেলিভিশন অভিনেত্রীর মৃত্যু সংবাদ কীভাবে প্রৌঢ় দম্পতির মৃত্যু সংবাদের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা ভাবতে গিয়ে সামাজিকতায় ধীমানের মানসিকতা আঘাত খায়।

এই ধীমানেরই একটি বিপরীত মানসিকতা ধরা পড়ে যখন তার স্ত্রী সোহিনী অপহৃত হয়। মধ্যরাতে সোহিনী অপহৃত হলে ধীমানকে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীদের কাছে মিথ্যা বলে খবরটি চেপে রেখে সোহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে হয়। থানায় গোপনীয়ভাবে ডায়েরি করলেও সোহিনীর কোনো খবর পায় না। ধীমানের সঙ্গে তার বন্ধু পত্নী শীলার সম্পর্ক আছে। শরীরের সম্পর্ক তো নিশ্চয়ই, তা পেরিয়ে আরো একটু গভীরে কোথায় হয়তো জড়িত। সোহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ধীমান তার প্রেমিকা শীলার সঙ্গে গোপনীয়ভাবে মিলিত হয় এবং শীলাকে হত্যা করতে করতে নিজেকে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করতে হয়। তীব্র অনুভূতিময়, ইন্দ্রিয়বোধে জারিত এই এরকম একটি চরিত্র অঙ্কনে লেখক নাগরিক মধ্যবিত্ত জটিলতার মানসিকতাকে ফুটিয়ে তোলেন।

২. উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র :

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যসের অপ্রধান চরিত্রগুলিও মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক। তাঁর প্রথমদিকের কয়েকটি উপন্যাসে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীর চিত্র ফুটে ওঠে। যেমন 'সিন্ধু বারোয়াঁ' উপন্যাসে সৌম্য, জয়ন্তী, বিভাস এবং মলিনা। সৌম্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র। সে বরাবর ক্লাসের ফার্স্ট বয়। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় মলিনার সঙ্গে। সবাই ভাবে তারা পরস্পরকে ভালোবাসে। কিন্তু সৌম্যর মনে মলিনার প্রতি কোনো ভালোবাসার অনুভব জন্মায়নি। দর্শন বিভাগের ছাত্রী জয়ন্তীর প্রেমকেও সে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার কাছে পড়াশুনাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাদের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে আসে অরুন্ধতী। জানতে পারে অরুন্ধতী তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ক্লাস নিচুতে পড়ে। অরুন্ধতীকে দেখে

তার মনের গভীরে ভালোবাসা জন্মায়। চেতনার গভীর স্তরে অরুন্ধতী প্রবল ঝর তোলে। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গ এলে সৌম্য কেরিয়ারিস্ট হয়ে পড়ে। অরুন্ধতীর বিয়ে হয়ে গেলেও সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে না। বরং এর থেকে মুক্তি পেতে সে পুরীতে পালিয়ে যায়। উপন্যাসে কোথাও সৌম্যর কোনো দ্বন্দ্ব নেই। যে প্রেমকে একদিন সে প্রত্যাখ্যান করেছিল সেই জয়ন্তীর প্রেমে আশ্রয় খুঁজেছে। দিব্যেন্দু পালিত এক মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষের চিত্র তুলে ধরেছেন সৌম্যর মধ্যদিয়ে।

বিভাস অরুন্ধতীর স্বামী। সাধারণ চাকরিজীবী। সে সহজ সরল। তার কাছে পৃথিবীর সব কিছুই সুন্দর। সে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের মধ্যদিয়ে প্রকৃতির মধ্যে জ্যোতির্ময় আলোর সন্ধান খুঁজেছিল। সে বিয়ে করে সুখে জীবন কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু অরুন্ধতী তা দিতে পারেনি। ক্রমশ তার জীবন হয়ে ওঠে অশান্তির, কষ্টের। তবু সে দাম্পত্যজীবনের কলহকে চাপা রেখেছিল। নিজের স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে ঘুরতে যেতে দিয়েছিল। হয়তো স্ত্রীর মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিল। কোনো সন্দেহ করেনি স্ত্রীকে। সবকিছু যখন নিঃশেষ হয়ে যায় সে নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করেছিল। উপন্যাসে কোথাও তার সঙ্গে কারো দ্বন্দ্ব বাঁধেনি। একমুখী এই চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।

সুনীল উপন্যাসের একমাত্র পরোক্ষ চরিত্র। সে বড়োলোকের ছেলে। একরোখা, জেদি, বখাটে। অরুন্ধতীর পিছনে লেগেছিল। কিন্তু না পেরে অরুন্ধতীর বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে হাত করে নিয়েছিল। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অরুন্ধতীকে দার্জিলিং নিয়ে যায় এবং সফল হয়। এরপর আর তার কথা উপন্যাসে নেই। হয়তো এরকম বহির্মুখী চরিত্র লেখক অঙ্কন করতে চাননি।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে পুরুষ চরিত্ররা প্রেমের ক্ষেত্রে কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে। 'সিন্ধু বারোয়াঁ'র সৌম্যই হোক আর 'সেদিন চৈত্রমাসে'র অমলেন্দু— কেউই তারা ঠিক মতো ভালোবাসতে পারেনি। ভালোবাসার মর্যাদা ও কর্তব্যকে সম্মান দিতে পারেনি। নারীরা সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসলেও তারা বিয়ের কথা শুনে পালিয়েছে। প্রেমিকার অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেলে তারা বিন্দুমাত্র যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়নি। বরং স্বাভাবিকভাবেই মিশেছে। 'সেদিন চৈত্রমাস'-এর নায়িকা এষার প্রেমিকা অমলেন্দু এরকমই একজন পুরুষ। বিয়ে হয়ে যাবার পরও এষা সমাজ-সংস্কার অপেক্ষা তার প্রেমে ধরা দিয়েছে। তার ভালোবাসাকে কাছে পেতে

সবকিছু ছেড়ে আশ্রয় চেয়েছিল অমলেন্দুর কাছে। কিন্তু অমলেন্দু বিয়ের কথা শুনে পালিয়ে গেছে। অসহায় এষার কথা একবারের জন্যও ভাবেনি।

এষার স্বামী মৃণালকান্তি। সে বিদেশে চাকরিরত। বিয়ে করে স্ত্রীর জেদের কারণে তাকে নিয়ে যেতে পারেনি। বাড়িতে তার বৃদ্ধা মা মরণাপন্ন হলে সে ফিরে আসে। এবং স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চায় তার কাছে। কিন্তু এষা মৃণালের সিঁদুরের অস্তিত্ব মুছে দিতে চায়। এষা ডিভোর্স চায় মৃণালের কাছে। একবছরের মধ্যে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে যেখানে মূল সমস্যা দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন, এই উপন্যাসে এষা আর মৃণালের মধ্যে দিয়ে তার সূত্রপাত ঘটে।

অঞ্জলি এই উপন্যাসের অত্যন্ত জীবন্ত চরিত্র। সে প্রচণ্ড সাহসী। স্বামী মারা যাওয়ার পর শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় না পেয়ে ভাড়া বাড়িতে আশ্রয় নেয়। একটি সন্তান হয় স্বামী মারা যাওয়ার পর। সমাজের চোখে সে ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু কাউকে পরোয়া না করে, পড়াশুনা করে স্কুলের চাকরি পায়। স্বাবলম্বী হয়ে স্বাধীন জীবন কাটায়। এষা স্বামী ও প্রেমিকের কাছে আশ্রয়হীন হলে তার কাছে আসে জীবনে বেঁচে থাকার প্রেরণা নিতে।

'প্রণয়চিহ্ন' উপন্যাসে নমিতার স্বামী মহীতোষ। উপন্যাসে তার কথা প্রত্যক্ষে নেই। কিন্তু তার সঙ্গে নমিতার বিবাহ বিচ্ছেদেই কাহিনির শুরু হয়েছে এবং কাহিনি এগিয়ে গেছে। ব্যবসার উন্নতির প্রয়োজনে সে নিজের স্ত্রীকে বন্ধুবান্ধব ও মক্কেলদের সঙ্গে অবাধে মিশতে দিয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগীয় মনোভাব তার পিছন ছাড়েনি। নারীর স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেনি। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ায় স্ত্রীকে সে সন্দেহ করেছে, গালিগালাজ করেছে, লাথি মেরেছে। উপন্যাসের শেষে তার দ্বিতীয় বিয়ের প্রসঙ্গ আছে।

মহীতোষের ভাই পরিতোষ। স্বামী পরিত্যক্ত হওয়ার পর পরিতোষই নমিতাকে সাহায্য করেছে। ফ্ল্যাট খুঁজে দেওয়া, আসবাব পত্র কিনে দেওয়া। মাঝে মাঝে তার ভালোমন্দ খবর নেওয়া। বলা যায়, পরিতোষই ছিল নমিতার একমাত্র অবলম্বন এবং সুখ-দুঃখের সঙ্গী। নমিতা পরিতোষ সম্পর্কে জানায়— 'বয়সে পরিতোষ প্রায় আমার সমান, হয়তো কিছু বড়ো। কিন্তু মানসিকতায় এখনও তেমন পোক্ত হয়নি'।

মনীশ মহীতোষের বন্ধু। উপন্যাসে তাকে ঘিরে যৌনতার প্রসঙ্গ বা অবৈধ সম্পর্কের প্রসঙ্গ এসেছে। মনীশ বিবাহিত। স্ত্রী বাড়িতে না থাকায় সে নমিতার ফ্ল্যাটে গেছে। রাত্রি যাপন করেছে। নারী-পুরুষের যে বহুগামিতার প্রসঙ্গ দিব্যেন্দু পালিত তার পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে অঙ্কন করেছেন নমিতা আর মনীশের সম্পর্কে তার সূচনা ধরা পড়ে।

দিব্যেন্দু পালিত নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উপন্যাসে কিছু অপ্রধান চরিত্র অঙ্কন করেছেন। যেগুলি মূলত সময়কে চিহ্নিত করতে লেখক উপন্যাসে এনেছেন। 'প্রণয়চিহ্ন' উপন্যাসের চন্দন কিংবা 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসের পৃথা এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। চন্দন নকশালপন্থী। তার অল্প বয়স। রক্তের প্রচণ্ড তেজ। একবার জেল খাটে। এখনো তার সাহস আর কনফিডেন্স প্রবল। সে বলে, 'আমি কি একটা কাওয়ার্ড! কী ভাবছে সবাই আমার সম্পর্কে, মারের চোটে আমি সব ভুলে গেছি! আমি এখন কনফিডেন্স খুঁজছি— আমি আবার অ্যারেস্ট হতে চাই— "[৩৮] অবশ্য তার এই রক্তের তেজ বেশিদিন থাকেনি। পুলিস-প্রশাসনের বিরুদ্ধে নকশালদের যে লড়াই, সে লড়াইয়ে পুলিসের গুলিবর্ষণের কোনো দোষ সে দেখেনি। তার কথায়— "দোষ আমাদের সমাজব্যবস্থার— সেখানে একটা ক্লাস— আর একটা ক্লাসকে ক্রমাগত শুষে যাচ্ছে। পুলিস সেই শোষণের মেশিনারি, বুর্জোয়া সিস্টেমের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র— "[৩৯] সময়ের কালপ্রবাহে চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পৃথা কিন্তু নকশাল আন্দোলনপন্থী নয়। পৃথা কলেজে পড়ে। নকশাল আন্দোলনে চতুর্দিকে পুলিসের ধরপাকড়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। প্রতিদিন খবরের কাগজে পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারানোর খবর আর ছাত্রপুলিশের সংঘর্ষ দেখে পৃথার বাবা আদিত্য রায় মেয়ের কথা ভাবে—

> "দল ভেঙে গেছে। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই নিখোঁজ। সকালে খবরের কাগজ এলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে খুন আর গ্রেপ্তারের খবরে। বুঝতে পারি, নাম খুঁজে। রাত্রে পুলিস ভ্যানের শব্দ শুনলেই শুকিয়ে ওঠে মুখ। কে বোঝাবে এই শব্দগুলো নতুন নয়— আগেও ছিল, পরেও থাকবে।"[৪০]

নকশাল আন্দোলনের ভয়াবহতায় দেশের যুবশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। উপন্যাসের শেষে পৃথার আবেগ, অনুভূতি, অভিমান প্রতিবাদ, ভয় সবকিছু একসঙ্গে ধরা পড়ে যখন তার বাবাকে মধ্যরাতে পুলিস অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে আসে— "তুমি যাবে না, বাবা। ওরা তোমাকেও

মেরে ফেলবে— "[৪১] লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পৃথার মধ্যদিয়ে বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিফলন দেখান।

'সহযোদ্ধা' উপন্যাসে আদিত্য রায়ের স্ত্রী মহাশ্বেতা। স্বামী-সন্তান নিয়ে তার সুখের সংসার। সহজসরল সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত সে। ফ্ল্যাটের অনেক ঘরেই তার যাতায়াত, অনেকের সঙ্গে তার সখ্যভাব। সে অনেকটা পেট আলগা। তাই আদিত্য খুনের ঘটনাটি স্ত্রীকে জানাতে পারেনি। গল্পের ছলে ঘটনাটি কাউকে বলে দিতে পারে। কিন্তু শেষে আদিত্য স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে যায়। খুনের ঘটনার পরিণতি বুঝতে পেরে মহাশ্বেতা স্বামীকে বলে, "তোমার হেঁয়ালি কিছুই বুঝি না। নিজে মরবে, আমাদেরও মারবে।"[৪২] মহাশ্বেতার মধ্যদিয়ে লেখক মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত সাধারণ বাঙালি স্ত্রী চরিত্রের চমৎকার প্রকাশ দেখিয়েছেন লেখক। খুবই সাধারণ মানসিকতার এই চরিত্রটি সমকালের ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে স্বামী-সন্তানদের বাঁচাতে দূরে অন্য কোথাও চলে যেতে চেয়েছে।

এইরকম পরিস্থিতিতে লেখক মধ্যবিত্ত ভীরু মানসিকতার চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন। 'সহযোদ্ধা উপন্যাসের 'স্বকাল' পত্রিকার সম্পাদক দেবু চৌধুরী এই রকম চরিত্র। সমকালীন রাজনৈতিক চাপকে সে খুব ভয় পেতো। আদিত্য রায়ের প্রতিবাদী গল্প 'প্রতিবিম্বের অন্যদিক' ছাপতে সে ভয় পেয়েছিল। সে আদিত্য রায়কে জানায়, "আমার মনে হল লেখাটার মধ্যে একটা পক্ষপাত এসে গেছে। অ্যাকুজেসন এসে গেছে। কোনও ভাবে মিসইন্টারপ্রিটেড হলে আপনাকে আমাকে নিয়ে টানাটানি হবে। ইন্‌স্টিগেটর ভাবতে পারে। সেন্টারে কংগ্রেস, এখানে প্রেসিডেন্টস্ রুল। পুলিস খেপে আছে। জানেন তো, এখন সমস্ত পলিটিক্যাল হাঙ্গামা ট্যাকল করছে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট? ওদের চোখে সবাই ক্রিমিনাল!"[৪৩]

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে স্বার্থপর অপ্রধান চরিত্র অঙ্কন করেছেন। 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের অমিয়, নিখিল ও শ্যামল— এরা তিনজন কনকের বন্ধু। কনক মারা যাবার পর তিনজনের চরিত্রগত মুখোশ খসে পড়েছে। অমিয়র স্ত্রী রেখার সঙ্গে কনকের পূর্ব সম্পর্ক থাকায় রেখা হাসপাতালে একবারও কনককে দেখতে যায়নি। ভিতরে ভিতরে রেখা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভুগছিল— রেখার এই অনুভব অমিয় বুঝতে পারে। তাই সম্ভাব্য সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে তার মনে সন্দেহ জেগেছে। এই রকম পরিস্থিতি থেকে সে মুক্তি খুঁজেছে। এই মুহূর্তে এমন কাউকেই তার মনে পড়েনি, নিজের দৈন্য নিয়ে যার ওপর সে নির্ভর করবে। অমিয়

নিরন্তর অবসেসনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। তাই আত্মহত্যার চিন্তা তাকে করতে হয়।

নিখিল অনেকটা সুবিধাবাদী, স্বার্থপর। সে দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবক। বন্ধুর বোন বুলা চাকরির জন্য তার শরণাপন্ন হলে সে অস্বস্তিবোধ করেছে। দিনের পর দিন তাকে ঘুরিয়েছে। রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটতে গিয়েও তার মনের মধ্যে দোলাচলতা দেখা দিয়েছে। বুলা বুঝতে পারে নিখিল তাকে সাহায্য করবে না। তাই তার করুণার পাত্র আর সে হতে চায় নি।

শ্যামলও স্বার্থপর। শুধু স্বার্থপর নয়, কাপুরুষও। কনকের ছোটো বোন ঝুমিকে সে ভালোবাসে। কনকের মৃত্যুর পর তাদের ভালোবাসা আরো গভীর হয়। নিত্য দারিদ্র্যের দিনে ঝুমি স্বপ্ন দেখেছিল শ্যামলের সঙ্গে ঘর বাঁধবে। তার উপর নির্ভর করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু শ্যামল তার ভালোবাসার মর্যাদা দেয়নি। শ্যামল লোভ দেখিয়ে, ভুলিয়ে ঝুমিকে সিনেমা দেখিয়েছে, হোটেলে নিয়ে গেছে, তার ভাড়াবাড়িতে নিয়ে গেছে। অবশেষে ঝুমির কৌমার্যকে নষ্ট করেছে। ঝুমি বিয়ের কথা বললে শ্যামল পালিয়ে গেছে।

কনকের মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরতে চেয়েছিল বুলা। বুলা সমকালীন সময়ের বেকারত্বের শিকার। দাদার অফিসে চাকরির জন্য গিয়েছে। ম্যানেজারকে তোষামোদ করতে পারেনি বলে চাকরি হয়নি। দাদার বন্ধু নিখিলকে চাকরির খোঁজ দিতে বললে সেও সাহায্য করেনি। সে অসহায়, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। লেখকের কথায়—

> "নিজের ভাবনার মধ্যে ক্রমশ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বুলা। সে কি খুব স্বার্থপর হয়ে পড়েছে! না হলে আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে ক্রমশ এতো নিঃসঙ্গ, নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে কেন! দাশরথি, বসুধা, ঝুমি— সকলকেই ক্রমশ অন্য মনে হচ্ছে কেন! কেন ওদের শোক-সুখ-দুখ-সমস্যায় কাতর চাপা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে কোনো জ্বালা, কোনো সহানুভূতি পায় না সে!"[৪৪]

দিব্যেন্দু পালিতের কিছু কিছু অপ্রধান চরিত্রে নীতিবোধ প্রধান হয়ে উঠেছে। 'আমরা' উপন্যাসে নয়নাংশুর স্ত্রী এবং তনুশ্রীর বৌদি সুধার মধ্যে এই নীতিবোধ প্রবল হয়ে ওঠে। তারা একসময় অনায়াসে এগিয়ে যায় প্রিয়নাথের দিকে, তারপর প্রশ্ন করে 'এটা পাপ নয় তো?' তাদের এই নীতিবোধ মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে ধাক্কা মারে। 'চরিত্র' উপন্যাসে ব্রতীনের

স্ত্রী আহামরির মধ্যদিয়ে এই নীতিবোধের অনুষঙ্গ এসেছে। ব্রতীনের অধ্যাপক বন্ধু নৃসিংহের সঙ্গে আকস্মিক আবেগতাড়িত এবং প্রস্তুতিহীন সম্পর্কের পর আহামরি প্রবল কান্নায় ফুঁপিয়ে ওঠে। নৃসিংহ আশ্বাস দেয় 'কেউ জানতে পারবে না'। কিন্তু আহামরির আহামরির জবাবদিহি তাঁর নিজের কাছে— "আমি তো জানলাম!"[৪৫]

'অহঙ্কার' উপন্যাসের জ্যোতি একজন সন্দেহ প্রবণ ব্যক্তি। কুড়ি বছরের দাম্পত্য সম্পর্ককে সে নিমেষেই ভেঙে দিতে চেয়েছে। অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় স্ত্রীকে সন্দেহ করেছে। প্রশ্ন তুলেছে সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে। 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের অমিয়ও রেখার সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। স্ত্রীর আগত সন্তানকে নিজের বলে স্বীকার করতে পারেনি জ্যোতি। ফলে বেসরকারি হাসপাতালে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে অ্যাবরশন করিয়ে আনে।

'অহঙ্কার' উপন্যাসে নীপা সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ একজন নারী। স্বামীর হাতে মার খাবার পরও স্বামীর কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। স্বামীর দেওয়া সিঁদুরকে মুছে ফেলতে পারেনি। পরপুরুষকে ভালোবাসলেও তার সঙ্গে যেতে পারেনি। তার মধ্যে অভিমান আর অহঙ্কারবোধ দেখা দিয়েছে। প্রায় কুড়ি বছর ধরে স্বামী আর প্রেমিক পুরুষের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পুঁজিবাদ সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনকে নিয়ে ব্যবসায় মেতে উঠেছিল। সেই শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করতে পারেনি। দারিদ্র্যের কারণে অসহায়, দুর্বল হয়ে পড়েছিল তারা। নিত্যদিনের সুখ-শান্তি, আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি পুঁজিবাদী শক্তির কাছে ব্যক্তিজীবনের গুরুত্ব হারিয়েছিল। 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসের রবিন সাধু খাঁ ও শীলা এই পুঁজিবাদী শক্তির প্রতিভূ। সাধু খাঁর স্টুডিয়োর ব্যবসা। খুবই ধূর্ত প্রকৃতির লোক সে। নতুন নতুন মেয়েদের ছবি তুলে সে বিজ্ঞাপন জগতে মোটা অঙ্কের টাকা ইনকাম করে। মেয়েদের ফেস দেখে বুঝতে পারে কার কদর বেশি। ছবি তোলার ব্যাপারে জিনিয়াস সে। হিমাদ্রি ও জয়া তার কাছে যায় ছবি তুলতে। জয়া নিম্নবিত্ত সাধারণ ঘরের স্ত্রী। অসাধু ব্যবসায়ী রবিন সাধু খাঁ গোপনে হিমাদ্রি আর জয়ার সই করিয়ে নেয় ন্যুড অ্যালবামের ছবি তোলার জন্য। হিমাদ্রির অনুপস্থিতিতে জয়াকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে সাধু খাঁ।

শীলাও খুবই চালাক মেয়ে। ব্যবসার প্রয়োজনে সে জয়াকে প্ররোচনা দিয়েছে। ন্যুড অ্যালবামের ছবি দেখিয়ে জয়ার মন ভোলাতে চেয়েছে। টাকার লোভ দেখিয়েছে। জয়া এতে রাজি না হলে শীলা ধৈর্য হারায়নি, বরং নরম হয়ে বলেছে—

> "আপনাকে নেকেড হতে বলছি না। ব্রা পরবেন না, ব্রেস্টের খানিকটা সাজেশান পেলেই চলবে। তা ছাড়া— ; এটা তো অ্যাডভার্টাইজমেন্টে ব্যবহার করা হবে না। কেউ জানতেও পারবে না। বিসাইড্স, আমরা আপনার বিউটিটাকেই তুলে ধরব।"[৪৬]

তারপর জয়ার নেকেড ছবি বের হয়। সাধু খাঁ আর শীলার বিভিন্ন ক্লায়েন্ট জয়ার সঙ্গে কথা বলতে চায়। দরদাম ঠিক করতে চায়। জয়া আর হিমাদ্রির দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যায়। শেষ পর্যন্ত জয়াকে আত্মহত্যা করতে হয়। পুঁজিবাদ সাধারণ মানুষকে কতোটা অসহায় করে তুলেছিল তা লেখক এই দুটি চরিত্রের মধ্যদিয়ে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দিব্যেন্দু পালিত 'সোনালী জীবন' উপন্যাসে একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারের বিভিন্ন চরিত্রের নিপুণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারটির বাসস্থান কলকাতায়। পরিবারটির কর্তা আর্থার পাইবাস। তার বয়স আশি বছর। তার স্ত্রী ডরোথি। তিন মেয়ে— রোজালিন, অড্রি, লরা এবং একমাত্র পুত্র রবিন। পুত্রবধূ সারা, সারা আর রবিনের পুত্র স্যামুয়েল। সারা এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। সে বাঙালি মেয়ে। লেখক চরিত্রগুলিকে কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেক্ষাপটে অঙ্কন করেছেন। আর্থার পাইবাস পেশাগতভাবে সৈনিক ছিল। বার্মা মুলুকে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে এখন সে অবসর জীবন যাপন করছে। তার পেনসনের টাকায় গোটা পরিবারটি চলে। আর্থারের স্ত্রী ডরোথি পরিবারের কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তাদের বাড়িতে পুলিসের লোক এসে রবিনকে খুঁজলে সারা বাইরে বের হয়। ডরোথি ছিল রক্ষণশীল। পুরুষ মানুষের সামনে বাড়ির মেয়ে বের হবে এটা সে মেনে নিতে পারেনি। তাই ডরোথি সারাকে বলেছিল, 'ওরা রবিনকে খুঁজতে এসেছিল। তোমাকে নয়!' রবিন হাওড়ার জুটমিলে কাজ করে। কিন্তু ইউনিয়নের লোকজনের সঙ্গে বচসা হওয়ায় তার চাকর চলে যায়। একমাত্র উপার্জনশীল ছেলের চাকরি চলে গেলে পরিবারের মধ্যে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। রবিন ছিল গোঁয়ার, রগচটা, খ্যাপাটে। জেল থেকে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে দেখতে না পেলে সে খেপে ওঠে। সারা ফিরলে বোধবুদ্ধিহীন, উত্তেজিত রবিন তাকে প্রহার করে। এছাড়াও আছে আর্থারের বড়ো মেয়ে

রোজালিন ও তার স্বামী মাইকেল এবং তাদের ছেলেমেয়ে ডোনাল্ড আর ডেইজি। আর্থার পাইবাসের মেজ মেয়ে অড্রির বিয়ে হয় কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তার স্বামী অলোক দত্ত। বিয়ের পর সে তার নাম পরিবর্তন করে রাখে অর্পিতা। লেখক অড্রির মধ্যদিয়ে দেখান বাঙালি সংস্কৃতিকে। একদা যে মেয়ে জিন্স আর স্কার্ট পরতো, এখন সে শাড়ি, ব্লাউজ এবং সিঁথিতে সিঁদুর দেয়।

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে ওয়ার্কিং গার্লদের ছবি তুলে ধরেছেন। 'মধ্যরাত' এবং 'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসে প্রধান চরিত্রদের পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়ার্কিং গার্লদের জীবন চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই অপ্রধান চরিত্ররা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর ও স্বাধীন। 'মধ্যরাত উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তপতীর পাশাপাশি মেসবাড়ির বিভিন্ন মেয়েরা সাবিত্রী, বিনা, বাসন্তী, রত্না অঞ্জলি নীলা— এরা প্রত্যেকেই সরকারি কিংবা বেসরকারি চাকরি করে। সাবিত্রীর পেশা নার্সিং, সে মেসবাড়ির অন্যান্য মেয়েদের একটু আলাদা স্বভাবের। সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না, তার আচরণ বা গতিবিধি কেউ ধরতে পারেনি। এক প্রকারের মানসিক রোগে ভুগতে থাকে সে। বিনা কুটির শিল্পের দোকানে কাজ করে। মেসের সবার থেকে বয়সে বড়ো বাসন্তী। সে বিধবা। বিয়ের তিন বছর পরে তার একটি ছেলে হয়। ছেলেকে বাপের বাড়িতে রেখে সে মেসে এসে থাকে। অতীতস্মৃতি সবসময় তাকে ঘিরে ধরে। তার এই কাহিনি মেসের অন্যান্য মেয়েদের সে প্রায়ই শোনাত। অভিভাবকহীন রত্নার জীবনে দাদা ছাড়া আর কেউ নেই। সে তার বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। তার প্রাক্তন প্রেমিক বিশ্বনাথ তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। মেয়েদের বিয়ে হওয়াটা তার কাছে ছিল ভাগ্যের ব্যাপার। মেসবাড়ির সবথেকে বিদ্রোহী চরিত্র রিণা। মুখ বুঝে সে কোনো কথা সহ্য করতে পারে না। সে হাসিতে খুশিতে উচ্ছল স্বভাবের মেয়ে। ভদ্রতা আর আন্তরিকতায় সহজসরল মেয়ের চরিত্র নীলা। অশোকের সঙ্গে তার বিয়ে। এই সব মেয়েদের থেকে লেখক সবচেয়ে বেশি জীবন্তরূপে অঙ্কন করেছেন অঞ্জলি চরিত্রটিকে। অঞ্জলি কম বয়সি মেয়ে। চাপা স্বভাবের, প্রেম করত লুকিয়ে। আবেগের বশে প্রেমিক সুনন্দর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। অঞ্জলি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে বিয়ে করার ভয়ে সুনন্দ পালিয়ে যায়। উপন্যাসের শেষে গর্ভপাত করাতে গিয়ে অঞ্জলির মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুতে অন্যান্য চরিত্ররা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসেও লেখক মেসবাড়ির ওয়ার্কিং মেয়েদের ছবি তুলে ধরেছেন। 'মধ্যরাত' উপন্যাসের থেকে এই উপন্যাসের মেয়েরা অনেক বেশি পরিণত ও মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত। আসলে লেখক এই সময় পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষ। পরিণত বয়সের মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দিব্যেন্দু পালিত এই উপন্যাসে মেয়েদের চরিত্রের বিভিন্ন ডাইমেনসনকে তুলে ধরেছেন। মেয়েরা স্বনির্ভর এবং স্বাধীন হলেও আর্থিক বিনিশ্চয়তা তাদের মানসিক তৃপ্তির পরিপূরক হতে পারেনি, তাই তারা খুঁজেছে নিজস্ব সঙ্গ, নিজস্ব কোনো আশ্রয়। প্রাবন্ধিক শ্রাবণী পাল এই সব মেয়েদের সম্পর্কে বলেছেন—

> "প্রত্যাশা প্রাপ্তিতে মেলে না প্রায়শ, এ কথা প্রাপ্ত বয়স্ক পরিণতমনস্ক তাদের অজানা নয়, তবু বোধহয় স্বপ্নেরই ভিতর চলতে থাকে তাদের আশা-হতাশা, বেদনা-বঞ্চনার এক শব্দহীন এবং সম্ভবত, অন্তহীন খেলা— স্মৃতি ফিরে আসে স্বপ্নে, সাহচর্য ভুলিয়ে শঙ্কা, নারীত্বের অহঙ্কার কখনোবা জায়গা ছেড়ে দেয় নারীত্বের অসহায়তাকে।"[৪৭]

'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিশাখা ও অর্পিতা ছাড়া অপ্রধান চরিত্রগুলি হলো— ছন্দা, নিবেদিতা, সুলেখা, মমতাদি, শুক্লা, রমা প্রভৃতি। এরা সবাই ওয়ার্কিং উইমেনস্ রেসিডেনসিয়ায়ল হোমে বাস করে। সবাই চাকরিজীবী। ছন্দা মার্কেট রিসার্চ অর্গানাইজেশনের হয়ে ডোর-টু-ডোর স্যাম্পল সার্ভে কাজ করে। জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকতে পরবর্তীতে সে যৌনতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। নিবেদিতা ডিভোর্সি, স্টুয়ার্ট মর্গান অফিসের রিসেপশনিস্টের কাজ করে। শুক্লা দেমাকি, ধৈর্য কম, অল্পতেই রেগে ওঠে। রত্না ফুড কর্পোরেশনের কাজ করতো। সুবর্ণা স্কুলে চাকরি করে। বয়স কম, কিন্তু মিশুকে। বিশাখা তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলে— "বর্ধমানের মেয়ে, বি-এ পাশ করার পর বাবা মারা যায়, বাধ্য হয়েই নিয়েছে চাকরিটা। এর মধ্যে বি-টি পাশ করেছে। এখান থেকে টাকা পাঠায় মা-কে।"[৪৮] মমতাদি বয়স্কা ও বিবাহিতা, চুপচাপ মানুষ। চাকরি করে কর্পোরেশনে। রমার বয়স চল্লিশ, কালো, পেটানো স্বাস্থ্য, আঁটোসাঁটো চেহারা। হাবড়ায় হেলথ ভিজিটরের চাকরি করে। বয়সে প্রৌঢ় সুলেখাও ভদ্ররুচির। সে নার্সের কাজ করে। উপন্যাসের শেষে তার নামে মিথ্যা রটনা ওঠে, সে নাকি মেয়েদের বেশ্যাপল্লীতে নিয়ে যাওয়ার করে। সুলেখা বলে, "পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেল। আঠারোয় বিধবা হয়েছি, তারপর কাজ শিখে নার্স হলাম। এই সাত্তাশ আঠ্ঠাস বছরে কত প্রলোভন! কোনও পুরুষকে ঘেষতে দিই নাই কাছে। আমার তো

জীবন নাই! আছে ক? শরীরটা আছে। সেটা খেতে চায়, এই কাজ না করলে খাব কী! আমি তো লেখা পোড়া শিখি নাই!”[৪৯] ভয়ঙ্কর অপমানে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল সুলেখা।

অপ্রধান চরিত্রচিত্রণে বিশিষ্টতা দেখা যায় ‘ভোরের আড়াল’ উপন্যাসে। উপন্যাসটি বস্তিজীবনকেন্দ্রিক। দিব্যেন্দু পালিত এখানে মধ্যবিত্ত চরিত্রচিত্রণের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমা থেকে সরে এসেছেন। এই উপন্যাসে বস্তিজীবনের গায়ে গায়ে লেগে থাকা জলধর, সরস্বতী, মৌসুমি, সন্ধ্যা, মৃদুলা, গীতা, শ্রীধর, গোপাল প্রমুখদের নিত্য-দিনের অভাব-অনটনের চিত্র ফুটে উঠেছে। মৃদুলার স্বামী সুদর্শন ট্রাক ড্রাইভার। দিল্লী, বোম্বাই, পাটনা, রাঁচি প্রভৃতি এলাকায় মাল বোঝাই ট্রাক নিয়ে সে পাড়ি দেয়। হঠাৎ একদিন সে নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর সংসারের অভাব-অনটন মেটাতে তাঁর তিন মেয়ে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়। বড়ো মেয়ে সন্ধ্যা দেহোপজীবী হয়ে পড়ে, ফ্ল্যাটবাড়ির বাবুদের সেবায় তাকে দিনরাত নার্সবৃত্তি করতে হয়। অপর দুই মেয়ে মালতী ও করবী বাড়িতে বসে ঠোঙা বানায়, রাস্তার ধারের মুদির দোকানে বিক্রি করে। আর মৃদুলা রেল লাইনের ধারের ঘাটাল থেকে ঝুড়ি ভর্তি গোবর এনে সরকারি দেওয়ালে ঘুঁটে দেয়।

সুতরাং দিব্যেন্দু পালিতের চরিত্রচিত্রণে পরিশীলিত ব্যবহার পাঠককে মুগ্ধ করে। চরিত্রকে একেবারে ভিতর থেকে তিনি উপলব্ধি করে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। নিখুঁত বর্ণনার মধ্যদিয়ে পাঠককে সন্ধান দেন সেই সমস্ত বিচিত্র চরিত্রের, যার অতলতলে স্তরে স্তরে লুকিয়ে রয়েছে অসংখ্য রত্ন। চরিত্রের উৎকর্ষতা ও বৈচিত্র্যের অভিনব স্বাদ কখনোই অতিরঞ্জিত দোষে দুষ্ট হয়নি।

তথ্যসূত্র :

১. পালিত, দিব্যেন্দু : সেদিন চৈত্রমাস, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৩২

২. তদেব : পৃ. ১৫৬

৩. তদেব : পৃ. ১৭০

৪. তদেব : পৃ. ১৭৫

৫. পালিত, দিব্যেন্দু : সেদিন চৈত্রমাস, বসু চৌধুরী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১, পৃ. ৬২

৬. পালিত, দিব্যেন্দু : মধ্যরাত, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৭৫

৭. তদেব : পৃ. ৩৫৬

৮. পালিত, দিব্যেন্দু : প্রণয়চিহ্ন, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৬০

৯. তদেব : পৃ. ৩৭৯

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩৫০

১১. পালিত, দিব্যেন্দু : স্বপ্নের ভিতর, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৩৭৭

১২. তদেব : পৃ. ৩৮১

১৩. তদেব : পৃ. ৩৮২

১৪. তদেব : পৃ. ৪৪৫

১৫. তদেব : পৃ. ৪৪৬

১৬. পালিত, দিব্যেন্দু : সোনালী জীবন, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ২৩১

১৭. পালিত, দিব্যেন্দু : সংঘাত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৭৪

১৮. তদেব, : পৃ. ১২৬

১৯. পালিত, দিব্যেন্দু : ওঠা কিংবা নামা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ১০৬

২০. তদেব : পৃ. ১২৪

২১. তদেব : পৃ. ১৪৩

২২. পালিত, দিব্যেন্দু : সন্ধিক্ষণ, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৫

২৩. তদেব : পৃ. ৪১

২৪. তদেব : পৃ. ৬৩

২৫. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছুস্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ৯৪

২৬. পালিত, দিব্যেন্দু : বিনিদ্র, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৩০২

২৭. পালিত, দিব্যেন্দু : চরিত্র, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৩৪৭

২৮. তদেব : পৃ. ৩৪৭

২৯. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : পঞ্চাশের দশকের কথাকার, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ৩০৫

৩০. পালিত, দিব্যেন্দু : বৃষ্টির পরে, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৮৭

৩১. পালিত, দিব্যেন্দু : সহযোদ্ধা, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৫১

৩২. তদেব : পৃ. ৫৩

৩৩. তদেব : পৃ. ৬৯

৩৪. পালিত, দিব্যেন্দু : অন্তর্ধান, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৫১২

৩৫. তদেব : পৃ. ৫৪৯

৩৬. তদেব : পৃ. ৫২০

৩৭. তদেব : পৃ. ৫১৮

৩৮. পালিত, দিব্যেন্দু : প্রণয়চিহ্ন, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৪২২

৩৯. তদেব : পৃ. ৪৪২

৪০. পালিত, দিব্যেন্দু : সহযোদ্ধা, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৫৩

৪১. তদেব : পৃ. ৬৯

৪২. তদেব : পৃ. ৬৮

৪৩. তদেব : পৃ. ৫০

৪৪. পালিত, দিব্যেন্দু : সন্ধিক্ষণ, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৬২

৪৫. পালিত, দিব্যেন্দু : চরিত্র, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৩৭৬

৪৬. পালিত, দিব্যেন্দু : ঘরবাড়ি, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ১৩২

৪৭. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : পঞ্চাশের দশকের কথাকার, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ৩১৩

৪৮. পালিত, দিব্যেন্দু : স্বপ্নের ভিতর, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৩৮৮

৪৯. তদেব : পৃ. ৪৩৪

চতুর্থ অধ্যায়

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের প্রকৃতি

'বিজ্ঞান মানুষের মনের ভিতরে ঢুকতে পারেনি; ফ্রয়েড-ইয়ুংরাও পারেনি। অন্তত পুরোপুরি।'— 'হঠাৎ একদিন' (২০০০) উপন্যাসের সূচনায় দিব্যেন্দু পালিত একথা বলেছেন। সত্যি নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা এবং সেই সম্পর্ককে ঘিরে নারী-পুরুষের মনোজগতের বিচিত্র দিক সবসময় কোনো তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফ্রয়েড, ইয়ুং, মার্ক্স, অ্যাডলার, এরিখ ফ্রম, জাঁক লাকা প্রমুখের চিন্তাধারায় নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব সবসময় একভাবে ধরা পড়েনি। আরো গভীরে কোথায় যেন ফাঁক থেকেই যায়। এই মনোজগতের চেতনাপ্রবাহের উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন গুস্তাভ ফ্লবেয়ার, ফিওদর দস্তয়েভস্কি, লিও টলস্টয়, হেনরি জেমস, ভার্জিনিয়া উলফ্, ডি. এইচ. লরেন্স, জেমস জয়েস, ভ্লাদিমির নবোকভ প্রমুখরা। বাংলা সাহিত্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, গোপাল হালদার, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে নরনারীর সম্পর্ক এবং তাদের মনোবিশ্লেষণে নিত্য নতুন ভাবনা নিয়ে আসেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতাসম্পন্ন নরনারীর জীবনপ্যাটার্নের বিচিত্র আবেগ ও অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। আবেগের সঙ্গে অনুভব ও ইচ্ছার সম্বন্ধসূত্রে মন সক্রিয় হয়। আর সেই সক্রিয় চেতনার অবলম্বন হচ্ছে দেহ। মানুষের মনোদৈহিক তাড়নার অবদমন দীর্ঘতর হলে জন্ম নেয় মানসিক ব্যাধি। মানুষের মনোজগতের বিকলন, বহুমাত্রিক বিচ্ছিন্নতা, বিচিত্র টানাপোড়েন, অস্তিত্বের সংগ্রাম সবকিছুই ভিন্নমাত্রায় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উঠে এসেছে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে। যতোই আধুনিকতার ছাপ ছাড়িয়ে অত্যাধুনিক হয়ে উঠেছে মানুষ ততোই তার ভিতরে জন্ম নিচ্ছে অতৃপ্তি আর অপ্রাপ্তির ক্লেদ। সংবেদনশীল মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত, হারিয়ে ফেলছে প্রিয়জনের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ সহানুভূতি। ফলে মানুষ হয়ে পড়েছে আত্মমুখী, নিঃসঙ্গ। এই চলমান অস্থির সময়ে নারী-পুরুষ বিভিন্ন বিকারের মধ্যে প্রবেশ করছে। হতাশা কাটিয়ে উঠতে না পেরে কেউ কেউ আত্মবিনাশের পথও খুঁজে নিয়েছে। অর্থাৎ এক ধরনের

আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার নিগূঢ় মনোবিকলন এই সময়ে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে ফুটে ওঠে।

দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ'য় মনস্তাত্ত্বিক সংকটের বীজ উপ্ত হয়েছে অরুন্ধতীকে ঘিরে। প্রেমিক পুরুষ সৌম্যর সঙ্গে বিয়ে না হওয়ায় সে কিছুটা অভিমানী আর আত্মমুখী হয়ে পড়েছে। যার ফলে বিভাসের সঙ্গে তার দাম্পত্যসম্পর্ক সুখের হয়নি। পাড়ার বখাটে যুবক সুনীলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। এই আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে উপন্যাসের শেষে ডাক্তার মিত্র অরুন্ধতীর রোগের রিপোর্টে বলেন—

> "— ট্রাবল্‌টা সেন্ট পার্সেন্ট মেন্টাল।...বলতে পারেন, নিউরোসিস। পরস্পর বিরোধী কোনো আঘাতে বা মন-বিরোধী কোনো একটি ঘটনায় এইরকম হওয়া সম্ভব। মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে তখন নিজেকে নিজেই আঘাত করতে চায়। আঘাতের পদ্ধতিও হয় অত্যন্ত স্থূল।"[১]

একদিকে সৌম্যকে না পাওয়ায় তার ইচ্ছার অবদমন, অন্যদিকে সুনীলকে পছন্দ না করলেও তার সঙ্গে জোর করে মেলামেশা— এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে অরুন্ধতী। সৌম্যকে না পাওয়ায় তার ক্ষোভ, অপূর্ণতা সবই তার নিজের যন্ত্রণাকে বাড়িয়েছে।

অরুন্ধতীকে ঘিরে সৌম্য আর বিভাসের মধ্যে কিছুটা মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে। বিয়ের পরেও সুনীলের সঙ্গে অরুন্ধতীর মেলামেশা মেনে নিতে পারেনি বিভাস। কিন্তু কোনোদিন প্রকাশ্যে বাধাও দিতে পারেনি। এক ধরনের বিষের জ্বালায় পুড়ে পুড়ে একেবারে শেষ হয়ে গেছে সে। তাদের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তার মনে এক ধরনের অশান্তি আসে—

> "সেই ঘৃণাটাকে অবলম্বন করেই ও ক্রমশ নিজের যন্ত্রণা বাড়িয়ে চলছে! দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমি তা সহ্য করেছি, এখনও করছি। এই জ্বালার জগৎ থেকে পালাতে পারলে আমি বাঁচতাম।"[২]

তীব্র এক অস্বস্তিতে ছটফট করে সৌম্যও। জ্বালা করে চোখদুটো। তার নিজেরই কথায়—

> "চোখ ভরা এই যে জ্বালা, সেটা শুধু একটা আত্মধিক্কার। অরুন্ধতীর কথা মনে পড়লে রাগ হয় না; সুনীলের ওপরেও বিন্দুমাত্র আক্রোশ জাগে না। রাগ হয় শুধু নিজের ওপর। নিজেরই বুকের ভেতর ফুটে ওঠা একটা সুন্দর ভালোবাসাকে অসম্মান করে শুধু অরুন্ধতীই নয়; বিভাসের জীবনটাকেও যে বিষময় করে তুলেছে সে!"[৩]

'সেদিন চৈত্রমাস' উপন্যাসে দুই পুরুষের মাঝে অবস্থানরত একজন নারীর মানসিক সত্তার উন্মোচন ঘটিয়েছেন লেখক। অল্প বয়সে বিয়ে যাওয়া এষা বেশি বয়সের স্বামীকে মেনে নিতে পারেনি। বিবাহিত জীবনে সে সুখ পায়নি। বিয়ের প্রথমরাতে স্বামীর সঙ্গ ভালো লাগেনি তার। সে সুখ অমলেন্দুর কাছে নেয়—

> "সেদিন স্পর্শে শরীর সাড়া দেয়নি, জ্বালায় জ্বলেছে। আজকের অনুভূতি অন্য। অমল আজ জ্বালিয়ে দিল; এবং সেই তীব্র উত্তাপে জ্বলে নিজেকে নিঃশেষ করতে করতে এষার মনে হয়েছিল, সে যেন শরীরের সীমায় পৌঁছে গেছে; পুরুষের স্পর্শে এত স্বস্তি, সে জানত না; যে এতদিনে তার শরীর সার্থক হল।"[৪]

তাই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী অমলেন্দুর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু অমলেন্দু ভালোবাসলেও আশ্রয় দিতে পারেনি। অপরদিকে তার স্বামী মৃণালকান্তি আশ্রয় দিতে পারে কিন্তু ভালোবাসতে পারে না। এই অবস্থায় এষার কাছে তার নারীধর্ম বড়ো হয়ে উঠেছে। সে কারো কাছেই আবদ্ধ থাকতে চায়নি। তাই একসময় স্বামী ও প্রেমিককে ছেড়ে একার জীবন বেছে নিয়েছে সে।

> "মন বলে একটা বস্তু আছে, ...সে আমার, আমার, আমারই নিজস্ব, তাকে আমি অন্যের মুঠোয় তুলে দিতে পারি না। আমি আমার সর্বস্ব দেব, কিন্তু আমার শূন্যতা যে ভরে দেবে, সে কোথায়?"[৫]

মনোধর্মে মানুষ ইচ্ছা করে, যে ইচ্ছা পূরণ করতে পারলে খুশি হয়, তার সবটা না হলেও কিছু কিছু ফলে যায়। 'ভেবেছিলাম' উপন্যাসে কথকের এরকমই ইচ্ছার কথা বলেছেন লেখক। ছোটোবেলায় কথক সাঁতার কাটতে পারতো না। জলে তার খুব ভয় ছিল।

তার বাল্যবন্ধু সুধাংশু একবার তাকে মাঝ নদীতে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। ডুবে যেতে যেতে কোনোরকমে দম নিয়ে তীরে ফিরে আসে। ভরাডুবির ঘটনার পরও অনেকদিন পর্যন্ত মৃত্যুর আশঙ্কা কথকের মন থেকে দূর হয়নি। নদীর দিকে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল। কথকের ধারনা হয়েছিল, নিতান্ত কৌতুকের জন্য সুধাংশু তাকে মাঝ-নদীতে নিয়ে যায়নি। যে কারণেই হোক সুধাংশুর আক্রোশ ছিল তার উপর এবং সুযোগ পেলেই তাকে হত্যা করবে। এইভাবে মৃত্যুর আশঙ্কা ক্রমশ মুহ্যমান করে ফেলেছিল তাকে। রাত্রে দুঃস্বপ্নও দেখে, সুধাংশু বা সুধাংশুর মতো কেউ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো, আবিষ্ট করতো, টেনে নিয়ে যেত জলের মধ্যে এবং ডোবানোর চেষ্টা করতো। এইসময় অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করতো কথক। এখানে কথক ফোবিয়ায় ভুগেছিল। ফোবিয়া সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন—

> "ফোবিয়া একরকমের নিউরোসিস। এই রোগে দেখা যায়, রোগীরা যখন কোনো বিশেষ অবস্থায় পড়ে, তখনি ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে— যদিও ওই অবস্থা বা বস্তুর মধ্যে বাস্তবিক ভয়াবহতা কিছুই থাকে না। এই সঙ্গে আরও দেখা যায় যে, এই ধরনের রোগীরা সবসময়েই চেষ্টা করে ওই অবস্থায় না পড়ার, অথবা এইসব বস্তুর মুখোমুখি না হওয়ার। যদি ওই অবস্থায় পড়ে যায় তাহলে— কিভাবে সেখান থেকে পালাবে তার পথ খোঁজে।"[৬]

আতঙ্কে, ঘৃণায়, ক্রোধে কথকের অবচেতন মন চেয়েছিল, যে কোনো প্রকারে সুধাংশুর মৃত্যু হোক। দশ-বারো বছর পর টিবি রোগে সুধাংশুর মৃত্যু হয়। তখন হঠাৎ কথকের মনে হয়, সুধাংশুর মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী। এক ধরনের অপরাধবোধের চিন্তায় সে অভিভূত হয়ে পড়ে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে এমন কতকগুলি চরিত্র আছে যারা অহেতুক সন্দেহ করে। এরা নিজেদের আত্মীয়, বন্ধু অথবা সহকর্মীদের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। স্বামী বা স্ত্রী চরিত্রে সন্দেহ করে দাম্পত্য জীবনকে বিষিয়ে তোলে। অতি তুচ্ছ কারণে অপমানিতবোধ করে। কেউ এদের অপমান করলে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে মনে হলে এরা সে কথা ভুলে যেতে পারে না, প্রতিশোধের সুযোগ খোঁজে। এরা কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না, বিশ্বাস করে কাউকে কোনো কথা বলে না। এরা নিরর্থক ঝগড়াঝাঁটি করতে অতিশয়

অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অন্যের দোষ দেখতে নিদারুণ ব্যগ্র হলেও নিজেদের বিরূপ সমালোচনা বরদাস্ত করতে পারে না একেবারেই। নিজেদের প্রাধান্য যেখানে নেই, সেখানে তারা থাকতে চায় না। মনোবিজ্ঞানে একে প্যারানয়েড পারসোনালিটি বা সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিত্বের বিকার বলে। এইরকম ব্যক্তিত্বের বিকার দিব্যেন্দু পালিতের 'প্রণয়চিহ্ন' উপন্যাসের মহীতোষের মধ্যে দেখা যায়। মহীতোষ তার ব্যবসার সুবিধার জন্য স্ত্রীকে মক্কেল ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিজেই ঘনিষ্ঠ হতে বলেছিল। কিন্তু এর মধ্যে যে মানসিক ঔদার্য, তা কোনোকিছুই তার মধ্যে ছিল না। কোনো কারণ ছাড়াই পরবর্তীতে সে স্ত্রীকে সন্দেহ করেছে। এষার কাকার বন্ধু পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গেও জড়িয়ে এষাকে সন্দেহ করেছে মহীতোষ। আসলে সন্দেহ মহীতোষকে অন্ধ করে দিয়েছিল। সন্দেহের বশেই মহীতোষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে—

> "খুন আমি তোমাকে করব। তোমার যত প্রেমিক আছে সকলের সামনে খুন করব। একটা নষ্ট মেয়েমানুষকে কী করে ট্রিট করতে হয় আমি জানি।"[৭]

তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক আর টিকেনি। মহীতোষ এষাকে ডিভোর্স দেয় এবং সে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। অপরদিকে এষার মনোবিশ্লেষণ নির্মাণে লেখক কাহিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। দিব্যেন্দু পালিত পুরুষ অপেক্ষা নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করতেন। নারীর মনকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এষার আর কেউ ছিল না। ডিভোর্স তাকে এক ধরনের মুক্তি দিলেও নিজেকে নিয়ে চিন্তায় ক্লান্তি ছাড়া আর কিছু পায়নি। যতো ভেবেছে ততোই তীব্র হয়ে উঠেছে তার মানসিক অবসাদ। এর একটি কারণ সে একাকীত্বে ভুগে। একসময় আত্মহত্যার কথাও ভাবতে হয় তাকে, কিন্তু এষা বাঁচতে চায়। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়। তাই এষা বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে মিশেছে। শেখর, মনীশ, পরিতোষ তার প্রেমিক পুরুষ হয়ে ওঠে। তারাই তার সুখদুঃখের সঙ্গী, একাকীত্ব কাটানোর বন্ধু। কিন্তু কামনা-বাসনার অবদমিত ইচ্ছাকে এষা কোনোদিনই ভুলতে পারেনি। তাই খুব সহজেই এষা শেখর কিংবা মনীশের সঙ্গে শরীরী খেলায় মেতে উঠেছে। আর নিজের দেবর পরিতোষকে একসময় সম্পর্কের বন্ধনে ছোটো মনে হলেও এখন তাকেই অবচেতন মনে প্রেমিক পুরুষ ভাবতে থাকে।

> "বুঝি পরিতোষের সহানুভূতি এখন আমার ভেতর পর্যন্ত ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করছে, মেঝে নিকানোর মতো এখন ও আমার সমস্ত গ্লানি শুষে নিতে চায়। এ সেই

পরিতোষ, যাকে আমি কখনও পুরুষ বলে ভাবতে পারলাম না, যুবক বলে ভাবতে পারলাম না; আমার ভেতর থেকে উঠে-আসা বিকল্প সত্তার মতো যে ক্রমাগত ছায়া বিস্তার করে যাচ্ছে আমার ওপর! এই মুহূর্তে ওর সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল আমার। বড়ো অল্প আয়োজন নিয়ে আসো তুমি, পরিতোষ, এত বড়ো অন্ধকার কি মোমবাতির আলো দিয়ে আড়াল করা যায়! বরং নির্দয় হয় তোমার দাদার মতো, বরং তুমি দুর্ব্যবহার করো, যে-কোনো পুরুষের মতো আকাঙ্ক্ষা করো আমাকে, ডুবে যাও আমার চরিত্রহীনতার সমুদ্রে। আমি কিছু ভাববো না। বরং সম্পর্কের এই আকস্মিক পরিবর্তনই আমার স্বাভাবিক মনে হবে। আর কিছু নয়, তোমার প্রতি দুর্বলতাটুকু আমি কাটিয়ে উঠতে চাই— যে-কোনো রকমের সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্যে তোমার এই পরিবর্তিত ভূমিকাটুকু আমার দরকার।"[৮]

সে কি বেঁচে আছে ঠিকঠাক? লেখক জানান—

"সম্পর্কের পারস্পরিক উত্তাপে প্রাণবন্ত হয়েও মানুষ কেঁপে উঠছে আকস্মিক বিচ্ছেদের শীতে, নিঃসঙ্গতা ত্রাণ খুঁজছে যৌনতায়, বৈধ-অবৈধের সূক্ষ্ম ভেদাভেদের ওপর দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষায় বিলীন হচ্ছে মানুষ, ধরতে পারছে না ঠিক কোনটা পাপ কোনটা পুণ্য— তখন নিঃশব্দ ও নিরুপায় কান্নায় ফাঁপিয়ে তুলছে রক্ত ও শিরা। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি নিয়তিক্লিষ্ট এই তার ভূমিকা, নির্ভরতাহীন; বুঝতে পারে না জৈবিক ও আধ্যাত্মিকের মধ্যে দূরত্ব কতখানি— স্মৃতি, দুঃখ ও অপমান নিয়ে বহুর মধ্যে মিশে সে শুধু হেঁটে যাচ্ছে একা-একা।"[৯]

'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসে চেতন-অচেতন মিলেমিশে ঘটে চলে প্রগাঢ় এক স্ট্রিম অব কনশাসনেস। উপন্যাসের শুরুতে কনকের মৃত্যুকে ঘিরে দাশরথি, অমিয়, শ্যামল, নিখিল, রেখা, বুলা, ঝুমি— প্রত্যেকটি চরিত্রের বিচিত্র ভাবনার স্রোতকে লেখক তুলে ধরেছেন। কনকের মৃত্যুর দিনে অমিয় বলেছে 'জেগে থাকার ইচ্ছেটাই ঘুমোতে দিচ্ছে না'। ঘুমের মধ্যেও স্বপ্নে জাগরণ থাকে। নিখিল স্বপ্নেই পেরিয়ে যায় অনেকটা পথ। স্বপ্নে বর্ণিল রঙের রূপবদল চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে নিখুঁতভাবে চিনিয়ে দেয়। সিনেমা হলে ঢুকে ঝুমির চোখের পাতা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে আসে। "তখন স্বাভাবিক হলদে রং ক্রমশ নীলাভ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পর্দায়, চোখের পলকেই আবার লালের আভা। ঠিক লালও হয়তো নয়— যাকে

ক্রিমসন বলে, অনেকটা তাই, রঙের ওঠাপড়া দেখে মনে হয় জলের নিচ দিয়ে তীব্র বাতাস ছুটে চলেছে। ওরই মধ্যে ঘুমন্ত মেয়েটির অস্পষ্ট মুখ ভেসে উঠে হারিয়ে গেল আবার— দুটো তেজী ঘোড়ার পা— ক্রমাগত রঙ বদলের আড়ালে পা দুটি অদৃশ্য হতেই আরেকটি দৃশ্য : অস্ফুট স্তনের ওপর সোনালী অশ্বাক্ষুর ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে..."[১০] এখানে জড়িয়ে থাকে যৌনতা ও শরীরী চেতনা।

'সন্ধিক্ষণ' অশান্ত অস্থির নাগরিক ব্যক্তিদের অসহায়তা ও বিপন্নতার ছবি। ইয়ুং যাকে বলেছেন— "the yearing for rest that arises in a period of unrest."[১১] সেইজন্য চরিত্রগুলি অবিরাম পথ হাঁটে। বাস্তবের চড়া আলোয় নয়, অন্ধকারে সেই পথহাঁটা। তার সঙ্গে চলে চেতনাপ্রবাহ। এ হাঁটা শুধু রাস্তায় হাঁটা নয়, মনের সরণী, স্মৃতির সড়কও পেরিয়ে যাওয়া। "রাস্তাটা বড়ো দীর্ঘ মনে হয় অমিয়র। ক্লান্তিতে পা আর চলে না। অথচ মানুষজন চলে, চলে শব্দ, ট্রাফিক সঙ্কেতে মাছের ঝাঁকের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি গাড়ির ঝাঁক, আবার চলতে শুরু করে— ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটর-চলার কোনো বিরাম নেই।"[১২]

অমিয় এক অজানা জগতে নিয়ে যায় পাঠককে। যেখানে এক রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে হয়। অচেনা অলিগলি অরণ্যে পথ পরিক্রমা করার মতো। বাড়ি ফিরে চৌবাচ্চার জলে অনেকক্ষণ স্নান করে অমিয়। স্নায়ুময় অবসাদ আসে। স্ত্রীর নিঃশ্বাসের মতো "অসংখ্য অদৃশ্য পোকা এই সময় অমিয়র বুক বেয়ে হাঁটাচলা শুরু করে দেয়।"[১৩] হঠাৎ মনে হয় 'টাইমপিস্‌টা তার বুকের ওপর কেউ চেপে ধরেছে'। নিখিলের ক্ষেত্রেও বুলার সঙ্গে তার সম্পর্কে মৃদু ঘুম এবং পুরনো অবসাদের প্রসঙ্গ আছে।

'সম্পর্ক' উপন্যাসের রামতনুরও রাতে ঘুম আসে না। রীতিমতো অবসন্নবোধ করে সে। অপরাধবোধ তার সমস্ত মন জুড়ে বসে। বড়ো ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রামতনু কাজপাগল মানুষ। তার কাছে পরিবারের জন্য নৈতিক দায়িত্বটুকুও পালনের অবসর ছিল না। মেয়ের সঙ্গে স্টেশনে যাবার কথা ছিল। কিন্তু কথা দিয়েও যেতে পারেনি। সে ভুলে যায়। এরপর শুরু হয় তার দ্বিতীয় সত্তার আলোড়ন—

"নিজের ওপর এক ধরনের বিরক্তি দেখা দিল, আত্মধিক্কারে ক্ষুব্ধ বোধ করলেন তিনি। যা ঘটল, কোনো কৈফিয়ত দিয়েই তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। অন্যের কথা বাদ দিলেও নিজের কাছে কোন কৈফিয়ত দেবেন তিনি।"[১৪]

এই সূক্ষ্ম অপরাধবোধ থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি রামতনু। তাই একসময় স্ত্রীর অপমান আর নিজের অবসাদের ভারে আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করতে হয় তাকে। সবকিছু গোলমাল হয়ে যায় তার। তিনি প্রকৃতিস্থ নেই, স্থান-কাল-পাত্র হারিয়ে ফেলেছেন। দেহের অস্বাচ্ছন্দ্যের মতোই ক্লেশকর তার এই মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য। লেখক তার মনের অবস্থা সম্পর্কের বলেন, রাতকানা পাখির মতো চিন্তাটা তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যাচ্ছে, শবদাহ সেরে শ্মশান থেকে ফেরার পথে যেমন হঠাৎই পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে' তেমনি মানুষটির ধ্বস্ত বিবেক।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্ররা জটিল এবং বিশাল বিশ্বের নানা প্রশ্নের মায়াবী বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। 'আমরা' উপন্যাসের কথক প্রিয়নাথ মজুমদার এরকমই বিষণ্নতায় বা ডিপ্রেশনে ভোগে। কোনোকিছুতে ভালো লাগে না তার। তার মনে আনন্দ-ফুর্তির অভাব। সবসময়েই অকারণ দুঃখের ভার, হীনমন্যতা, হতাশা, নৈরাশ্যবাদিতা, ভগ্নোৎসাহ, আত্মবিশ্বাসের একান্ত অভাব তার মধ্যে দেখা দেয়। কোনোকিছুতেই তার আগ্রহ নেই— প্রিয়জনের সঙ্গে আলাপ-গল্পগুজব করা, সিনেমা, টিভি, রাজনীতি কিছুতেই তার সুখ নেই। কথাবার্তা, চলাফেরায়, সাজপোশাকে, মুখের ভাবভঙ্গীতে তার মনে অসুখী ভাবের প্রকাশ পায়। সর্বত্রই অনুভব করে মননাবিহিন, আবেগবিহীন, বেদনাবিহীন এক অসাড়তা। সে তার অসাড় মন নিয়ে আত্মগত মনোবৃত্তে ঘুরপাক খায়। কোনো সিদ্ধান্ত সে নিতে পারে না। তনুশ্রী নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। তনুশ্রীও তাকে ভালোবাসে গভীরভাবে। কিন্তু ভালোবাসার মধ্যেও তার মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয় না। তার নিজেরই স্বগতোক্তিতে বোঝা যায়—

"মাঝে মাঝে প্রকৃতই গুলিয়ে যায় সব কিছু, তখন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসা কী? তখন, তনুশ্রীর গা থেকে বেরনো ঘামে ও পাউডারের সঙ্গে গুলিয়ে ওঠে নিঃশ্বাস; কোনো রকমে নিজেকে সংবরণ স্বরে জিজ্ঞেস করে, প্রিয়নাথ, এর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী? কিংবা অমলাদির সঙ্গে? সুধার সঙ্গে? নয়নাংশুর সঙ্গে? ভয়

হয়, বড়ো ভয় লাগে, এসব প্রশ্ন থেকে পেরিয়ে আসার জন্যে প্রাণপণ হাঁটতে শুরু করি আমি, দ্রুত ও অবিন্যস্তভাবে।"[১৫]

'একা' উপন্যাসে স্বপ্ন-জাগর অবস্থায় শিশিরের অবচেতন মনকে দিব্যেন্দু পালিত অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। শ্রীলা, সুষি, পাকড়াশি প্রভৃতি অনেকেই তার স্মৃতিপথে যাতায়াত করে। অতীত এসে বর্তমানে মিলে যেতে থাকে। লেওন ইডেল তাঁর 'The Modern Psychological Novel' গ্রন্থের দশতম অধ্যায় 'Novel as Poem' প্রবন্ধে এক ধরনের 'পোয়েটিক ইমেজ'-এর কথা বলেছেন। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে তারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শিশির তার নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে সমস্তকিছু চিনে নিতে চায়। এইভাবে "ক্রমশ সাবলীল হয়ে ওঠে পৃথিবী আর এক পৃথিবীতে— সমস্ত হাওয়া এসে ক্রমশ ছুঁয়ে যায় তাকে, মাংস থেকে ক্রমশ আলাদা হতে থাকে হাড়, ধূপের গন্ধময় আচ্ছনতা এমনকি বেলার রোদ্দুরেও চুপিসারে ডেকে আনে গভীর মধ্যরাত।"[১৬]

স্মৃতি মাঝে মাঝে শিকড় ধরে টান দেয় শিশিরের। শব্দের মধ্যে হারিয়ে যায় শব্দ, একান্তে নিজের হাটা-চলার শব্দ সোচ্চার হয়ে ওঠে কানে। নিজেই সম্মোহিত হয়ে বিড়বিড় করে বলে ওঠে, "শিশির, আছি। অপেক্ষায় আছি। — শুধু বুঝতে পারছি, আমার দিনমান আটকে যাচ্ছে স্মৃতির খেলায়; শুধু দেখতে পাচ্ছি, চেনাশোনা শব্দগুলো থেকে শীতের পাখির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে অর্থ; নতুন তাৎপর্য নিয়ে ফিরতে আসছে তারা।"[১৭] এরকম দিবাস্বপ্ন শিশিরের অবচেতন মনকেও চিনিয়ে দেয়।

আবার 'ইনসমনিয়া'য় ভুগে শিশির। নির্বান্ধব শিশির ক্রমশ একা হতে থাকে। স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু একটা অস্বস্তি, একটা আড়ালের যন্ত্রণা এসে সবকিছু এলোমেলো করে দেয় তার। তখন স্মৃতি বিজড়িত বিস্মৃতির দিকে ক্রমাগত একা হাঁটতে থাকে সে। "মাথার ভিতর ফেঁপে আঠা হয়ে যাচ্ছে শিরাগুলো। সেখানে ঘুম। কিন্তু দু'হাতে চুলের মধ্যে বিশৃঙ্খল আঙ্গুলগুলো ঠেলতে ঠেলতে শিশির হাই তুলল, কিন্তু সে ঘুমোবে না।"[১৮]

লেওন এডেল তাঁর 'The Modern Psychological Novel' গ্রন্থে যে 'Mental Prattle'-এর কথা বলেছেন, 'উড়োচিঠি' উপন্যাসে চন্দনার 'মাথার ভিতর হঠাৎ দড়ির খেলা' সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। ভাবনা তাকে অনেকদূর টেনে নিয়ে যায়। পাঁচবোনের ছোটো

হয়ে তাকে শুধু অপেক্ষা করেই যেতে হয়। তার 'মাথা ঘোরে; শরীরে অন্ধকারের এই চমকটা ঠিক সহ্য করতে পারে না সে। দ্রুত ঘেমে ওঠে হাতের চেটো। অনেক সময় সামলে নেয়, যখন পারে না তখন তারপর কি হয় বুঝতে পারার আগেই আবার ফিরে যায় অন্ধকারে।...এই বয়সে নাকি অনেক মেয়েরই হয়, বিয়ে হলে ঠিক হয়ে যায়।"[১৯] এই যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি হিস্টিরিয়া রোগের কারণ। আবার টুপুর ভেতরে 'ঢেউ তোলা নদীর মতো কি একটা বয়ে যায়'। ''এই মুহূর্তে মনের সমস্ত দ্বিধা নিয়ে পৃথিবীর আলো হাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে এক রকম ঐশ্বর্য; বহুদূর ব্যাপ্ত উজ্জ্বলতার মধ্যে টুপুর দেখতে পায় তার বিভিন্ন রঙ খামখেয়ালি অনুভূতি হয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তার লুকানো শরীর ও শরীরের ভিতর তালাবন্ধ ছোট ছোট ঘরগুলোকে।"[২০] এ তার মগ্নচৈতন্যের 'স্ট্রিম অব কনশাসনেস'-এরই অনিবার্য ইঙ্গিত। তার ইচ্ছে করে চেতন মনের পলকা অবরোধ সম্পূর্ণ অবারিত করে যে যেমনভাবে যা ইচ্ছে করুক তাকে নিয়ে। প্রায় সুখকর এক অজানা অনুভূতির মধ্যে নিজেকে চিনে নিতে থাকে। তার ইচ্ছে করে এই সুখ চিরস্থায়ী হোক। এটা টুপুর মধ্যে ফ্রয়েড কথিত অদস্-এর প্রভাব।

'অবৈধ' উপন্যাসে যৌনতা খুব ঋজু এবং বলিষ্ঠ। 'চরিত্র' উপন্যাসে আহামরি আর নৃসিংহর যৌন কামনায় যে পাপ ধরা পড়ে, 'অবৈধ' উপন্যাসে পার্থ আর জিনার সক্রিয় কামনায় পাপের ছোঁয়াটুকুও নেই। মানসিকতার দিক থেকে দুজনেই সংস্কারমুক্ত দুই নরনারী। গুঢ়ৈষাকে অবদমনে পৌরুষ নেই কোনো। পুরীর হোটেলে অন্ধকার যেন উৎসাহ দিয়েছে পার্থ আর জিনাকে। অন্ধকারে নিজের শরীরের ঘ্রাণ মিশিয়ে দেয় পার্থর শরীরে। 'নিজের নিরাবরণ সর্বাঙ্গে পার্থর শরীরের আদ্যন্ত পৌরুষ জড়িয়ে, আর্ত স্তনদ্বয়ে পার্থর বুকের পেশি ও রোমরাজির কোমল স্পর্শ অনুভব করতে করতে, পার্থর নিঃশ্বাসের প্রতিটি উত্থান-পতন নিজের নিঃশ্বাসে মিশিয়ে নিতে নিতে' ঘুমিয়ে পড়ে জিনা।[২১] দিব্যেন্দু পালিতের এই বর্ণনায় অশ্লীলতার রেশমাত্র নেই। কারণ, এ তো শুধু শরীরী আকর্ষণ নয়। জিনা স্পষ্ট অনুভব করে 'কী যে সন্তর্পণে ঘোরাফেরা করছে তলপেটের অন্ধকার অভ্যন্তরে, এতকালের অনাদরে ম্লান একটির পর একটি কোষ ভরে উঠছে নতুন সম্ভাবনায়'।[২২] আদিরসের খেলা এই উপন্যাসে সৃষ্টির দ্যোতনা বহন করে আনে। এখানেই দিব্যেন্দু পালিত সার্থক শিল্পী।

ফ্রয়েডের অনেক পরে জাক লাকাঁ মানবমনস্তত্ত্বকে শুধু অবদমনে খোঁজার কথা বলেননি। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের বিভিন্ন শাখায় মানবমনস্তত্ত্বকে খোঁজার চেষ্টা

করছেন। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে এই বিষয়টি দেখা যায়। 'অনুভব' উপন্যাসের আত্রেয়ীকে কলকাতার ইউনেস্কোর প্রোজেক্টে কাজ করতে আসার মাধ্যমে চিনে নেওয়া যায়। আবার 'মৌনমুখর' উপন্যাসে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের মাধ্যমে তড়িৎকে, 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ' উপন্যাসে চরিত্রদের চেনা যায় বিজ্ঞাপন জগতের প্রসঙ্গকে সামনে রেখে। আবার এক ধরনের 'ইমাজেনারি ফরমেশন' থেকে চিনে নেওয়া যায় 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসের আদিত্য রায়কেও। জাক লাকাঁ "Beyond the reality principle' গ্রন্থে 'Object of psychology' প্রসঙ্গে বলেছেন, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে চরিত্র ধরা পড়ে "with all his desires, imaginary formations, language and meaning."[২৩]

মনোবিজ্ঞানীদের (বিশেষতঃ ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানীদের) মতে উৎকণ্ঠা মানসিক দ্বন্দ্বের লক্ষণ। কোনো কারণে নির্জ্ঞান মনের অবদমিত অবাঞ্ছিত বাসনাগুলি যখন সজ্ঞান মন বা চেতনায় আসার উপক্রম করে, তখনই মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এবং সে দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ হচ্ছে এই উৎকণ্ঠা।[২৪] এই অবদমিত কামনা বা ইচ্ছাগুলির সাধারণ প্রকৃতি হচ্ছে, হয় তারা ধ্বংসাত্মক-হিংসাত্মক বৃত্তিমূলক অথবা যৌনবৃত্তিমূলক। এই দুটি বৃত্তিকে আয়ত্তে রাখাই হচ্ছে সভ্যতার প্রধান অবদান। এই জন্যই এই ধরনের মানসিক ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছানুসারে হয় না, আমাদের অজ্ঞাতেই ঘটে। এই অবদমনের কাজ নানা কারণে সব মানুষের ক্ষেত্রে সবসময়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে চার রকমভাবে এই উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়—

১. বিবেকের দংশন, পাপবোধ, অন্যায়-অপরাধজনিত উৎকণ্ঠা।

২. শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি, অঙ্গহানি— এই সব নিয়ে উৎকণ্ঠা।

৩. প্রিয়জন বিচ্ছেদের আশঙ্কার ফলে উৎকণ্ঠা।

৪. নিজের সংযম হারিয়ে ফেলার জন্য যে উৎকণ্ঠা।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে বিবেকের দংশন, পাপবোধ, অন্যায় অপরাধজনিত উৎকণ্ঠা এবং নিজের সংযম হারিয়ে ফেলার জন্য যে উৎকণ্ঠা তারই প্রতিফলন দেখা যায়। অ্যাংজাইটি নিউরোসিসেরও প্রকাশ ঘটে। যেমন, 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের দাশরথির বিবেকের দংশনের ফলে সৃষ্টি হয় উৎকণ্ঠা, 'সম্পর্ক' উপন্যাসে রামতনুর, 'সোনালী জীবন' উপন্যাসের সারার পাপবোধ, 'একা' উপন্যাসের শিশিরের মনে হয়েছিল সে তার স্ত্রীর প্রতি অন্যায়-

অপরাধ করেছিল। এই ধরনের মানসিক ক্রিয়া ইচ্ছানুসারে হয় না, অজ্ঞাতেই ঘটে যায়। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্ররা এই উৎকণ্ঠাকে কখনোই অবদমন বা রিপ্রেসন করতে পারেনি। তাই তো সারাকে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে হয়। 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসের জয়াকে ছাদ থেকে লাফাতে হয়, 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসে ধীমান স্ত্রীকে হারানোর পর এক ধরনের অপরাধবোধ থেকে শ্রীলাকে গলা টিপে হত্যা করেছিল এবং শেষে নিজেও আত্মহত্যা করে। 'অচেনা আবেগ' উপন্যাসে জয়দীপ বরের বেশে আত্মহত্যা করেছিল। আত্মহত্যা করে সে প্রেমিকা শমিতাকে বোঝাতে চেয়েছিল তার ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না।

'সোনালী জীবন' উপন্যাসে বড়বাবুর কাছে বলাৎকার হয় সারা। এরপর লেখক বিভিন্ন প্রতীকী ইঙ্গিতে সারার মনকে বুঝিয়েছেন। 'উনুনের গনগনে আঁচে ঝলসানো শিক কাবারের গন্ধে ভারী হয়ে ওঠা হাওয়ায় নিঃশ্বাস' নিতে হয় সারাকে। ''অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত ভৌতিক চাঁদের আলোয় কফিনের ভিতর শুয়ে থাকা মানুষের মুখের মতো দেখাচ্ছিল ওর মুখ।''[২৫] ট্রামের ঘণ্টা, রিক্সার ঠুন ঠুন শব্দ তার মনকে বিষিয়ে তুলেছিল। বাড়ি ফিরে আবার স্বামীর রগচটা মেজাজে আর অপমানে নিজেকে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল সারা। নারীমনের এমন অসহায়তার চিত্র দিব্যেন্দু পালিত আর অন্য কোনো উপন্যাসে তুলে ধরেননি। এই উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটাতে লেখক উপন্যাসের শিরোনামও দিয়েছেন 'স্মৃতির দিকে', 'আর্থারের স্বপ্ন দেখা', 'ভালোবাসায় প্রত্যাবর্তন', 'অন্ধকার বারান্দা', 'এ কেমন ভালোবাসা' ইত্যাদি। নারীপ্রধান এই উপন্যাসে নারীর অবচেতন মনকে জোর দিতে একাকীত্ব-নিঃসঙ্গতার মোটিফ এনেছেন লেখক, ''সম্ভবত প্রত্যেক মানুষেরই মনের ভিতর একটা জায়গা থাকে— সেখানেই তৈরী হয়ে যায় তার নিজস্ব ঘরবাড়ি কিংবা ধ্বংসের আকৃতি।''[২৬] শেষ পর্যন্ত সারাকে আত্মহত্যা করতে হয়।

'অনুভব' উপন্যাসে ইতিহাসবোধ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের অবিরাম আনাগোনা চলতে থাকে। চলতে থাকে আত্রেয়ীর আত্মবিশ্লেষণ। এড্ওয়ার্ড দুজারদিন কথিত 'ইন্টারনাল মনোলোগে'র প্রকাশও ঘটে। রাহুলের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর কলকাতায় ফিরে একমুখী নানা চিন্তা আত্রেয়ীকে ঘিরে ধরে। নিজেকে নিয়ে ভাবনার টানাপোড়েনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। সন্দেহ, হতাশা ও অনিশ্চয়তা থেকে এক ধরনের বিষণ্ণতা এসেছে।

"তখন মনে হয় একান্তে নিজেকে নিয়ে থাকাই ভালো। এক একদিন এমনও হয় যখন ঝলমলে দিনদুপুরেও ঝপ করে নেমে আসে অন্ধকার। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ঝাপসা লাগে চারদিক, জলজ গন্ধে ভারী হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস।"[২৭]

যতোদিন গেছে ততোই সে একা হয়ে পড়েছে। যতোই সে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করুক, হতাশা তার পিছু ছাড়েনি। হতাশা ক্রমশ বাড়তে থাকে। হঠাৎ ইচ্ছা থেকে পুরনো অ্যালবামের ছবি দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। নিজের মনে প্রশ্ন ওঠে, সে নিজেই সবার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এর জবাব খুঁজতে গিয়ে নিজেই দ্বিধাবোধ করে। রাহুলের অপমান তাকে আত্মমুখী করে তুলেছিল। 'এই যে দেড় বছর নিজের মন ও শরীরটাকে গচ্ছিত রেখেছিল রাহুলের কাছে, সম্পর্কটা স্বাভাবিক ভেবেই যথেচ্ছ হতে দিয়েছিল তাকে, এই ব্যাপারগুলো কি তাহলে যেমন ছিল তেমনই রেখেছে!"[২৮] অপমানের এই দিকটা সে কোনোদিনই ভুলতে পারেনি। স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে চলে এসেছিল কলকাতায়। সে এখন মুক্ত। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। বাঁচতে চায় নিজের মতো করে। স্বাবলম্বী হতে চাকরির দরখাস্ত করে। স্বনির্ভরতার এই জোরটাই তাকে টিকিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু দাদার বন্ধু উৎপলের সঙ্গে মেলামেশা করার সময়ও সে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল। অথচ উৎপলই তার শুভাকাঙ্ক্ষী। আসলে 'সে দাঁড়িয়ে আছে এক অন্ধকার সমুদ্রের সামনে, যেখানে শুধুই ঢেউ আর ঢেউ আর ঢেউ ছাড়া কিছুই নেই, চারপাশের শব্দ ও নৈঃশব্দ্য মিলতে পারছে না নির্দিষ্ট কোনও বিন্দুতে।"[২৯] রক্তের সম্পর্কেও আড়ষ্টতা ঢুকে পড়েছে। অতীত স্মৃতি থেকে মুক্তি নেই তার। কোনোদিকে এগোবার বদলে ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছে নিজেরই ভিতরে। নিজের তৈরী রক্তের মধ্যে একা হতে থাকে সে। আত্রেয়ীর বিষণ্ণ মনকে বোঝাতে লেখক বৃষ্টি, নৈশব্দ, মেঘ, অন্ধকার ইত্যাদির প্রতীক বা প্রসঙ্গও এনেছেন। আসলে 'অনুভব' একটি নারীর অন্তর্বেদনার উপাখ্যান।

দুই পূর্ণবয়স্ক নারীপুরুষের জটিল মনোদৈহিক সম্পর্ককে 'মাত্র কয়েকদিন' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লেখক। স্বামী মারা যাবার পর অদিতি একা হয়ে যায়। ছেলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ে করে আলাদা হয়ে যায়। সেই একাকীত্ব আরো বেড়ে যায়। বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে অদিতি। একাকীত্ব কাটাতে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে স্বামী বন্ধু প্রিয়ব্রতর শরণাপন্ন হয়। আকর্ষণ বাড়তে থাকে। একসময় দেহমনের আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে। কামের তাড়নায়

(লিবিডো) ছুটে যায় প্রিয়ব্রতর ফ্ল্যাটে। শরীরের সমস্ত কিছু উজাড় করে দেয়। প্রিয়ব্রতও ফিরিয়ে দেয়নি।

> "বাহান্ন বছর বয়সেও তার শরীর, স্বাস্থ্য, নিজেকে উজ্জীবিত করার ক্ষমতা এতটুকু টাল খায়নি। নিজের সমগ্র পৌরুষ নিয়ে সেদিন রাত্রে সে যখন অদিতির শরীরে প্রবেশ করে এবং আবেগ থেকে সম্পূর্ণ শরীরী হয়ে উঠে তার কাঁধে দাঁতের দাগ বসাতে বসাতে অস্ফুট অভিমানে কিছু বলতে থাকে অদিতি, তখনও, সেই কথাগুলো না শুনে নিজেকে পরিতৃপ্ত করার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে। যেন অদিতি নয়, তার সামনে সম্ভোগের জন্যে পড়ে আছে মাংসময় এক টগবগে নারী শরীর, যে কোনও নাম হতে পারে তার— বস্তুত কিছুই এসে যায় না নাম বা পরিচয়ে।"[৩০]

অল্প বয়সে বিধবা অদিতি আর বিবাহ না করা প্রিয়ব্রতর মধ্যে কামনা-বাসনার অবদমিত ইচ্ছা এতদিনে পূর্ণ হয়। কিন্তু পরের দিন সকালে অদিতির মনের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আসে। অদিতি সবকিছু উজাড় করে দিতে চেয়েছিল, দিয়েওছে। কিন্তু এইটুকু হওয়ার জন্য সে আসেনি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া অদিতি চেয়েছিল একটা আশ্রয়, একটা অবলম্বন। যা প্রিয়ব্রত দিতে পারেনি। তাই রাতের অন্ধকারে যে সুখ অনুভব করে ভোরের আলোয় তা ভেঙে যায়।

শুধুমাত্র পারস্পরিক আকর্ষণেই দুই পূর্ণ বয়স্ক নরনারীর অবৈধ সম্পর্কের গোপন রহস্য উন্মোচন করেছেন লেখক 'হঠাৎ একদিন' উপন্যাসে। বহুগামিতা এবং বিবাহোত্তর অবৈধ সম্পর্কের পর নারীপুরুষের জটিল মানসিকতার সৃষ্টি হয়। নায়গ্রা জলপ্রপাতের অতি সুন্দর পটভূমিতে আকস্মিক দেখা হয় শ্রীজিৎ ও অনুজার। সেই পরিচয় তাদের এমনি এক শারীরিক আকর্ষণের বন্ধনে জড়িয়ে ফেলে কলকাতায় এসেও চলতে থাকে তাদের উদ্দাম লুকোচুরি খেলা। তাদের আকর্ষণে কোনো আবেগ বা ভালোবাসা নেই, সবটাই শরীরের আকর্ষণ। এই আদিম প্রবৃত্তি বা লিবিডোর তাড়নায় দুজনের মধ্যে দেখা দিয়েছে এক ধরনের পাপবোধ। অনুজা তার স্বামী, সন্তানদের ঠকাতে চায়নি। তাদের ছেড়ে আসতেও পারেনি। এতো কিছু হবার পরও আনন্দই তাকে বেশি ভালোবাসে। তাই উপন্যাসের শেষে অনুজা নিজের অনুতাপ, অনুশোচনায় আনন্দর বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে—

"সমস্তই শুধু একজনের সঙ্গে শরীর খেলার জন্যে— যে-খেলার অতীত ছিল না কোনও, যে-খেলার ভবিষ্যৎও নেই। শুধু নিজের জন্যে নয়, আনন্দকে প্রতারণা করার জন্যে তখন কীভাবে সারা শরীর ভেঙে কান্না জমা হয়েছিল চোখে! আর, তখনই মনে হয়েছিল, এই বৃষ্টি, এই অভিজ্ঞতা হয়তো কোনও সংকেত পাঠাচ্ছে তার কাছে— ইঙ্গিত দিচ্ছে নিষেধের, যা হয়েছে হয়ে গেছে, এবার ফেরো। অর্থহীনতার পিছনে এইভাবে ছুটে কোন সর্বনাশ ডেকে আনছ তুমি!"[৩১]

ফটোগ্রাফার শ্রীজিৎও তার স্ত্রী বিপাশাকে থকাতে পারেনি। অসুস্থ বিপাশার যৌন ক্ষমতা হারিয়ে গেছে। ফলে তেইশ-চব্বিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে সুখ পায়নি শ্রীজিৎ। সিনেমা সাংবাদিক আনন্দকমলের স্ত্রী অনুজার প্রতি তার আকর্ষণ ভালোবাসায় নয়, শরীরী হয়ে উঠে। সেই শারীরিক আকর্ষণে তৃপ্তি অনুভব করলেও অসুস্থ স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়। এর ফলে তার অবচেতন মনে এক ধরনের হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়। শ্রীজিতের মধ্যে একটা লাগামছাড়া জীবন ছিল বটে। কিন্তু সেই লাগামছাড়া জীবনে অনুজা আর সঙ্গ দিতে পারেনি। আনন্দকে প্রতারণা করার জন্য তার সারা শরীর ভেঙে কান্না জমা হয়েছিল চোখে। অপরদিকে শ্রীজিতের মানসিকতার তীব্র পরিবর্তন ঘটিয়েছেন লেখক। শ্রীজিতের বন্ধু শুভঙ্কর সেরিব্রাল অ্যাটাকে হাসপাতালে ভর্তি হলে বাস্তবের মাটিতে নেমে আসে শ্রীজিৎ। অসুস্থতার পরিবেশে বিপাশার কথা চিন্তা করতে করতে শ্রীজিতের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে।

ইয়ুং মনে করেন, ব্যক্তির অতীত জীবনে বা শৈশবে নয় বর্তমানেই নিউরোসিসের কারণ নিহিত। আর শুধু বাসনার অতৃপ্তিই রোগের কারণ নয়। জীবনসংগ্রামে পরাজয়ই তার কারণ। ব্যক্তি সর্বদাই বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার চেষ্টা করছে। বাস্তবের বিভিন্ন সমস্যা তাকে সমাধান করতে হচ্ছে। কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধান যদি তার সামর্থ্যে না কুলোয় তখন তার লিবিডো বাস্তব থেকে সরে ব্যক্তির শৈশবাবস্থায় প্রত্যাবৃত্তি করে। ফলে ব্যক্তি বাস্তবের সম্মুখে এলোমেলো নানা আচরণ করতে থাকে। এমনি অবস্থায় নিউরোসিস দেখা দেয়। ইয়ুং বলেছেন—

"Therefore I no longer final the cause of a neorosis in the past, but in the present. I ask, what is the necessary task which the patient will not accomplish?"[৩২]

বাস্তবের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীনই দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে নিউরোসিস বা উদ্বায়ু রোগে ভুগিয়েছে। রামতনু, দাশরথি, অনীশ, রজত, আদিত্য, এষা, তপতী, শিশির, প্রিয়ব্রত, আত্রেয়ী প্রমুখ চরিত্রের সমস্যা বর্তমানের জীবনসংগ্রামের সমস্যা। অতীতের কোনো সমস্যা নয়। কামনা-বাসনার অতৃপ্তিও তাদের মধ্যে বড়ো নয়। আবার ইয়ুং এও বলেন, বাস্তব সমস্যাই নিউরোসিসের একমাত্র কারণ নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণেও এ রোগ হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যৌন ইচ্ছার বিশৃঙ্খলার দরুনও হতে পারে। চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যেও যে নিউরোসিস দেখা দেয়, তাদের কারণ হিসাবে তিনি বলেন, বাস্তব সমস্যা, অতৃপ্ত যৌন ইচ্ছা বা অস্বাভাবিক ক্ষমতাস্পৃহা বর্তমান থাকে। চল্লিশের পর তা আর থাকে না। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তিরও যৌন আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে। 'হঠাৎ একদিন' উপন্যাসের শ্রীজিতের বয়স একান্ন-বাহান্ন। এই বয়সেও সে বিবাহিত নারী অনুজার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। 'মাত্র কয়েকদিন' উপন্যাসে বাহান্ন বছর বয়সী প্রিয়ব্রতও কামের তাড়নায় স্থির থাকতে পারেনি। বারবার বন্ধুর স্ত্রী অদিতির কথা মনে পড়েছে। একবার দেহ মিলন হবার পরও চলতে থাকে তাদের গোপন মেলামেশা। আসলে আমাদের মধ্যে যে অনুভূতি রয়েছে তা অতিক্রম করে পূর্ণতালাভের প্রয়োজন হয়ে ওঠে। ইয়ুং এর মতে—

"The symtoms of neurosis are not simply the effects of long past causes, whether infantile sexuality or the infantile urge to power, they are also attempts at a new synthesis of life— unsuccessful attempts let it be added— yet attempts nevertheless, with a core of value and meaning."[৩৩]

স্বপ্নের মধ্যে গোপনীয়তার স্থান— ফ্রয়েডের এই মতকে ইয়ুং মেনে নেননি। স্বপ্নে ফ্রয়েড যে নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞানের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন, ইয়ুং সে দ্বন্দ্বও অস্বীকার করেছেন। তাঁর

মতে, স্বপ্নে নির্জ্ঞান যেন সংজ্ঞানের সহায়তা করে। নীতিবিরোধী ইচ্ছার প্রকাশই যে স্বপ্নের বিষয়বস্তু একথাও অস্বীকার করেন। সেই কারণেই শুধু অতীতকে আশ্রয় করেই স্বপ্ন রচিত হয় তাও মেনে নেননি। তিনি বলেন, অতীতকে নিয়ে স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের লক্ষ্য বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। জীবনে নব নব সমস্যার সমাধান চাই। জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত মানুষ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়ার জন্যে সংজ্ঞানে নানা চিন্তা করে। নির্জ্ঞান সংজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে ঐ বিষয়ে সাধ্যমতো থাকবে। তাই স্বপ্নের মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যা-সমাধানমূলক নানা ইঙ্গিত দেখা দেয়। ইয়ুং বলেছেন—

> "The activity of the consciousness, speaking logically represents the psychological effort which the individual makes in adapting himself to the conditions of life. His consciousness endeavours to adjust itself to the necessities of to moment, or, to put it differently: there are the tasks ahead of the individual, which he must overcome. Now we have no reasons for assuming that the unconscious follows other laws than those which apply to conscious thought. The unconscious, like the conscious, gathers itself about the biological problems and endearous to find solutions for these by analogy with what has gone before, just as much as the conscious does."[৩৪]

স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্জ্ঞানের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যক্তিত্বকে চালনা করলে জীবনে শুভ ফল পাওয়া যায়। অনেক সময় স্বপ্নে আসন্ন বিপদের কথাও জানতে পারা যায়। স্বপ্নে উচ্চারিত এই সতর্কবাণীকে গ্রহণ করলে অবশ্যম্ভাবী সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণও পাওয়া যায়। তবে জীবনের সমস্যামূলক নির্দেশই স্বপ্নের একমাত্র বিষয়বস্তু নয়। অবদমিত ইচ্ছাও স্বপ্নে দেখা দিতে পারে—

> "It is certainly true that there are dreams which embody suppressed wishes and fears, but what is there which the dreams can not on occasion embody ? Dreams may give expression to ineluctable truths, to philosophical pronouncement, illusions, wild fantasies, memories,

plans, anticipations, irrataional experiences, even telepathic vissions and heaven knows what besides."[৩৫]

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে শিশু মনস্তত্ত্বও উঠে এসেছে। তাদের মনস্তত্ত্ব দেখা দিয়েছে যখন বাবা-মার দাম্পত্যজীবনে বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে। বাবা-মার বিচ্ছেদের কথা ভেবে তাদের মনে দেখা দিয়েছে বিষণ্ণতা। 'সেকেন্ড হনিমুন', 'যখন বৃষ্টি', 'বহুদূর অভিমান' উপন্যাসে এই শিশু মনস্তত্ত্ব আলোচনা করা যেতে পারে। 'সেকেণ্ড হনিমুন' উপন্যাসে শিলাজিৎ আর শ্রেয়ার বিচ্ছেদ যখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, তখন তাদের ছেলে পূষন হোস্টেল থেকে বাড়ি ফিরে আসে। শিলাজিৎ রাত্রে সুপর্ণাকে চরম অপমান আর নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করলে পূষণ স্থির থাকতে পারেনি। তার মাথায় রক্তচাপ বাড়ে। মিনের কাজ করা দুটো ফুলদানির একটা আছড়ে ভাঙে। সুপর্ণা ঘরে ঢুকে বুঝতে পারে পূষন কী বলতে চায়? তার চোখের দৃষ্টি দেখে সুপর্ণা বুঝতে পারে পূষণ কি ভাবছে? তারপর পূষনের আর ঘুম হয়নি। এক অস্থির সময়ের সম্মুখীন হয় সে। বাবা-মার সম্পর্কের অবনতি তার শিশু মনে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে।

'যখন বৃষ্টি' উপন্যাসে পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে রিয়াও হোস্টেলে থাকে। বাবা-মার বিচ্ছেদের কথা সে জানে না। তাকে না বলেই তার বাবা-মা আলাদা জায়গায় বাস করতে থাকে। কেবল নিয়ম করে সপ্তাহে এক দুই দিন তাকে দেখতে যায়। হোস্টেলে যখন রিয়া একা অনুভব করে তখন বাড়িতে ফোন করে বাবা-মা কাউকে পায়নি। রাত্রে আবার বাবাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে। রিয়া খুব সেনসিটিভ মেয়ে। সারারাত ঘুমোয়নি তারপর। কাউকে কিছু বলতেও পারেনি। একাকীত্ব অনুভব করে রিয়া। পরের দিন সকালে ফ্ল্যাটে গিয়েও বাবা-মা কাউকে পায়নি। মামার বাড়ি গিয়ে কাঁদতে থাকে। রিয়া পাগলের মতো হয়ে যায়। রাত্রে বাবাকে নিয়ে দেখা দুঃস্বপ্ন আর পরের দিন ফ্ল্যাটে গিয়ে বাবা-মা কাউকে দেখতে না পারা রিয়ার মনে একটাই উক্তি 'বাবাকে খুঁজে দাও'। দুদিন পর বাবাকে যখন ফোনে পায় তখন রিয়া তার বাবাকে বলেছে—

"দু'রাত ঘুমোয়নি, আজ আমি ঘুমোতে যাব। তোমাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না—তোমাকে খুঁজছিলাম, আজ তোমার খোঁজ না পেলে কী করতাম জানি না।"[৩৬]

'বহুদূর অভিমান' উপন্যাসে ব্রতীন আর অনিশার একমাত্র ছেলে রাজদীপ। স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করলে প্রিন্সিপাল তাকে ট্রান্সফার নিতে বাধ্য করেন। কোনো উপায় না পেয়ে তার বাবা-মাও তাকে কলকাতা থেকে দূরে এক স্কুলে ভর্তি করে দেয়। রাজু হোস্টেলে থাকে। কিছুদিন পর ব্রতীন আর অনিশার দাম্পত্যজীবনে বিচ্ছেদ আসে। বাবা-মার বিচ্ছেদের পাশাপাশি কিশোর রাজুও বিচ্ছিন্ন হতে থাকে তাদের থেকে। রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে রাজু মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকে। রাজু যখন বাড়িতে থাকতো তখনই তার বাবা-মার সম্পর্কটা যে ভালো নয় সেটা বুঝতে পারে। বাবা-মার ঝগড়ার সময় একদিন রিঅ্যাক্টও করেছিল—

> "একবার তো স্বামী-স্ত্রীর কথা কাটাকাটি উত্তাল হয়ে উঠতে ফল কাটার ছুরি হাতে নিয়ে ওদের বেডরুমে ঢুকে পড়েছিল : 'ঝগড়া থামবে, না খুন করব!"[৩৭]

বাস্তবিক, সেদিন ঐ চিৎকারের পর তার বাবা-মা তার সামনে আর কোনোদিন ঝগড়া করেনি।

রাজু জানে তার বাবা-মার সম্পর্কটা ভালো নয়, ডিভোর্স হয়ে গেছে। সেপারেশন পর্ব থেকেই বাবা-মা'র স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, এটা আস্তে আস্তে বুঝিয়েছিল ব্রতীন আর অনিশা। কিন্তু রাজু জেদি, একগুঁয়ে ও রাগী হয়ে ওঠে। তাকে ভালোবাসার আশ্বাসের কথা বললেও রাজু হঠাৎই বলে ওঠে—

> "অত বক্তৃতা দেওয়ার কী আছে! বাপ-মা তো অনেকেরই মরে যায়, তারা কি বাঁচে না! কেউ বাজারে কুলিগিরি করে, কেউ পকেট মারে, কেউ—। আমি পরোয়া করি না।"[৩৮]

শুধু কথাবার্তার ধরনই পাল্টায়নি, চেহারতেও বদলে গিয়েছে রাজু। ব্রতীন স্পষ্ট বুঝতে পারে, "তার বা তাদের অনেক আগেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ও— এখানে ক্ষোভ ও অসহিষ্ণুতার একটা প্রকাশ ঘটল। বোঝা যায় তাদের আর সহ্য করতে পারছে না; বাইরে রাগ দেখালেও আড়ালে কাঁদছে কি না কে বলবে! বয়সটা খারাপ, এই বয়সে এমন মানসিকতা থেকে অনেকেই আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে"।[৩৯]

আসলে বা-মার ঝগড়া আর অশান্তিতে রাজুর মেজাজ রুক্ষ হয়ে গেছে। বাবা-মার ছাড়াছাড়ি দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে তার মনটাকে। রাজু আরো ক্ষুব্ধ ও জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে যখন তাঁর মা দ্বিতীয় বিয়ে করবে বলে সে শুনেছে। একমাত্র সঙ্গী পরমহংসকে বলেছে, "মা না-থাকায় তোর কষ্ট; আর যাদের মা থেকেও নেই, তাদের কষ্টটা কেমন হয় বুঝতে পারিস? তখন রাগ হয়, গা জ্বালা করে— মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে নিজেকে— "[৪০]

রাজু মানসিক সুস্থিতি হারিয়ে ফেলে। ক্রমশ খারাপের দিকে এগোতে থাকে। সায়ন, চন্দ্রদের সঙ্গে মারপিট করে, নেশাগ্রস্থও হয়ে পড়ে একসময়। বাবা-মার সম্পর্কের দূরত্ব কতোখানি প্রভাব করে কিশোর রাজুর মনে তাই লেখক এখানে দেখিয়েছেন।

দিব্যেন্দু পালিত কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব মাথায় রেখে সৃজনশীলতার পথে অগ্রসর হননি। হয়তো কিছু তাত্ত্বিক ভাবনা তাঁর মগ্ন চেতনায় ছিল, যা লেখনীর মাধ্যমে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছায়। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে গ্রাম্যজীবন বিচ্ছিন্ন নাগরিক মধ্যবিত্ত তার একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গের মধ্যে এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংকট লালন করেছে। জগৎ ও জীবনের বিচিত্রমুখী জটিলতা, নৈরাশ্য, মোহভঙ্গ, বিভ্রান্ত প্রভৃতি সার্থক রূপ পায় তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রগুলোর অবদমিত হৃদয়ের বহুমুখী বিকার ও বিক্ষোভ প্রথম থেকেই ধরা পড়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রের মনোজগতের বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আপসপ্রবণতা, পলায়নপ্রবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ও ধরা পড়েছে। যেমন 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসে ধীমান। আসলে মধ্যবিত্তের রক্ষণশীলতা ও সীমাবদ্ধতায় অবদমিত মানুষের বিকার তার উপন্যাসে আসে। 'সহযোদ্ধা'য় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মানসিক সম্পর্কের দ্বন্দ্ব আদিত্যকে মানসিক শূন্যতায় নিক্ষেপ করেছে। দিব্যেন্দু পালিত মূলত নারী-পুরুষের মনোদৈহিক জটিলতার স্বরূপ স্পর্শ করেছেন। দেহ-মনের সন্তুষ্টি যেমন জীবনকে সুখে সংপ্লাবিত করে, তেমনি এর অতৃপ্তি এবং অসন্তুষ্টি মনোবিকার ও বিক্ষোভের জন্ম দেয়।

তথ্যসূত্র :

১. পালিত, দিব্যেন্দু : সিন্ধু বারোয়াঁ, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৯৭

২. তদেব : পৃ. ৬৮

৩. তদেব : পৃ. ৬৯

৪. পালিত, দিব্যেন্দু : সেদিন চৈত্রমাস, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ১৩৩

৫. তদেব : পৃ. ৯৭

৬. নন্দী, ধীরেন্দ্রনাথ : মনের বিকার ও প্রতিকার, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ২৯

৭. পালিত, দিব্যেন্দু : প্রণয়চিহ্ন, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৯০

৮. তদেব : পৃ. ৪২৩

৯. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছুস্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ১০৮

১০. পালিত, দিব্যেন্দু : সন্ধিক্ষণ, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৩০

১১. Jung, C. G. : Modern Man in Search of a Soul, Translated by W. S. Dell and Cary F. baynes, printed by great britian by Lund Humphrise, London, Bradford, Reprinted-1961, p. 217

১২. পালিত, দিব্যেন্দু : সন্ধিক্ষণ, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ২৫

১৩. তদেব : পৃ. ২৮

১৪. পালিত, দিব্যেন্দু : সম্পর্ক, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৭০

১৫. পালিত, দিব্যেন্দু : আমরা, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৮২

১৬. পালিত, দিব্যেন্দু : একা, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৪৩০

১৭. তদেব : পৃ. ৪৫১

১৮. তদেব : পৃ. ৪১২

১৯. পালিত, দিব্যেন্দু : উড়োচিঠি, দশটি উপন্যাস - ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৫১৫

২০. তদেব : পৃ. ৫১০

২১. পালিত, দিব্যেন্দু : অবৈধ, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৫৮২

২২. তদেব : পৃ. ৫৮৩

২৩. Benvenuto, Bice; Kennedy, Roger : The Works of Jacques Lacan, an introduction, FAB, 1986, p. 74

২৪. নন্দী, ধীরেন্দ্রনাথ : মনের বিকার ও প্রতিকার, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ২১

২৫. পালিত, দিব্যেন্দু : সোনালী জীবন, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ২৩০

২৬. তদেব : পৃ. ৫৮৩

২৭. পালিত, দিব্যেন্দু : অনুভব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৪, পৃ. ১০

২৮. তদেব : পৃ. ১৫

২৯. তদেব : পৃ. ৩৭

৩০. পালিত, দিব্যেন্দু : মাত্র কয়েকদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৩৮

৩১. পালিত, দিব্যেন্দু : হঠাৎ একদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১০, পৃ. ৮২

৩২. Jung, C. G. : Collected Papers on Analytical Psychology, edited by Dr. Constance E. Long, Moffat Yard and Company, New York, Second Edition – 1917, p. 232

৩৩. Jung, C. G. : Two Essays on Analytical Psychology, translated from the German by R. F. C. Hull, New York, Second Edition - 1966, p. 45

৩৪. Jung, C. G. : Collected Papers on Analytical Psychology, edited by Dr. Constance E. Long, Moffat Yard and Company, New York, Second Edition – 1917, p. 222-223

৩৫. Jung, C. G. : Modern Man in Search of a Soul, Translated by W. S. Dell and Cary F. baynes, printed by great britian by Lund Humphrise, London, Bradford, Reprinted-1961, p. 13

৩৬. পালিত, দিব্যেন্দু : যখন বৃষ্টি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২, পৃ. ৭৭

৩৭. পালিত, দিব্যেন্দু : বহুদূর অভিমান, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট, লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৫

৩৮. তদেব : পৃ. ২৫

৩৯. তদেব : পৃ. ৩৭

৪০. তদেব : পৃ. ৪৫

পঞ্চম অধ্যায়

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের শিল্পরীতি

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে নরনারীর পারস্পরিক নিগূঢ় সম্পর্ক রূপায়ণের মধ্যদিয়ে আধুনিক জীবনদৃষ্টিকে উন্মোচিত করেছেন। এই আধুনিক জীবনদৃষ্টি তাঁর উপন্যাসসমূহকে অনন্যতা দান করেছে। আর এই অনন্য জীবনদৃষ্টিকে উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত করতে গিয়ে দিব্যেন্দু পালিত খুঁজে পেয়েছেন তাঁর উপযুক্ত শিল্পরীতিকে। হঠাৎ একদিন একটি মাত্র গ্রন্থে এই শিল্পরীতি দেখা দেয়নি। উপন্যাসে এই শিল্পরীতির ক্ষেত্রে দিব্যেন্দু পালিতের স্বকীয়তা ক্রম-উন্মোচিত হয়েছে যেন। বস্তুত এক একটি গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন শিল্পরীতির মধ্যদিয়ে নয়, বরং উপন্যাসের নির্মাণশিল্পের এক একটি উপকরণ— উপস্থাপনরীতি, গঠননির্মাণ, ভাষাবিন্যাস ইত্যাদি তাঁর উপন্যাস ধারার মধ্যদিয়ে বিকশিত ও বিবর্তিত হয়েছে। আর এ থেকেই দিব্যেন্দু পালিতের শিল্পরীতির সামগ্রিক রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসগুলির শিল্পরীতির আলোচনা আমরা কয়েকটি দিক থেকে করতে পারি। যেমন—

১. উপস্থাপনরীতি।

২. গঠননৈপুণ্য।

৩. ভাষাবিন্যাস।

কাহিনি বিন্যাসের প্রচলিত রীতি— সর্বজ্ঞ লেখক কর্তৃক কাহিনি বিবৃত করা— এই পদ্ধতিটিকে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ'য় অনুসরণ করেছেন। সাধারণ সাদামাটা একটি ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনিকে উপন্যাসের কেন্দ্রে রেখে লেখক কাহিনির রূপদান করেছেন। গল্পটি বিবৃতও হয়েছে একরৈখিকভাবে। কোথাও কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। একমাত্র ভিলেন চরিত্র পাড়ার বখাটে ছেলে সুনীলকে ঘিরে উপন্যাসের জটিলতা সৃষ্টি করা যেত। কিন্তু লেখক চরিত্রটিকে সরাসরি উপন্যাসে আনেননি। তার সংলাপ পর্যন্তও নেই। কিশোর বয়সে লেখা এই উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখক বিরূপ মন্তব্য পোষণ করেছেন—

> "লেখক হবার জন্যে সেই আঠারো-উনিশ বছর বয়সে আমি এতোই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম যে উপন্যাসটি পরিমার্জনা করার বা আদ্যন্ত ফিরে লেখার কথা ভাবিনি।"[১]

দ্বিতীয় উপন্যাস 'সেদিন চৈত্রমাস'-এও একই রকম ব্যর্থতা চোখে পড়ে। এখানেও কিছু যুবক-যুবতীর প্রেমের কাহিনিকে লেখক একমুখী করে বর্ণনা করেছেন। জটিলতা বা দ্বন্দ্ব কোনোভাবেই কাহিনিকে আকর্ষণ করে তুলতে পারেনি। বিবৃতিধর্মীতে লেখক কাহিনি পরিবেশন করেছেন। তবে এখানে অধ্যায় বিভাজন ও প্রতি অধ্যায়ের আরো ছোটো ছোটো পর্ব নির্মাণ করেছেন। পরিচ্ছেদগুলির মধ্যে একঘেয়েমিতা যেমন এসেছে তেমনই এসেছে বৈচিত্র্যহীনতা। ফলে উপন্যাসটি পাঠকমনে কোনো স্থায়ী দাগ কাটতে পারেনি।

তৃতীয় উপন্যাস 'ভেবেছিলাম' থেকে দিব্যেন্দু পালিত নিজের স্বতন্ত্রতার কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন। এখানে বিবৃতিধর্মীতাকে তিনি পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন। উত্তমপুরুষে নিজের ব্যক্তিজীবনের কাহিনি উপন্যাসের কথককে দিয়ে বর্ণনা করেছেন। সেই 'উত্তমপুরুষ' বা 'আমি' উপন্যাসের ঘটনাকে নিজের অভিজ্ঞতার স্মৃতিকথারূপে তুলে ধরেন। পরবর্তীকালে লেখা 'আমরা' উপন্যাসেও এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু 'ভেবেছিলাম' বা 'আমরা' কোনোটাই খাঁটি আত্মজীবনীমূলক বা লেখকের ব্যক্তিজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। তবে এই দুটি উপন্যাসে ঐ ধরনের উপন্যাসের ঈষৎ লক্ষণ যে প্রকাশ পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

চতুর্থ উপন্যাস 'মধ্যরাত'-এর বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য এনেছেন। কিন্তু কাহিনি পরিবেশনের দিক থেকে সেই গতানুগতিকতাকেই জোর দিয়েছেন। এই উপন্যাসে অনেক চরিত্র (এই উপন্যাসেই সবচেয়ে বেশি চরিত্র) থাকলেও একমাত্র প্রধান চরিত্র তপতী ছাড়া আর কারো কথা নেই বললেই চলে। লেখক এখানে নিজে না বলে উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র তপতীর মাধ্যমে কাহিনিকে পরিবেশন করেছেন। ফলে অন্যান্য চরিত্রগুলি তেমন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। কাহিনির গতিকে বিকশিত বা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। আবার তপতী যখন অতীত স্মৃতিচারণা করেছে তখন তার মুখের সংলাপ কেড়ে নিয়েছেন লেখক। যেমন—

> "অতীতে দু-বার বাধ্য হয়ে তাকে শবযাত্রার সঙ্গী হতে হয়েছিল। প্রথম, বাবার মৃত্যুর সময়। তপতী তখন ছোটো, সব কথা আজ আর স্মরণ হয় না।...সকলের পিছনে তপতী, খালি পায়ে এলোচুলে।...ছোটো বলে সেদিনের মৃত্যু স্বাভাবিক হয়ে দেখা দিয়েছিল; বিহ্বল হয়ে পড়লেও কোনো রকম অসহায়তা দেখা দেয়নি মনে।"[২]

এভাবে চরিত্রের মুখের সংলাপ কেড়ে নিয়ে চরিত্রের বাক্-স্বাধীনতাকে ফুটতে দেননি লেখক। ঘটনার বিবৃতি দানে লেখক এতোটাই তৎপর ছিলেন যে চরিত্রগুলোর মনোজগতের ছবিও স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। তাই উপন্যাসটির দ্বিতীয়বার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে পরিবর্তিত আকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় 'স্বপ্নের ভিতর' নামে। উপন্যসের মাঝখানে নীতিশের সঙ্গে তপতীকে ঘিরে উপন্যাসের জটিলতা বা দ্বান্দ্বিকতা সৃষ্টি করতে পারতেন লেখক। কিন্তু সেই দিকে এগোননি। কেবল উপন্যাসের মাঝে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা এনেছেন। যেমন, মেসের মেয়েদের আড্ডা-গল্পগুজব, নীলার বিয়ের পর প্রত্যেকের শূন্যতা অনুভব করা, অঞ্জলির আকস্মিক অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া, বিধবা সাবিত্রীর রহস্যময় গতিবিধি, উপন্যাসের শেষে মেসবাড়িতে পুলিস আসা ইত্যাদি ঘটনা খুবই ধীর গতিতে পরিবেশিত হয়েছে।

'প্রণয়চিহ্ন' উপন্যাসে লেখক নিজে বিবৃতিদানের মধ্যদিয়ে কাহিনি বর্ণনা করেননি। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নমিতার মধ্যদিয়ে কাহিনির প্রথম থেকে শেষ অবধি বর্ণনা করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে নমিতার বিবৃতিতে শুরু হয় উপন্যাস—

> "পরিতোষ চলে যাচ্ছিল। দরজা পর্যন্ত গিয়ে থেমে দাঁড়াল। নিছকই থেমে দাঁড়ানো। আমি জানি, পরিতোষের কিছু বলার নেই। অনেকক্ষণ ধরে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেছে ও, কথা বলেছে আন্তরিক ভাষায়। এই অবস্থায় একজন পুরুষ যা যা করে ও যেভাবে, পরিতোষের ব্যবহারে তার সামান্য তারতম্য ঘটেনি।"[৩]

উপন্যাসটি শেষও হয় তারই উক্তিতে—

> "আমার আশপাশ দিয়ে মানুষজন হাঁটতে লাগল। এদিক থেকে ওদিকে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটর ক্রমাগত ছুটে যাচ্ছে, আসছে, যাচ্ছে। সমবেত ধ্বনি আলতোভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে কান। একা দাঁড়িয়ে এইসব দেখতে দেখতে গলা পর্যন্ত নিশ্বাস উঠে এল আমার। মনে হল অনেকদিন এই সরব ব্যস্ততা লক্ষ করিনি আমি। আজ একটু দেখি।"[৪]

উপন্যাসে আগাগোড়া নমিতার আত্মকথায় বিবৃতিদানের প্রসঙ্গ এলেও দশম পরিচ্ছেদের শেষে নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গ এনেছেন লেখক। নকশালকর্মী চন্দন পুলিসের হাত থেকে

বাঁচতে নমিতার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। এই অংশটি উপন্যাসে না হলেও ক্ষতি হতো না। কেননা উপন্যাসটি মূলত নমিতা আর পরিতোষের নষ্ট দাম্পত্যসম্পর্ক নিয়ে। সেখানে নমিতার বান্ধবী মানসীর ছেলে চন্দনকে টেনে এনে নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গকে তুলে ধরার কোনো মানে হয় না। তাই ২০০৩ সালে উপন্যাসটির ('একদিন সারাদিন') দ্বিতীয়বার পরিকল্পনা করেন লেখক। সেখানে নকশাল আন্দোলন বা চন্দনের প্রসঙ্গ নেই। তবে ইতিহাস বা সময়কে ছুঁয়ে যাবার একটা প্রচেষ্টা করেছেন লেখক।

১৯৭১ সালে লেখা 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের মধ্যদিয়ে দিব্যেন্দু পালিতের স্বতন্ত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের ধরনও বদলে যায়। উপন্যাসগুলি আয়তনে যেমন ছোটো হয়ে আসে, কাহিনি তেমনই আরো একমুখী হয়ে ওঠে। চরিত্রের প্রাচুর্যও কমে যায়। ব্যক্তিগত জীবনে দিব্যেন্দু পালিত এই সময় অনেক বদলে গেছেন। শুধু বয়সই বাড়েনি, অন্যান্য অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন পরিবেশ, বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শ, জীবিকা প্রভৃতি সবকিছু তাঁকে বদলে দিয়েছে। একদা গ্রামের ছেলে দিব্যেন্দু পালিত হয়ে উঠেছেন নাগরিক দিব্যেন্দু পালিত। নাগরিক মনন ও জটিলতায় পরিক্রম করেছে তাঁর লেখা ও লেখা সম্পর্কিত ভাবনা। নিতান্ত সখ দিয়ে যার শুরু, অমনোযোগ ও দ্রুত লিখনের ছাপকে অতিক্রম করে তিনি লেখক হিসেবে পরিবর্তিত হয়েছেন। 'কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান' গ্রন্থে জানান—

> "লেখক হিসেবে আমি যে পরিবর্তিত হচ্ছি— বদলে যাচ্ছে সূচনার ভাষা, চিন্তায় সংযুক্ত হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তি ও চরিত্র ক্রমশ আক্রান্ত হচ্ছে তাদের পরিবেশ ও তাদের থেকে উঠে আসা শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে— তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যেতে পারে।"[৫]

'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসটি শুরু হয়েছে আকস্মিকতা দিয়ে। উপন্যাসের শুরুতেই মৃত্যুর সিচুয়েশন এনেছেন লেখক। ছোটোগল্পের মতো প্রথমেই একটা চমক দিয়েছেন যাতে পরের দিকে এগিয়ে যেতে হয় পাঠককে। কনকের আকস্মিক মৃত্যুতে উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে এসেছে বিষণ্ণতা। যা এই উপন্যাসটির মূল সুর। জীবনের বাঁচা ও মরার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে প্রতিটি চরিত্রের ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্যকে বিচার করেছেন লেখক। কনকের মৃত্যু প্রথম পরিচ্ছেদে হলেও সেই মৃত্যুকে ঘিরে জটিলতা এসেছে অষ্টম পরিচ্ছেদে অমিয়-রেখার

দাম্পত্যসম্পর্কে। কনকের সঙ্গে রেখার পূর্ব সম্পর্ক ঘিরে অমিয় আর রেখার মধ্যে চলে চাপা মান-অভিমান আর অশান্তি। সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে অমিয়র মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। সন্তানসম্ভবা রেখার মুখ দিন দিন ফ্যাকাসে হতে থাকে। অদৃশ্য থেকেও কনকই উপন্যাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। মৃত মানুষ উপন্যাসে কতোখানি স্থান নিতে পারে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। উপন্যাসটিতে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিণতি দেখাননি লেখক। উপন্যাসের শেষে রাজনীতির পরিমণ্ডল এনেছেন। সময়টি সেই অশান্ত নকশাল আন্দোলনের সময়। যখন সবকিছু থেকে শূন্যতায় ভরে ওঠে জীবন, তখন লেখক দেখান রাজনীতির আশ্রয়ে নিজেদের ভীতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে। মিছিলের মধ্যে মিশে থাকা দাশরথির ঊর্ধ্বে তোলা মুঠি সে প্রত্যয়ই এনে দেয়।

ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু পালিত তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাস প্রথম পুরুষে রচনা করলেও উত্তম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ— দুধরনের রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'বৃষ্টির পরে', 'চরিত্র', 'উড়োচিঠি', 'আড়াল', 'স্বপ্নের ভিতর', 'অবৈধ' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণই প্রথম পুরুষে লেখা। যেমন—

১. 'গাড়ি চালাতে চালাতে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে অনেক দিন পরে শরীরে আসুরিক শক্তি অনুভব করছিলেন রামতনু'। ('সম্পর্ক', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৬৭)

২. 'রুচি আড়াল চেনে। শুধু মেয়েমানুষ বলেই নয়; নিজস্ব কারণেও'। ('আড়াল', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ১৪৩)

৩. 'বিশাখা স্বপ্ন দেখে না। কিংবা দেখলেও এমন কোনও স্বপ্ন দেখে না, রাতের গাঢ় ঘুম ও আচ্ছন্নতার মধ্যে যা জাগিয়ে তুলবে হঠাৎ, শোক কিংবা সুখের রেশ তার পর থেকে অনেকক্ষণ নতুন এক আচ্ছন্নতায় ডুবিয়ে রাখবে তাকে'। ('স্বপ্নের ভিতর', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ৩৭৩)

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর এক একটি উপন্যাসে এক একটি পুরুষে কাহিনি বিবৃত করলেও কিছু কিছু উপন্যাসে দুই পুরুষেরই ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ প্রথম পুরুষে শুরু হলেও পরবর্তী পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে উত্তম পুরুষে। যেমন 'একা'

উপন্যাসটি প্রথম পুরুষে শুরু হয়েছে— "বারো দিন পরে একদিন সকালে রাস্তায় বেরিয়ে ঝরঝরে বোধ করল শিশির'। ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৩৯৩) কিন্তু তৃতীয় পরিচ্ছেদটি শুরু হয়েছে উত্তম পুরুষে— 'তোদের এই ডায়লগ-টায়লগের ব্যাপারগুলো, অতনু, আমি ঠিক বুঝি না'। ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৪২৩) শিশিরের এই আত্মভাষণ শেষপর্যন্ত অনুসৃত হয়নি। লেখক আবার শিশিরের কথা বলার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন। শেষতম পরিচ্ছেদে লেখক এবং শিশির দুজনে মিলে কথা বলেছে— 'যেতে যেতে ক্রমশ একদিন আবার পুরনো সিঁড়িতে পা রাখল শিশির'। ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৪৫৬) এবং 'না, বেশ আছি। এখন এখানে; একটু পরে উঠে যাবো। দ্যাখো, কেমন সুন্দরভাবে কেটে যাচ্ছে এক-একটা দিন'। ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৪৫৭) এভাবে একটি উপন্যাসের মধ্যে দুই-পুরুষের যাতায়াত হলেও চরিত্রের নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশে কখনো কোনো ছেদ পড়েনি। আসলে উপন্যাসের চরিত্রের মনের কথা ঔপন্যাসিকই বেশি জানেন।

'অন্তর্ধান', 'অনুভব', 'অনুসরণ', 'সোহিনী এখন কোথায়' প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিত সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এবং নমুনা-সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য কাহিনির প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেছেন। 'অন্তর্ধান' উপন্যাসে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু সংবাদ বিচ্ছিন্ন এবং পরিবর্তিতভাবে ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসটির শুরুতে আছে একটা সাসপেন্স এবং এই সাসপেন্স সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে সৃষ্টি করেছে এক ধরনের অনুসন্ধান। প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে সুশোভনের দাদা চিন্মোহন মারা গেছেন এবং তাকে দেখতে গিয়ে ফেরার সময় সুশোভনের অষ্টাদশী মেয়ে পুতুলের আকস্মিক অন্তর্ধান উপন্যাসে এক ধরনের সাসপেন্স সৃষ্টি করেছে। থানায় ডায়েরি করলে পুতুলকে খুঁজতে ব্যর্থ হয় পুলিস-প্রশাসন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে সুশোভনের নিরন্তর অনুসন্ধান। এরপর খবরের কাগজে সংবাদ বের হয়— 'উদ্ধার করা তরুণী গোয়েন্দাদের হেফাজত থেকে উধাও' এবং 'সুশোভন মুখার্জিও হারিয়ে গেলেন?' এবার সুশোভনের স্ত্রী তেষট্টি বছর বয়স্ক স্বামী সুশোভনের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনার জন্য থানায় এফ. আই. আর. করেন। সুশোভনেরও কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। এই ঘটনার তিন মাস পরেও খবরের কাগজের বিষয় হয়ে ওঠেন সুশোভন ও তার মেয়ে পুতুল। উপন্যাসটি শেষও হয় এই রকম একটা সাসপেন্সের মধ্যদিয়ে।

'অনুসরণ' এবং 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাস দুটির শুরুতে আছে কিডন্যাপের ঘটনা। যেমন, 'অনুসরণ' উপন্যাসের প্রথমে— 'আঠাশ বছর বয়স্কা একটি বিবাহিতা যুবতীকে নিয়ে গভীর মধ্যরাতে উধাও হয়েছে একটি ট্যাক্সি, ড্রাইভার-সহ সেই ট্যাক্সিতে ছিল আরো দুটি সন্দেহজনক চরিত্রের পুরুষ, উধাও হবার আগে মহিলার স্বামীকে মারধোর করে ফেলে দেয় রাস্তার ধারের গর্তে...' ('অনুসরণ', পৃ. ৩০) এরপর চলতে থাকে স্ত্রীকে খোঁজার জন্য অনীশের অনুসন্ধান। অনীশ পুলিসকে ঘটনাটি জানালেও সবার কাছে তা গোপন রাখতে চেয়েছিল। ঘটনাটি আড়াল করার জন্যই দিব্যেন্দু পালিত এই উপন্যাসটির অবতারণা করেছেন। এই রকম পরিস্থিতিতে দিব্যেন্দু পালিত দেখাতে চেয়েছেন মানুষের বিভিন্ন মনোভাবকে। এই উপন্যাসের শেষে লেখক আইন আদালতের প্রসঙ্গ এনেছেন। অনীশকেই পুলিস গ্রেপ্তার করে এবং কোর্টে চলতে থাকে তার মামলা। এখানেই উপন্যাসটি শেষ হয়।

'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসের প্রথমে সংবাদপত্রে খবর বের হয়— 'চিকিৎসার খরচ মেটাতে না পেরে ফ্ল্যাটে দম্পতির আত্মহত্যা' এবং 'আত্মঘাতি সাতাশ বছরের সুন্দরী ও জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেত্রীর'। এরপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে ধীমানের স্ত্রী সোহিনীকে কিডন্যাপের ঘটনাটি লেখক 'অনুসরণ' উপন্যাসের মতোই বর্ণনা করেছেন। এই উপন্যাসেও ধীমান স্ত্রীর কিডন্যাপের ঘটনাটি আড়াল করেছে। দিব্যেন্দু পালিত এই উপন্যাসের শেষে জানান, 'কাহিনি অংশে আমার 'অনুসরণ' উপন্যাসের কিছু কিছু বর্ণনা পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে প্রক্ষিপ্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে'। ('সোহিনী এখন কোথায়', পৃ. ১৫৮) এইভাবে গল্পের মধ্যে একটা 'সাসপেন্স' সৃষ্টি করে গল্পের ঔৎসুক্যকে আগাগোড়া বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন লেখক।

দিব্যেন্দু পালিত কোনো কাহিনি বা ঘটনা বর্ণনা করে উপন্যাস রচনা করেননি। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসেই দেখা যায় তিনি মাঝখান থেকে কাহিনি শুরু করেছেন কিংবা তাঁর উপন্যাসের শুরুটা হয়েছে একটা অস্পষ্টতা দিয়ে। যেমন, 'অনুভব' উপন্যাসটি শুরু হয়েছে— 'সিনেমায় কিংবা টেলিভিশন সিরিয়ালে দেখা যায় যায় এমন। না, সিরিয়ালেও কি?' ('অনুভব', পৃ. ০৯) এরপর উপন্যাসের গতি সামনের দিকে একটানা অবিরাম হলে তা ক্রমেই অধিকতর দ্রুত ও তীব্র হয়ে ওঠে। এরজন্য লেখক ফিল্মের ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির

সাহায্যে সেই গতিকে কিছুটা মন্থর করে আনেন। সিমার্‌স্ কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে এসে অতীতে ফিরে যায় আত্রেয়ী। রাহুলের সঙ্গে যখন সম্পর্কটা টিকল না, তখন আত্রেয়ী কোনো বাড়াবাড়ি করেনি। এরপরেই চিন্তার অনুবিশ্ব তাকে দহনক্লান্ত করে তুলেছে। বর্তমানে বসে ভবিষ্যতের সঙ্গে স্মৃতিকে গুলিয়ে ফেলেছে সে। সময়ের বেড়াজালে এক আন্তর্জাতিক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন লেখক তাকে। বিদুষী নারী আত্রেয়ী অপমান সহ্য করতে না পেরে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসে। স্বাধীনভাবে থেকেই ইউনেস্কোর রিসার্চ প্রোজেক্টে যোগ দেয়। দেহোপজীবিনীদের মর্মান্তিক জীবনযাপন ছিল তার গবেষণা ও সমীক্ষার বিষয়। এইসব নারীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তাকে জীবনের পূর্ণতা এনে দেয়। সে তার অস্তিত্বের একটা মানে খুঁজে পায়।

দিব্যেন্দু পালিত উপন্যাসের উপস্থাপনায় একটি নতুন কৌশল ব্যবহার করেছেন। অতীতস্মৃতির সূত্র ধরে কাহিনিকে তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সেই অতীত স্মৃতি আবার বাস্তবের অনুষঙ্গে পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'মধ্যরাত' উপন্যাসে তপতী বর্তমানের পাশাপাশি হঠাৎ অতীতস্মৃতিতে ভাবতে থাকে। নিজের বাবা-মার মৃত্যুজনিত স্মৃতিতে সে একাকীত্ব অনুভব করে। 'আমরা' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যখন অমলাদি দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা প্রিয়নাথকে বলে, তখন প্রিয়নাথ তার পাঁচ বছরের পুরনো ঘটনাকে মনে করে। আবার 'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসে বিশাখা ও অর্পিতাও যখন মেসের নির্জন পরিবেশে একা থেকেছে তখন তারা অতীত স্মৃতিতে নিমগ্ন থেকেছে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসগুলির শেষে কোনো তৃপ্তি বা পরিপূর্ণতা নেই। উপন্যাসগুলি শেষ হয় একটা সাসপেন্সে। ছোটোগল্পের পরিণতির মতোই উপন্যাসগুলি শেষ হয়েছে। যেমন, 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসে নিখিল আর বুলা রেস্টুরেন্ট থেকে রাস্তায় মিছিলে দেখেছিল অনেক লোকের ভিতরে মিশে থাকা দাশরথিকে। তার পর লেখকের বক্তব্য— 'ওরা অনেক দূর পর্যন্ত দাশরথির উপর চোখ রাখল। অনেক দূর পর্যন্ত ওঁর উত্তোলিত হাতটা দেখা গেল। শেষে ধ্বনির রেশটুকু ছাড়া আর কিছুই থাকল না'। ('সন্ধিক্ষণ', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১,পৃ. ৬৩) 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসের শেষে আদিত্যকে পুলিস অ্যারেস্ট করে ধরে নিয়ে গেছে। আদিত্য এর পরিণাম জানে না, জানে না পাঠকও। আদিত্যর স্রষ্টার বক্তব্য— 'শুধু বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গেটে দাঁড়ানো পুলিস ভ্যানটার দিকে

এগোতে এগোতে ভাবল, হতে পারে এটাই সেই ভ্যান, একদিন রাস্তা থেকে যেটা নেমে গিয়েছিল ময়দানের অন্ধকারে'। ('সহযোদ্ধা', পৃ. ৬৯) আবার, 'অনুভব' উপন্যাসের শেষাংশে আত্রেয়ী কাউকে কিছু না বলে রেজিগনেশন লেটার সেক্রেটারির হাতে দিয়ে অনির্দিষ্টতার উদ্দেশ্যে রাস্তায় পা বাড়ায়, সেই ঘটনায় পাঠককেও বিষণ্ণতায় পড়তে হয়— 'ক্ষণিকের স্তব্ধতা ঘিরে ধরে আত্রেয়ীকে। এরপর যাবে কোথায়? কার কাছে?' ('অনুভব', পৃ. ১২৮) এরকম একটা প্রশ্নে উপন্যাসটি শেষ হয়। আবার 'বহুদূর অভিমান' উপন্যাসের শেষাংশে দেখা যায়, লেখক প্রথমে বিবৃতি দেন— 'পরমহংস অন্য কোথাও চলে গেল'। তারপর মাঝখানে তিন বন্ধু রাজদীপ, পরমহংস এবং সায়নের সংলাপ—

> পরমহংস বলল, 'ঠিক আছে, তুই সিগারেট খেলে বুড়ো হাঁসও খাবে— '
> রাজু বলল, 'তাহলে রাজু বনলতার কাছে যাবে— '
> পরমহংস বলল, 'যাবে— '
> সায়ন বলল, 'তাহলে সায়ন ন্যাংটো মেয়ের ছবি দেখবে— '
> পরমহংস বলল, 'দেখবে— '
> এরপর শেষে লেখকের বিবৃতিতে উপন্যাসটি শেষ হয়— 'গেট পেরিয়ে অন্ধকারে কাঁচা রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল ওরা'। ('বহুদূর অভিমান', পৃ. ৭৩)

উপন্যাসের সুষ্ঠু ও সার্থক শিল্প-অবয়ব রচনা সম্পর্কে দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ অবহিত ছিলেন। সেই অবয়ব যে সবসময় এক বা অপরিবর্তিত থেকেছে তা নয়। প্রয়োজন অনুসারে তিনি বারবার তার কাঠামো পরিবর্তন করেছেন। সে প্রয়োজন আসলে বিষয়বস্তুকে যথাযোগ্যভাবে রূপায়িত করার জন্য। আর সেই বিষয়বস্তু বিচ্ছিন্নভাবে কাহিনি, চরিত্র বা পরিবেশ নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দিব্যেন্দু পালিতের নিজস্ব মানসপ্রবণতা এবং তাঁর জীবনঅভিজ্ঞতা। এই দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরকে যথাযথভাবে বিধৃত করার জন্য অপরিহার্যভাবে তিনি শিল্প-আধারেরও বদল ঘটিয়েছেন। আর তাই প্রথমদিকের উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ', 'সেদিন চৈত্রমাস', 'প্রণয়চিহ্ন' প্রভৃতি থেকে 'সন্ধিক্ষণ'-এ পৌঁছতে তাঁকে উপন্যাসের গঠন বদল করতে হয়েছে। এর দশবছর পর 'সহযোদ্ধা'য় কিংবা তারও দশবছর পরে 'অনুভব'-এ এসে দেখা যায় আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে তাঁর উপন্যাসের গঠনবিন্যাস।

কাহিনি ও চরিত্রের সমন্বয় সাধনই ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্য হলেও দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে জোর দিয়েছেন অন্যত্র। নিছক কাহিনি সৃষ্টি তো নয়ই, আবার নানা ধরনের চরিত্র সৃষ্টিও নয়। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে তিনি চেয়েছেন নরনারীর সম্পর্কের গভীর উদ্ভাসন। তাই একই বিষয় নিয়ে অনেক উপন্যাস গড়ে উঠেছে। যেমন, যুবক-যুবতীর প্রেম নিয়ে 'সিন্ধু বারোয়াঁ', 'সেদিন চৈত্রমাস' এবং নষ্ট-দাম্পত্যসম্পর্ক নিয়ে 'অবৈধ', 'সিনেমায় যেমন হয়', 'মাত্র কয়েকদিন', 'একদিন সারাদিন', সেকেন্ড হনিমুন' প্রভৃতি। আসলে চরিত্রের সামগ্রিক সত্তা তিনি মাত্র একটি উপন্যাসে তুলে ধরেননি। একই নারীপুরুষ বিভিন্ন উপন্যাসে তাদের সামগ্রিক সত্তার একটু একটু করে ঢেলে দিয়েছেন যেন।

উপন্যাসের অবয়ব-সমগ্রতা বিষয়ে দিব্যেন্দু পালিত জানান—

> "আমার উপন্যাসের আয়তন সাধারণত বেশি হয় না। অকারণে কলেবর বৃদ্ধির প্রতি আমার আকর্ষণ বরাবরই কম। বরং লেখায় আমি পরিমিতিবোধকেই প্রশ্রয় দিই বেশি। বিদেশি বা ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠের অভ্যাস থেকেই আমার এই অভ্যেস গড়ে উঠেছে, এটা স্পষ্ট।... বিষয়ের প্রয়োজনই লেখার দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট করে। অতিকথন যে-কোনও রচনারই বড় ত্রুটি গণ্য হতে পারে। লেখায় সংযম যে-কোনও সময়ে একটি বড় গুণ। লেখায় শিল্পগুণ বা ভাষাগুণ বলতেও এটাই বোঝায়; অন্তত আমি এভাবেই বুঝেছি।"[৬]

প্রথম উপন্যাসে তিনি একেবারে প্রচলিত ধারায় কাহিনি রচনা করলেও দ্বিতীয় উপন্যাস থেকে পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় বিভাজন করেছেন। পরিচ্ছেদ সংখ্যাও খুবই কম। যেমন— দ্বিতীয় উপন্যাস 'সেদিন চৈত্রমাস'-এ পরিচ্ছেদ সংখ্যা মাত্র সাতটি, 'আমরা' উপন্যাসে পাঁচটি, 'একা' উপন্যাসে ছয়টি, আবার 'অহংকার' উপন্যাসে (চারটি পরিচ্ছেদ) দেখা যায় পরিচ্ছেদগুলির নামকরণ করেছেন— প্রথম পরিচ্ছেদ— ফ্ল্যাটে কান্নার শব্দ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— নীপার তৃতীয় চোখ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ— সুদেষ্ণা এখন কী করবে?, চতুর্থ পরিচ্ছেদ— ভোরের ঘটনা।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণে স্বতন্ত্রতার পরিচয় পাওয়া যায় দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের মধ্যদিয়ে। একটি মৃত্যুকে ঘিরে বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক টানাপোড়েন উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু। মৃত্যুটি উপন্যাসের একেবারে শুরুতেই এনেছেন,

অনেকটা ছোটোগল্পের চমকের মতো। মধ্যবিত্ত কেরানি দাশরথির একমাত্র পুত্র কনকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কাহিনিকে লেখক তিনটি সমান্তরাল রেখায় শেষ অবধি টেনে গেছেন— প্রথমত, একমাত্র উপার্জনশীল ছেলেকে হারিয়ে দাশরথির পরিবারের সংকটময় অবস্থা। দ্বিতীয়ত, কনকের বোনদের ঘিরে তারই বন্ধু নিখিল আর শ্যামলের আচরণগত অসংগতি। তৃতীয়ত, কনকের মৃত্যুকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি কাহিনি উত্তপ্ত হয়েছে রেখা আর অমিয়র দাম্পত্যসম্পর্কের মধ্যে।

মাত্র এগারোটি পর্বে বিন্যস্ত এই ছোটো উপন্যাসটি যেন আগাগোড়া ছোটোগল্পের মতোই ব্যঞ্জনাধর্মী। দিব্যেন্দু পালিতের প্রিয় ঔপন্যাসিক আলব্যের কামু। অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা, জীবনসত্যের অন্বেষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাসেও। স্মৃতির সূত্রে কিংবা নানা প্রশ্নের ফ্রেমে দিশাহারা সময় লেখকের কুশলীয় দক্ষতায় ধরা পড়ে। 'সন্ধিক্ষণ' আসলে স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস। প্রথাসিদ্ধ বা ঘটনাবহুল টানা কাহিনি লেখক বর্ণনা করেননি।

আঁটসাঁট ঘটনার ঘনঘটা কিংবা গল্প অপেক্ষা টুকরো টুকরো ছবির কোলাজে রচিত 'সবুজগন্ধ' এবং 'সোনালী জীবন' উপন্যাস দুটি। মাত্র পাঁচটি পর্বে বিন্যস্ত 'সবুজগন্ধ' উপন্যাসটি। উপন্যাসের নামকরণটি অবশ্যই ব্যঞ্জনাধর্মী। নায়কের ভূমিকাটিই এখানে প্রতীক রূপে দেখা দিয়েছে। কুশ্রীতা ও বিকৃতির বাতাবরণের মাঝে সে প্রতিবাদ করতে জানে। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এভাবে— 'সঙ্গে নিয়ে কিংবা পাশাপাশি হাঁটলে এক রকম গন্ধ পাওয়া যায়। বৃষ্টিভেজা সবুজের আর্দ্রতা মেশানো... স্নিগ্ধ ও রহস্যময়, ঠিক কেমন বোঝা যায় না'। ('সবুজগন্ধ', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৬৪৯) উপন্যাসের শেষেও রাতের অন্ধকারে নিরাকার ময়দানের দিকে হাঁটতে থাকে দীপঙ্কর। সময়ের বিরুদ্ধেই তাঁর যুদ্ধ। তবু সময়েরই কাছে চেয়ে নেয় একটু একা হবার সময়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষের হেরে-যাওয়াটা বড়ো ভয়ঙ্কর। শুধু অন্ধকারই পারে দীপঙ্করকে আড়াল করতে। দীপঙ্কর এখানে আগাগোড়া 'সরলরেখা'য় হাঁটেনি। শেষ বিচারে উপন্যাসটি সুররিয়ালিস্টিক হয়ে ওঠে, শৈলীও তাই।

'সোনালী জীবন' উপন্যাসটিও আয়তনে ছোটো এবং ছোটো ছোটো কোলাজ দিয়ে গড়া। একমাত্র এই উপন্যাসেই লেখক পর্বের মধ্যে ছোটো ছোটো উপশিরোনাম দিয়েছেন। মাত্র ছয়টি পর্বে বিন্যস্ত। উপশিরোনামগুলি তুলে ধরলে এর ইঙ্গিতধর্মিতাও চোখে পড়বে।

প্রথম পর্বে— আর্থারের শোক, দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত, স্যামুয়েলের অস্ট্রেলিয়া, বিপর্যয়ের শুরু, সারার হয়রানি, বড়োবাবুর কাছে, বলাৎকারের পটভূমি, অপমানের পরে, রবিনের অনুশোচনা, ভালোবাসায় প্রত্যাবর্তন, সাদা পোশাকের ডাক, মায়ের জন্য উপহার, স্মৃতির দিকে, দূরদর্শী বড়োবাবু, রুজির মুখ দেখা, ডরোথির সামনে, অন্ধকার বারান্দা, সারার প্রশ্ন, চকোলেটের স্বাদ, দৃশ্যটা নতুন নয়। দ্বিতীয় পর্বে— রোজালিনের প্রস্তাব, মরা ইঁদুর ও ভাঙা পাঁচিল, শিশি-বোতলের হাসি, আর্থারের স্বপ্ন দেখা, বিষণ্ণ ডরোথি, লরার চিঠি। তৃতীয় পর্বে— টেলিফোনের আর্তি, অন্য এক জীবনে, কিছু অস্পষ্ট প্রশ্ন, এ কেমন ভালোবাসা, অপমানিত মাইকেল। চতুর্থ পর্বে— ডোনাল্ডের শক্তি পরীক্ষা, অড্রির প্রশ্ন, অবুঝ ডেইজি, হঠাৎ আবির্ভাব, দ্য ব্রেভ ইজ দ্য ব্রেভ। পঞ্চম পর্বে— মন খারাপের সূচনা, রিপন স্ট্রিটে বড়দিন, সেই অদ্ভুত মানুষটি, অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব এবং ষষ্ট পর্বে— ডোনাল্ডের প্রশ্ন।

এই উপন্যাসটি আর একটি দিক দিয়েও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। একমাত্র এই উপন্যাসের চরিত্র বিদেশী, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। আর্থার পাইবাস, ডরোথি, সারা, স্যামুয়েল, অড্রি, লরা, রোজালিন, ডোনাল্ড— এমন সব উপন্যাসের চরিত্ররা দিব্যেন্দু পালিতের আর কোনো উপন্যাসে আসেনি। বিদেশী হলেও তারা কলকাতার বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যেমন, অড্রির সিঁথিতে সিঁদুর পড়ার বিষয়টি, অস্ট্রেলিয়ায় যাবার পরেও সারাদের কলকাতা শহরের জন্য মন খারাপ করা ইত্যাদি।

'আমরা' চরিত্রকথনমূলক উপন্যাস। উপন্যাসটির কথক চৌত্রিশ বছর বয়সী প্রিয়নাথ মজুমদার। পাঁচটি পর্বে বিন্যস্ত উপন্যাসটিতে কোনো কাহিনি কাঠামো নেই। উপন্যাসের ঘটনা বস্তুও বৃত্তাকারে এগিয়েছে। 'আমি তনুশ্রীকে ভালোবাসি, তনুশ্রী আমাকে, একদিন আমাদের বিয়ে হবে— ' এইভাবেই শুরু হয়েছে উপন্যাসটি। এরপরে প্রিয়নাথের মনে প্রশ্ন ওঠে, 'কী হে, ঠিক তো? ঠিক ভালোবাসা তো?' কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। শুধু গভীর এক আবেশে ভরে ওঠে তার বুক, নিঃশ্বাস হয়ে ওঠে এলোমেলো। তনুশ্রীর ভালোবাসা তার খুব প্রয়োজন। তাদের ভালোবাসার সম্পর্কটা বিবর্ণনীয় বলেই প্রিয়নাথ বুঝে উঠতে পারেনি।

> "সেতারের তারের মতো একটু ছুঁলেই এখন তা বেজে ওঠে টুংটাং শব্দে; তার শরীর, মন আর গন্ধের মৃদু কোরাস সারাক্ষণ বেজে যায় আমার রক্তে।"[৭]

প্রিয়নাথ তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে। দশবছর আগে যে ভাবনা প্রিয়নাথের মনে এসেছিল, দশবছর ধরে সেই ভাবনা একই পথের একাধিক বিন্দুতে ঘটে গেছে। কিন্তু ভাবনার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বৃত্তাকারে তার কাহিনির আবর্তন চলেছে। সে তনুশ্রীকে নিয়ে, কৌশিকের স্ত্রী মীনাকে নিয়ে, নয়নাংশুর স্ত্রী সুধাকে নিয়ে গল্প লিখতে চেয়েছে। সেইসব গল্পে জীবন চলমান কিন্তু প্রিয়নাথ তাতে অবগাহন করতে পারেনি। বিধবা অমলাদিকে নিয়ে যে গল্প লিখেছিল তাতে সম্পাদক মহাশয় তার গল্পকে ছাপতে নারাজ হয়েছিল। কেননা আজকাল আর 'বিধবা-টিধবা' নিয়ে গল্প চলে না, রোমান্টিকতা সবার পছন্দ। প্রিয়নাথ অমলাদির জীবনের গভীর রহস্য উন্মোচন করে। আলোচ্য উপন্যাসের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিণতি দেখাননি লেখক। প্রিয়নাথ, অমলাদি, তনুশ্রী, কৌশিক, বসন্ত দাস— সকলের মানসিক অভিপ্রায়কে বোঝাতে কাহিনির নামকরণও হয়ে যায় 'আমরা'। এই উপন্যাসের শেষটুকুও কবিতার মতো। টেক্সট ও কনটেক্সট এখানে বহুস্বরিক হয়ে ওঠে। 'আমি' আসলে এখানে তৃষিত, অচরিতার্থ। আর 'আমরা' বাখতিন্ কথিত 'ক্রনোটেপ অব এনকাউন্টার'। অতীত স্মৃতি এখানে এক গভীর অর্থ অর্জন করে। আর এখানেই দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের প্যারোটিডের বিশেষ অর্থ ক্রনোটোপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আপাত তুচ্ছ ঘটনা অন্য অর্থ পায়। উপন্যাসেও বিশেষ একটা রঙ এসে লাগে।

'সহযোদ্ধা' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের ধারায় একটি বিশিষ্ট সংযোজন। একটি সরলরেখা ধরে এই উপন্যাসের কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। পঞ্চাঙ্ক নাটকের মতো এর গঠন বিন্যাস। এর সূচনাংশে দেখা যায়, ভোরের আবছা আলোয় আদিত্য রায় ময়দানে একটি রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছে এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া; রাইজিং অ্যাকশন-এ— প্রবল মানসিক টানাপোড়েনে পুলিসকে হত্যাকাণ্ডের বিবরণ জানানো এবং পুলিস কর্তৃক ঘটনাটির মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়া; ক্লাইম্যাক্স-এ— মনে প্রবল সাহস নিয়ে খবরের কাগজে আদিত্য রায়ের সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে চিঠি লেখা; ফলিং অ্যাকশন-এ— আদিত্যকে পুলিসের ভয় দেখানো এবং নকশালপন্থীদের ধমক ও সাবধানবাণী; সমাধান অংশে— গভীর রাতে আদিত্যকে পুলিসের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া। উপন্যাসটির শেষেও আছে এক ধরনের নাটকীয় চমক। মনে হয় যেন অন্য এক ধরনের নাটকের শুরু হয়। কল্পনাবিলাসী ভীতু পাঠক আদিত্য রায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চমকে উঠতে পারেন। সাহসী

দৃঢ়চেতা পাঠক আদিত্য রায়ের দুঃসাহসী চেতনায় তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। আর যারা নীতিবান পাঠক তারা আদিত্য রায়ের নৈতিক লড়াইয়ের সহযোদ্ধা হয়ে ওঠেন।

দিব্যেন্দু পালিতের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী উপন্যাস 'অনুভব'। উপন্যাসটিতে রয়েছে আন্তর্জাতিক মনোভাব। আন্তর্জাতিক বাস্তবতাই উপন্যাসটির ধ্রুববিন্দু। ন্যারেটিভ ফর্মকেও লেখক এখানে ভাঙেন। উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখক বলেন—

> "Through her narration, I tried to get at the international reality. I had to break away from the narrative form, I intermingled the story with history, research findings and case studies and other facts."[৮]

রচনাশৈলীও বদলে যায় এখানে। লেখক টানা বর্ণনা না করে রিপোর্ট-এর গড়নটি যথাযথ রাখেন। সাতটি পরিচ্ছেদ থাকলেও পঞ্চম পরিচ্ছেদে কলগার্লদের যে কেস হিস্ট্রিগুলি লেখক তুলে ধরেছেন সেগুলি সংবাদপত্রের রিপোর্টের আকারে লিখিত। যেমন—

আই. এন. ভি./সি. জি.— ১০/৪

কন : এন. এন. পি. এম.

শকুন্তলা :

নাম : শকুন্তলা। ডাকনাম : খুকি (মা, বাবা ওই নামে ডাকত)। কল নাম : কুন্তী। বয়স : ৩৭। ঠিকানা : চেতলা (পুরো ঠিকানা বা রাস্তার নাম বলেনি; 'যারা এনেছে তারা জানে'), পার্ক সার্কাসে জনৈক ম্যাডামের ফ্ল্যাট থেকে অপারেট করে। টান টান চেহারা, স্বাস্থ্য ভালো। রং : পরিষ্কার (উজ্জ্বল শ্যাম)। মুখচোখ : সুশ্রী (আকর্ষণীয়ও বলা যায়), ঈষৎ ক্লান্ত, গালে ও কপালে দু' তিনটি বসন্তের দাগ আছে। উচ্চতা : ৫'-৪"। ('অনুভব', পৃ. ৮৯)

একইভাবে মায়া, পামেলা, রাজমীদেরও কেস হিস্ট্রিগুলি সাজানো। এইসব রিপোর্ট থেকেই কীভাবে নিজস্ব সিদ্ধান্তে বা অনুভবে পৌঁছে যায় আত্রেয়ী— তারই কথা 'অনুভব' উপন্যাসে আছে। টানা বর্ণনা না করে এই রিপোর্ট-এর ভঙ্গিটুকু দিয়েই পাঠকের মন আকর্ষণ করতে চান লেখক।

এই উপন্যাসের কাহিনি কখনো ভারবাহী হয়ে ওঠেনি। 'আমরা' উপন্যাসের প্রিয়নাথ যেমন কেন্দ্রে থেকে প্রধান ভাষ্যকাররূপে উপস্থিত, আত্রেয়ীর ক্ষেত্রে তেমন নয়। পরোক্ষ ভাষণে ও সক্রিয় দ্বিস্বর ভাষ্যে লেখকের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। এখানে সবচেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে বিষয় এবং বিষয়ের সত্যনিষ্ঠতা। প্রসঙ্গত লেখক বলেছেন—

> "My novel may fail to impress some, but the truth of the subject cannot fail. This could have been written in any Indian language or for that matter in any language the world over. I have mentioned the global dimensions of regional literature. My novel, successful or not, is one example of just that."[৯]

দিব্যেন্দু পালিতের ক্ষমতার পরিচয় তাঁর ভাষা সৃষ্টিতে, উপমা নির্বাচনে এবং চিত্রকল্পে। তিনি শিল্পগুণ বা ভাষাগুণ বলতে বুঝিয়েছেন সংযম। তিনি মনে করেছিলেন অতিকথন যে কোনো রচনারই বড়ো ত্রুটি। দিব্যেন্দু পালিত অনেকটা অঙ্কের ক্যালকুলেশন করে উপন্যাস রচনা করেছেন। গুণে গুণে শব্দ ব্যবহার করা তাঁর লেখার একটা বৈশিষ্ট্য। তাঁর লেখায় বাড়তি শব্দ যেমন নেই, তেমনি নেই বাড়তি উচ্ছ্বাস। এটা তাঁর লেখার প্রতি একটা সংযম, একটা জেদ। খুবই চমৎকারভাবে তিনি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে ব্যাখ্যা করেছেন। মনে হয় মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেলে তিনি কোনো সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছেন। আবেগপ্রবণহীন সেই সব লেখাগুলি অনেক সময় অধ্যায়হীন, পরিচ্ছেদ থাকলেও খুবই কম, পৃষ্ঠার সংখ্যাও অল্প। দিব্যেন্দু পালিত উপন্যাস লেখার সময় নিজেকে ভাষাশিল্পী হিসেবে দেখেছেন। সময়ের ধারাভাষ্যকার হিসেবে নয়। তিনি বলেছেন, "আমি উপন্যাস লিখেছি মূলত আমার সাহিত্যভাবনা, ভাষাভাবনা থেকেই।"[১০]

দিব্যেন্দু পালিত অপরূপ অনায়াসে পদসজ্জায় বৈচিত্র্য এনে বাংলা গদ্যকে নিয়ম-অনিয়মের বেড়া ভেঙে অপূর্বতা দান করেছেন। এই বৈচিত্র্য বিষয়ে তাঁর রচনা থেকে কয়েকটি বাক্য দেখানো হলো—

১. 'অনুভব' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে দেখা যায়— যৌগিক বাক্যের প্রথম অংশ শুরু কর্তৃপদ দিয়ে আবার শেষ অংশ সমাপ্তও হয়েছে কর্তৃপদ দিয়ে—

'আদিনাথরা বেরুচ্ছেন, ওঁদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছিল পম্পা'। ('অনুভব', পৃ. ২৯)

২. কর্তৃপদহীন বাক্য— 'আনন্দে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছিল'। ('ভেবেছিলাম', দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, পৃ. ১৭৭), 'এম ফিল করছিলাম। শেষ করতে পারিনি'। ('অনুভব', পৃ. ২৫)

৩. কর্মপদ দিয়ে বাক্য শুরু হয়েছে— 'তোমাকে তো জানি, তাই তোমার ওপর অনায়াসে বিশ্বাস করি, নির্ভর করি'। ('সিন্ধু বারোয়াঁ', দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, পৃ. ১৭) আবার, কর্মপদহীন বাক্য— 'আমি ঘামছিলাম'। ('ভেবেছিলাম', দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম পাচঁটি উপন্যাস, পৃ. ১৭৭)

দিব্যেন্দু পালিত এক সময় সক্রিয়ভাবে ভাষা চর্চা করেছেন। বাংলা ভাষা সবসময় ক্রিয়াপদ দিয়ে শেষ হতে চায়— করছি, খাচ্ছি, বলছি কিংবা করলাম, খেলাম, গেলাম, বললাম ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের এই ব্যবহারকে তিনি অনেকটা আড়াল করেছেন সচেতনভাবে। বাক্যের মধ্যে সেই ক্রিয়াপদকে কীভাবে লুকানো যায়, কীভাবে শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার থেকে ভাষাকে মুক্তি দেওয়া যায়— প্রথম থেকেই এই প্রচেষ্টা করে গেছেন। এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—

> "এই চেষ্টা করতে করতে আস্তে আস্তে আমার স্টাইলটাই এমন হয়ে গেছে যে লিখতে লিখতে কোথাও যদি এমন হয়, তখন কলমই থেমে যায়, ...সেই জন্য একই লেখায় কাছাকাছি জায়গায় আমি দুটো একরকমের বাক্য লিখি না। একটা বাক্য সবসময় আর একটা বাক্য থেকে আলাদা হয়। দুটো একই শব্দ ব্যবহার করি না।"[১১]

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে ক্রিয়াপদের ব্যবহার বৈচিত্র্য দেখলে অনায়াসে লেখকের ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বোঝা যাবে। যেমন, ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করেই বাক্য নির্মাণ করেছেন— 'হাতে ম্যাগাজিন, দৃষ্টি সেখানেও।' কিংবা 'বয়সটা ভয়ের'। ('সোনালী জীবন', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ১৪৫) একঘেয়েমিকতাকে দূর করতে বাক্যের মাঝখানে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'দুপুরে মেঝেয় মাদুর পেতে শোয়ার অভ্যাস আছে আহামরির। এবং ঘুমোনোর। শোয়া ও ঘুমোনোর মধ্যবর্তী সময়টুকু সে বই পড়ে...

ইদানীং মাঝেসাঝে একটা রঙচঙে কেচ্ছার ম্যাগাজিনও মাদুরে ছড়িয়ে থাকতে দেখেছে ব্রতীন, কখনোবা খবরের কাগজ'। ('চরিত্র', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৩১৯) বাক্যের শুরুতেও ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়— 'দেখল, সংলগ্ন বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে শ্বেতা'। ('সহযোদ্ধা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ২১)

কখনো কখনো সংযোজক অব্যয় দিয়ে বাক্য শুরু করেছেন— 'লীনা সেই অর্থটাই খুঁজলেন। এবং ভাবলেন, এসব খবর দেবার সময় লোকে কমিয়েই বলে'। ('অন্তর্ধান', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ৪৫৫), আবার কখনো কখনো সংযোজক অব্যয় দিয়ে বাক্য শুরু ও সংযোজক অব্যয় দিয়ে বাক্য শেষও করেছেন— 'এবং এরা যেহেতু নিজেদের সতীসাধ্বী স্ত্রীদের স্বাস্থ্য ও আয়ু রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারে না, সুতরাং সর্বজনসম্মতিক্রমে এদের কাজ হবে যতো সোমত্ত যুবতীদের ঢেঁড়া পিটিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে রেপ করা এবং— ' ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৩৯৯)

বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে একঘেয়েমি দূর করার জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের বাক্য গঠন করন। বাক্যের আকারের দিক থেকে দেখা যায় তিনি বাক্যকে ছোটো, বড়ো করেছেন। যেমন, পাঠকচিত্তে অনিশ্চয়তা বা সাসপেন্স সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি অনেক সময় দীর্ঘ শাখায়িত বাক্য ব্যবহার করেছেন—

> "পরের ভাবনায় ঢুকতে ঢুকতে রুচি ভাবল, যদি কখনও, কোনও কারণে দীপঙ্কর জেনে ফেলে যে শীমুর এসে পড়াটা মিথ্যে, একটা অজুহাত দেখিয়ে কথা বলাটা বন্ধ করেছিল রুচি, তাহলে তার সম্পর্কে কীরকম ধারণা হবে দীপঙ্করের! যার জন্যে হঠাৎ হলেও সারাক্ষণ টান অনুভব করছে এত, যার জন্যে জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও ক্যান্সেল করল নাগাল্যান্ডে যাওয়া, যার জন্য, হয়তো, এবং যতই গোপন করে রাখো, বাড়িতে ভোগ করছ অশান্তি— প্রবল উন্মাদনায় মুখ রেখেছ যার ঠোঁটে ও বুকে, যার শরীরে বিদ্যুৎ ঝলসে যেতে যেতে বলেছ এই অবস্থাতেই মৃত্যুর কথা ভাবা যায়— আই উড টু লাইক টু ডাই লাইক দিস; অর্থাৎ, যে তোমাকে এনে দিচ্ছে পৌরুষের পূর্ণতা, তাঁর মধ্যে কোথাও আছে ছোট্ট একটু মিথ্যা, যা মুহূর্তেই ধসিয়ে দিতে পারে সব ভাবনা, সব সম্ভাবনা, সব নির্ভরতা!"[১২]

চেতনাপ্রবাহরীতির প্রয়োগ দিব্যেন্দু পালিতের প্রায় সব উপন্যাসেই দেখা যায়। এই ধারার উপন্যাসে ঔপন্যাসিক অনেক সময় সরল বা শাখায়িত বাক্যের আশ্রয় করে এমন সব বাক্য অবলম্বন করেন যেগুলো বাক্য নয়, বরং বাক্যাংশ। শাখা-প্রশাখাযুক্ত জটিল বাক্যের পৃথুল রূপ আধুনিক কালের কোনো লেখকের পছন্দ নয়। পাঠকও আকর্ষণ অনুভব করতেন না। এই জন্য দিব্যেন্দু পালিত কখনো কখনো ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করেছেন। আবার কখনো কখনো একটি শব্দে একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন। যেমন—

১. 'সিঁড়ি। ফুটপাথ। শব্দ। কলকাতা। এবারেও কণাকে বেরুতে দিল আগে। মসৃণ গোড়ালি। মেয়েটি স্বচ্ছন্দ হোক'। ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৪১৫)

২. 'পেট্রোলের গন্ধ। কলকাতা। কলকাতার গন্ধ। শ্রীলার গন্ধ! চন্দনের গন্ধ! ঘুমের গন্ধ— ' ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৪৩৩)

৩. 'হেসে মাথা নাড়ল রজত। কামড়াবে। সুতরাং, প্রস্তুত থাকো'। ('উড়োচিঠি', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৪৩৩)

৪. 'এটা ধ্রুবর ফ্ল্যাট, সে-ই এগিয়ে এল। প্রথম'। ('আড়াল', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ১৪৯)

লেখক উপন্যাসের কাহিনি পরিবেশনের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করলেও সাধারণত ক্রিয়ার অতীত রূপের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কিন্তু উপন্যাসে কাহিনি পরিবেশনের ক্ষেত্রে একঘেয়েমি এড়াবার জন্য কখনো কখনো লেখক ক্রিয়ার কালের রূপ পরিবর্তন করেছেন। যেমন— 'অবেলায় ঘুমিয়ে পড়ার আগে আজ অনেক দিন পরে আবার ফিরে এসেছিল দৃশ্যটা'। ('চরিত্র', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৩২৭) — এখানে ক্রিয়াটি 'এসেছিল' অতীতকালের হওয়া সত্ত্বেও ক্রিয়ার কালবাচক বিশেষণটি হলো 'আজ'। 'আজ' শব্দটি এখানে 'যেদিনের কথা বলা হচ্ছে সেইদিন' অর্থে প্রযুক্ত। উপরন্তু এই প্রয়োগের ফলে সূক্ষ্ম বোধটি জাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ঘটনাটি অতীতকালের হলেও নিকট-অতীত কালের। দিব্যেন্দু পালিত শব্দকে আভিধানিক অর্থ গণ্ডীর বাইরে এনে প্রয়োগ করেছেন।

সহজ সরল গদ্য ভাষার উদাহরণ—

> "ছোট্ট কাচের জারে জড়াজড়ি করে বেঁচে থাকা মাছগুলোকে অ্যাকুইরিয়ামের বড়ো জলে উপুড় করে ছেড়ে দিলেই ডানার জড়তা কাটিয়ে আত্মহারা, তারা ছুটতে থাকে নানা দিকে। ওইভাবেই পেয়ে যায় যে যার নিজের রঙ ও পূর্ণতা। তারপর আবার ফিরে আসে পরস্পরের দিকে— মেতে ওঠে আলাপ, পরিচয়, ভালবাসা ও আক্রমণে।"[১৩]

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে ভাষা কখনো কখনো কবিত্বধর্মী হয়ে উঠছে। উপন্যাসে এসেছে গীতিময়তা ও মননশীলতা—

> ১. 'ক্রমশ নির্জন হয়ে আসে রাস্তা। মধ্যরাতে ঘুম থেকে হতচকিত জেগে ওঠার পর যেমন হয়, হঠাৎ থেমে-পড়া থেকে আস্তে আস্তে পুনরার্বিভূত হয় নিঃশ্বাস। দূর বেতারে সংযোগ স্থাপনের মতো একান্ত হাওয়ায় একটিমাত্র শব্দ ভেসে আসে আমার কানে, আস্তে আস্তে ঘুমের মতো ছড়িয়ে পড়ে রক্তের সর্বত্র। আছি, আছি'। ('আমরা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ১৮২)

> ২. 'মাঝরাতের বৃষ্টি বড়ো একা করে দেয়। একটানা অঝোর শব্দে জড়িয়ে থাকে এক ধরনের শূন্যতা— এই মুহূর্তে ভেবে নাও তুমি কে, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এতোকাল ভাবিত করেছ নিজেকে— কোন সম্ভাবনা ও বিশ্বাস বৃষ্টিতে আড়াল দিয়েছে তোমাকে, অসহ্য শীতে সস্নেহে চাদর জড়িয়ে দিয়েছে গায়ে? প্রখর সূর্যের নীচে শুষ্ক কাষ্ঠে যখন অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়েছিল, তখন কে উজাড় করে দিয়েছিল শুশ্রূষার জল?' ('সহযোদ্ধা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ৬০)

> ৩. এখনো মাঝে মাঝে বৃষ্টি নেমে আসে হঠাৎ; ধুলোর গন্ধ ভালোভাবে মরতে না মরতেই থেমে যায় আবার। তখন রোদ ওঠে, হালকা মেঘের সংস্পর্শ জড়ানো নীলবর্ণ আকশ উঠে যায় আরো উঁচুতে। হাওয়া দেয় ক্বচিৎ। তখন বোঝা যায় শীত এসে পড়বে ক্রমশ।" ('সোনালী জীবন', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ২৪০)

বিবৃতির ভাষাও উপন্যাসগুলিতে অনবদ্য হয়ে উঠেছে—

> "নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ একা— একার মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে আছে একটা জগৎ। সেখানে অন্য কোনও মানুষ নেই, কিংবা থাকলেও তাদের সকলেই মুখে আদিত্যর আদল। একই বয়স, সময় ও চৈতন্যের ভারে ঘাড় কুঁজো করে ছুটছে একজনের পিছনে আর একজন... সেখানে ঘটনা ঘটে না কোনও, কিংবা ঘটলেও সচকিত হয় না স্বাভাবিক পরম্পরায়— ওপরে উঠে কিংবা নীচে নেমে, এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে, একই মাকড়শা বুনে যায় বিভিন্ন জাল। অদ্ভুত যান্ত্রিকতায় সম্পন্ন হয় সব কিছু।...বই আর খবরের কাগজ পড়া আন্তর্জাতিকতার বোধে অহঙ্কারে ফেঁপে ওঠে বুক— দ্রুত হাতের সই পড়ে ভিয়েতনাম আর বাংলাদেশ বিষয়ে বিবৃতির নীচে।"[১৪]

কবি জীবনানন্দের কবিতার অনেক লাইন দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করে বাক্য গঠন করেছেন। যেমন— 'জানলা দিয়ে রোদ ঢুকছিল ঘরে; কচি লেবু-পাতার মতো নরম রোদ', 'ঝলমলে রোদ্দুরে কচি লেবু পাতার মতো একটা অস্ফুট আভা ছড়ানো', স্বচ্ছন্দে টেনে নিয়ে গেল লাশকাটা টেবিলে। দাগগুলো পড়ছে পরপর, রক্ত নয়', তখন ঘাস মাটি নির্জনতার গন্ধে আরো একটু বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস— পৃথিবী যতো পুরনো হয়, সে ততোই নতুন হয়ে ওঠে আরো', 'লাশকাটা ঘরের কাঁচের আড়ালের মধ্যে আরো পাঁচ-দশটার সঙ্গে ন্যাংটো করে সুইয়ে দিলে আপনিও সনাক্ত করতে পারবেন না', 'যদি কখনো সুযোগ হয়, এসো, বলবো, তোমাকে গভীর সেই সব অসুখের কথা— যার কোনো নিরাময় নেই; রক্তের গভীর থেকে ঘুণের মতো যা কেবল শেষ করে দিচ্ছে আমাদের!' ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পেরিয়ে একসময় আমরা ইংরেজি ঘেঁষা গদ্য পাই। বুদ্ধদেব বসুর লেখায় ইংরেজি-ঘেঁষা এক ধরনের ঝকঝকে গদ্য পাওয়া যায়। সেই গদ্যের অনুকারক তাঁর পরবর্তী অনেক গদ্যলেখকই। বুদ্ধদেব বসুর ছাত্র দিব্যেন্দু পালিতও এর ব্যতিক্রম নন। তবে দিব্যেন্দু পালিতের গদ্যে বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের প্রভাব নেই। দিব্যেন্দু পালিত মধ্যবিত্ত মানুষের মুখের ভাষায় বাংলার পাশাপাশি এনেছেন ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা। যেমন, হিন্দি ভাষার প্রয়োগ— 'আও জি, একসাথ মরে। উড স্ট্রিট জানে মে খুন হোগা, দমদম জানে মে নেহি'। ('সহযোদ্ধা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ১২), কিংবা, 'ওই গাছকে তলাসে বার হোকর লনসে চলা গিয়া— ' ('উড়োচিঠি', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি

উপন্যস-১, পৃ. ৫৪৫) আবার বাংলার সঙ্গে ইংরেজির মিশ্রণ ঘটিয়ে চরিত্রের মুখে সংলাপ দিয়েছেন। যেমন— 'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে মেখলার সঙ্গে ইলিসিট রিলেশানশিপ চালিয়ে রাহুল কীভাবে তোমাকে লেট-ডাউন করেছিল'। ('অনুভব', পৃ. ৩১), কিংবা, 'অফকোর্স, আমিও আজকাল পড়ি-টড়ি না। ইন দোজ ডেজ তুই ছিলি আমাদের প্রাইড'। ('আমরা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যস-১, পৃ. ১৪৯) দিব্যেন্দু পালিত চরিত্র অনুযায়ী মুখের ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসে অফিস কেরানি মৈমনসিং-এর অধিবাসী বামনদাসের উক্তি— 'দ্যাখেন গিয়া রাইটার্স কি নিউ সেক্রেটারিয়েটে ধর্না দিতেছে'। ('সন্ধিক্ষণ', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যস-১, পৃ. ৪৭) কিংবা, 'সোনালী জীবন' উপন্যাসে বড়বাবুকে সারার বর্ণনা দিতে গিয়ে সেপাই যে ভাষায় কথা বলেছে সেটা কেবল তার মুখেই মানিয়েছে— 'মিট্টি বোলিয়ে তো মিট্টি, আসমান বোলে তো আসমান— ফারাক নহি কর সকেগি। আর সাথ দেনে কা হ্যায় ভি কৌন! আপ জো ভি কাহা মান লেগি'। ('সোনালী জীবন', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যস-২, পৃ. ২৩১)

উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য এনেছেন দিব্যেন্দু পালিত। যেমন—

১. 'ক্ষুরের ফলার মতো উজ্জ্বল রোদে ফুটপাথ তেতে উঠেছে'। ('সিন্ধু বারোয়াঁ', দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, পৃ. ৩০)

২. 'আকাশে কাক-ডিম রং, যতদূর চোখ যায় আগাগোড়া সিসের পাতের মতো, কোথাও এতোটুকু চিড় খায়নি'। ('ভেবেছিলাম', দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম পাচঁটি উপন্যাস, পৃ. ১৯৭)

৩. 'ঝলমলে রোদ্দুরে কচি লেবু পাতার মতো একটা অস্ফুট আভা ছড়ানো'। ('প্রণয়চিহ্ন', দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, পৃ. ৩৮২)

৪. 'ঘামের মতো ঘুম গড়িয়ে পড়ছে শরীর বেয়ে'। ('সন্ধিক্ষণ' দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ১৭)

৫. 'অদূরে টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে কুমিরের মতো একাগ্র চিন্তায় ভাসতে থাকলো সে'। ('সন্ধিক্ষণ', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৩২)

৬. ‘এখন আর নিজেকে সার্কাসের বাঘের মতো মনে হয় না’। (‘সম্পর্ক’, দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ১১৬)

৭. ‘মশার মতো, নীরবে আমার শরীরে চলে আসছে তার রক্ত’। (‘আমরা’, দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ১৩৭)

৮. ‘ও-টিতে শুয়ে অ্যানাসথেসিয়ার জন্যে অপেক্ষা করার মতো অন্ধকার একটা অনুভূতি হামাগুড়ি দিয়ে ক্রমশ এগোচ্ছে শিরার ভিতর’। (‘বিনিদ্র’, দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ২৭৮)

৯. ‘ঢেউ-তোলা নদীর মতো কী একটা বয়ে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে, কখনোবা অল্প ধাক্কায় মাটি খসিয়ে যাচ্ছে পাড়ের’। (‘উড়োচিঠি’, দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৫১০)

১০. ‘অ্যাকোরিয়ামে বন্দি ছোট্ট মাছের মতো মুখ নাড়ছে অদৃশ্য কোনো স্পন্দন’। (‘স্বপ্নের ভিতর’, দশটি উপন্যাস-২, পৃ. ৪৩৬)

প্রতীক বা চিত্রকল্প প্রয়োগে দিব্যেন্দুর উপন্যাসে বারবার ফিরে আসে ভোর, সকাল, সন্ধ্যা, গভীর রাত্রি, রাস্তা, টেলিফোন, বৃষ্টি, সিঁড়ি ইত্যাদির প্রসঙ্গ। রাত্রি শেষ হয়ে সদ্য ফুটে ওঠা আলো আর উদাসীন হাওয়ার মধ্যে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্রগুলি নিজেদের চিনে নিতে থাকে। ভোরের রহস্যময় আলোছায়ার মধ্যেই কখনো স্বপ্নে জড়িয়ে পড়ে, কখনো স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে। এই ভোরই তাদের জানিয়ে দেয় তার পরের সময়, আসন্ন ভবিষ্যৎ। ‘সন্ধিক্ষণ’ উপন্যাসে দিনক্ষণ না জানা থাকলেও ‘এক ভোরের দিকে চলে গেলো কনক’। (‘সন্ধিক্ষণ’ দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ১১) তার পরের দিনগুলি আসে ঝিরঝিরে বৃষ্টির বিষণ্ণতায়। ‘বিনিদ্র’ উপন্যাসটি শুরুই হয় এভাবে, ‘জুনের প্রথম সপ্তাহে একদিন সকালে হঠাৎই একটু অবিন্যস্ত হয়ে পড়লো দীপ্ত’। (‘বিনিদ্র’, দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ২৫৯) বড়ো চাকরিজীবী সচ্ছল দীপ্তর জীবনে এমনই কোনো একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে, যা তাকে ভাবিয়ে তুলবে, অন্যমনস্ক করে রাখবে— তারই ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট। একটু পরে তাঁর কাছে চাকরিপ্রার্থী আসে, দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দটা হানা দেয় তাঁকে ও তার স্ত্রী জয়িতার মনেও। ‘অহঙ্কার’ উপন্যাসের সূচনায়ও দেখা

যায়, নিত্য অভ্যাসের ফলে ঘুম থেকে ওঠার জন্যে ঘড়িতে এলার্ম দেবার দরকার না হলেও বিমানের ভোরবেলা ঘুম ভাঙে অদ্ভুতভাবে এবং আচমকা। 'উড়োচিঠি' উপন্যাসে ভোর টুপুরের জীবনে এক নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। সদ্য মাতৃবোধে উত্তীর্ণ ছোটো বৌদির জন্য সারারাত নার্সিং হোমে কাটিয়ে টুপুরের মনে হয়, 'আজ ভোরে একেবারে অন্যরকম হয়ে উঠেছে আকাশ। ঠিক কী রকম বোঝা যায় না। তবে অন্যরকম। আগে কখনো চোখে পড়েনি, এমন'। এবং এই ভোরেই তার হঠাৎ মনে হয়, 'কে জানে কেন, মনে হলো, মেয়ে হলে মা হতে হয়'। ('উড়োচিঠি' দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৪৬১) এই ভোরের অনুভব থেকেই সে পরিপূর্ণতার দিকে এগোতে থাকে। আবার এই ভোর কারো জীবনে চলার গতিকে স্তব্ধ করে দেয়। 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসে আদিত্য রায় ভোরের আলো আধারেই খুন হতে দেখে বিহ্বল দৃষ্টিতে সংসারের দিকে তাকিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে বৃষ্টি একটা ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তবে বৃষ্টির প্রসঙ্গ তাঁর উপন্যাসে ভালোলাগার পরিবেশে আসেনি। সময়ের সঙ্গে মানসিকতার পরিবর্তনে বৃষ্টির রূপ বদলে গেছে। যেমন— 'সেদিন চৈত্রমাস' উপন্যাসে বৃষ্টির প্রসঙ্গ এসেছে এষার মনস্তত্ত্বের একটা বড়ো উপাদান হিসাবে। মধ্যরাতে একা যখন এষা সহপাঠী অমলেন্দুর স্মৃতিতে নিমগ্ন তখন এসেছে বৃষ্টির প্রসঙ্গ—

> "মধ্যরাতের বৃষ্টিতে কেমন একটা অসহায় ভাব থাকে। নিজের সমস্ত স্নায়ুতে বৃষ্টির কাতর শব্দ শুনেছিল এষা। বড় বড় ফোঁটায় ওর মুখ ভেসে গেল, বুক ভাসলো; ঘরের মেঝেয় পর্যন্ত জল গেল। একা বৃষ্টির সঙ্গে জেগে থেকে এষা বার বার একটি নাম উচ্চারণ করে। মনে মনে চাইছিল, যেন এই রাত্রি ভোর না হয়, এই বৃষ্টি না থামে।"[১৫]

বৃষ্টি দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের অনেক চরিত্রকেই ভাবিয়ে তুলেছে। 'আমরা' উপন্যাসে আকাশে মেঘ জমতে দেখলেই প্রিয়নাথের বুকের ভিতর কেমন একটা উত্তেজনা শুরু হয়ে যায়। 'হয়তো কিছু একটা ঘটবে, কিছু একটা ঘটতে পারে'। ('আমরা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ১৩৪) আবার 'বৃষ্টির পরে' উপন্যাসে অশোকের প্রবল বৃষ্টিতে তাঁর ভিতর ক্রমশ ঘনিয়ে ওঠে এক মন খারাপ করা অনুভূতি।

"জলের পর জলের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সহজেই এলোমেলো করে দেয় ভাবনাগুলো গুছিয়ে ভাবতে পারে না কিছু।"[১৬]

'অহংকার' উপন্যাসে অসুস্থ স্বামীর জন্য ডাক্তারের কাছে যাবার সময়ে খুব জোরে বৃষ্টি নামলে নীপার মনে হয়—

"এই বৃষ্টি শুভ নয়; বৃষ্টির আড়ালে জড়িয়ে আছে এমন কোনো তাৎপর্য, যা সে ধরতে পারছে না। শুধু ছুঁয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট একটা সম্ভাবনা।"[১৭]

'সহযোদ্ধা' উপন্যাসে অফিসে কাজ করতে করতে হঠাৎ বৃষ্টির শব্দে খাপছাড়া বোধ করে আদিত্য। বৃষ্টির মধ্যদিয়ে ভাবতে ভাবতে তার অস্বস্তি শুরু হয়। বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে আসে জানলার কাঁচ। তবু একটা দৃশ্য চোখে ভাসতে থাকে— পরিষ্কার ময়দান। সে জায়গাটায় সবুজ বড়ো বড়ো আঁশের ঘাসের ওপর অবিরল ঝরে চলেছে বৃষ্টি। বৃষ্টি এখানে শুধু বৃষ্টিই নয়, তার বিবেকের অবিরল ধারাপাতের প্রতীক। আবার বাড়িতে থাকার সময় মধ্যরাতের বৃষ্টি তাকে বড়ো একা করে দেয়। কারণ না থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' ভাবনা ঘিরে ধরে তাকে। উপন্যাসের শেষেও মুষলধারা বৃষ্টির রাতেই তাঁকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় পুলিস। শুধু আদিত্যকেই নয়, এই 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' ভাবনা ঘিরে ধরে 'ঢেউ' উপন্যাসের অপূর্বকেও। অপরেশ গুপ্তর হাতে রেজিগনেশন দিয়ে রাস্তায় নামতেই অপূর্বর 'ঝির ঝির বৃষ্টির মধ্যে প্রায় উদ্দেশ্যহীন যে অনুভূতি এলো তাঁর নাম শূন্যতা'। এই মুহূর্তে অপূর্বর মন তাকে অতীতেও যেতে দেয়নি, ভবিষ্যতেও না। আকাশের দিকে তাকাতেই বৃষ্টি চলে আসে। এইভাবে ঘটনা ঘটে যাবার আগে ও পরে বৃষ্টি নেমে এসেছে। বৃষ্টি দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে কখনো সুখের হয়ে আসেনি। কখনো রোমান্টিকতা আনেনি।

'ঘরবাড়ি' উপন্যাসেও বৃষ্টির জলে ধুয়ে যেতে দেখা যায় কাঁচ। সেই কাঁচ যার মধ্যে কার্পেটে মোড়া ঘরে হিমাদ্রি নিয়ে এসেছে ওর স্ত্রী জয়াকে মডেলিং করে কিছু উপার্জন করে তাদের ফ্ল্যাটবাড়ির শেষ কিস্তি শোধ দিতে। তাদের ভবিষ্যৎ যে স্বচ্ছ নয়— লেখক এই বৃষ্টির জলে ঝাপসা-হওয়া, ধুয়ে-যাওয়া জানলার কাঁচ দিয়ে বুঝিয়ে দেন। 'ঢেউ' উপন্যাসটি শুরু হয় বৃষ্টির রূপকল্প দিয়ে— 'এরকম হয় কখনো, বৃষ্টিঝরা আকাশের দিকে তাকালেও হঠাৎ ধাঁধা লাগে চোখে, মনে হয় বৃষ্টি নয়, রোদ্দুরই ঢুকে পড়েছে চোখে'। ('ঢেউ', দশটি উপন্যাস-

২, পৃ. ২৭৯) সমস্ত উপন্যাসটি জুড়ে বৃষ্টির ঢেউয়ের মতো কেউ কাউকে বুঝতে পারেনি। অপূর্ব বুঝতে পারেনি সীতাকে, সীতা বোঝেনি অপরেশকে, বিমলকৃষ্ণকেও বোঝেনি তার ছেলে। জীবনের চলার পথে খুবই জটিল হয়ে পড়েছে মানুষের স্বরূপ বোঝা। 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসে ধীমান তার স্ত্রীকে হারিয়েছে। বৃষ্টি পড়লেই তপতী, নীপা, গার্গীরা অতীত স্মৃতিতে ভেসে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে বৃষ্টি এইভাবে প্রতীক হয়ে ওঠে, কখনো সময়ের প্রতীক, কখনো নিজেকে চেনার প্রতীক।

রাস্তা দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে প্রবহমানতার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে। 'একা' উপন্যাসের শুরুতেই 'বারো দিন পরে একদিন সকালে রাস্তায় বেরিয়ে খুব ঝরঝরে বোধ করল শিশির'। ('একা', দিব্যেন্দু পালিতের দশটি উপন্যাস-১, পৃ. ৩৯৩) 'উড়োচিঠি'তে রজত দৌড়ে বেরিয়ে যায় রাস্তায়। পথ খোঁজে জীবনে চলার। 'মৌনমুখর'-এ বিধ্বস্ত তড়িৎ ঘরে না গিয়ে রাস্তা মুখো বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ব্রততীর মানসিক টানাপোড়েনে রাস্তা তাকে আরো ভাবিয়ে তুলেছে।

টেলিফোন-এর ব্যঞ্জনা 'অন্তর্ধান' উপন্যাসে সুশোভনের জীবনে ট্র্যাজেডি নিয়ে আসে। তার দাদা হার্ট আট্যাক করলে মেয়েকে পাঠিয়েছে দেখতে। কিন্তু সময় গড়িয়ে গেলেও মেয়ে বাড়িতে ফেরেনি। ফোন করতে গেলে টেলিফোনে ডায়ালটোন পায়নি সুশোভন। অপেক্ষার সময়টা নির্ভর করে টেলিফোনের ওপরে। কিন্তু টানা বেজে গেছে এনগেজ সাউন্ড। সুশোভনের ক্রমাগত রিং করার চেষ্টা একটা চাপ সৃষ্টি করে তার মনে। তখন থেকে শুরু হয়ে যায় নিজেকে আগলে রাখার চেষ্টা। আবার যখন বিপদ বাড়তে থাকে টেলিফোনেই শুনতে পায় তাদের মেয়ে পুতুলের অন্তর্ধানের ঘটনা। 'মাত্র কয়েকদিন', 'বহুদূর অভিমান' প্রভৃতি উপন্যাসেও টেলিফোনের ভাঙা ডায়ালটোনের ব্যঞ্জনা জীবনের ছন্দকে এলোমেলো করে দেয়। 'বহুদূর অভিমানে' রাজদীপ তার মায়ের টেলিফোনের লাইন পায়নি বলে প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। অধৈর্য এবং রাগে-অভিমানে সে মা-কেই দোষী ভেবেছে। জীবনের চলার মধ্যে যে শূন্যতা, যে নৈশব্দ 'মাত্র কয়েকদিন' উপন্যাসের সূচনায় সেই ব্যঞ্জনা টেলিফোনের বেজে যাওয়ার ইঙ্গিতে ধরা পড়ে—

> "টেলিফোন বাজছে অনেকক্ষণ ধরে। সময় নিয়ে, থেমে থেমে, কিন্তু রীতিমতো স্পষ্টতায়। স্বপ্নে যেমন বাজে কখনও, মনে হয় উদ্দেশ্যহীন, কাউকে চায় না; যান্ত্রিক

ক্লান্তিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেজে যায় শুধু। আবার, ওই শব্দে ঘুম ভেঙে যাবার মুহূর্তেই হারিয়ে যায় শব্দের রেশ। ফিরে আসে নৈঃশব্দ্য।"[১৮]

সিঁড়ি উপরে ওঠার জন্য। সকলেই জীবনে উপরে দিকে এগোতে চায়। জয়ার একটাই স্বপ্ন নিজের বাড়ি হবে, নিজের ছাদ হবে। সেই ছাদ থেকে আকাশ দেখবে। জীবনের সব আশা পূর্ণ হবে।

"মনের ভিতর পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে একটার পর একটা সিঁড়ি উঠে গেছে আকাশের দিকে, তার চারপাশে যে দেয়াল সেখানে শুধুই আঁকা নিজস্ব অধিকারের দিকে, এগোনোর চিহ্ন— দাগগুলো চিনে চিনে ক্রমশ কিন্তু নিশ্চিত ভাবে উঠে যেতে পারবে ওপরে।"[১৯]

কিন্তু ইচ্ছা যে গতিতে এগোয় সাধ্য ঠিক তা পারে না। সিঁড়ির প্রথম দিকের একটি ধাপেই পা রেখেই তাই সে জিরিয়ে নেয়। 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসে জয়ার জীবনসংগ্রাম এবং সাধ্য না থাকা সত্ত্বেও স্বপ্নে দেখা ইচ্ছাকে এইভাবে লেখক সিঁড়ির ব্যঞ্জনায় উপন্যাসের শুরুতেই তুলে ধরেছেন।

দিব্যেন্দু পালিত উপন্যাস সম্পর্কে একটা নতুন আঙ্গিকের খোঁজ করেছেন। তাঁর সমস্ত লেখা ছড়ানো নয়। খুবই কেন্দ্রীভূত এবং একটা বিশেষ বোধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে লেখাগুলি। এদিক থেকে তিনি কাফকা এবং কামুর অনুসারী। কাফকা এবং কামুর উপন্যাসগুলিকে যেমন পৃথিবীর মডার্ন ক্লাসিক বলা যায়, তেমনি দিব্যেন্দু পলিতের লেখাগুলিও ব্যতিক্রম নয়। দিব্যেন্দু পালিতের লেখাগুলিও আকারে ছোটো, চরিত্রে স্বল্পতা, ভাষা সংযম আর প্রচণ্ড মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে কবিত্ব এবং বর্ণনাকুশলাতাও।

তথ্যসূত্র :

১. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ১০২

২. পালিত, দিব্যেন্দু : মধ্যরাত, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩০৭

৩. পালিত, দিব্যেন্দু : প্রণয়চিহ্ন, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৫৭

৪. তদেব : পৃ. ৪৪৭

৫. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ১০৭

৬. দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত) : দিব্যেন্দু পালিতের মুখোমুখি, বইয়ের দেশ, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬, পৃ. ১২৩

৭. পালিত, দিব্যেন্দু : আমরা, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫ পৃ. ১২৯

৮. Palit, dibyendu : Writing : My Experience, Sahitya Academy Writers' Meet, Delhi, 24th February, 1999, p. 2

৯. তদেব : পৃ. ৩

১০. দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত) : দিব্যেন্দু পালিতের মুখোমুখি, বইয়ের দেশ, কলকাতা, জানুয়ারি - মার্চ ২০১৬, পৃ. ১২৪

১১. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি - মার্চ ২০০৩, পৃ. ১২৩

১২. পালিত, দিব্যেন্দু : আড়াল, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ১৯৪

১৩. পালিত, দিব্যেন্দু : সহযোদ্ধা, দশটি উপন্যাস - ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ১৬

১৪. তদেব : পৃ. ৪৮

১৫. পালিত, দিব্যেন্দু : সেদিন চৈত্রমাস, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২০

১৬. পালিত, দিব্যেন্দু : বৃষ্টির পরে, দশটি উপন্যাস - ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫ পৃ. ১৮৭

১৭. পালিত, দিব্যেন্দু : অহঙ্কার, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫ পৃ. ৬০৬

১৮. পালিত, দিব্যেন্দু : মাত্র কয়েকদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৭

১৯. পালিত, দিব্যেন্দু : ঘরবাড়ি, দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৭৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমকালীন বাংলা উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিতের স্বাতন্ত্র্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে বলেছেন—

> "সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে-ভাবকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ; সেই ভাবটি যে বিশেষ রূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্য। বিষয়ে কোনো অপূর্বতা না থাকতে পারে, সাহিত্যে হাজার বার যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোনো দোষ নেই, কিন্তু সেই বিষয়টি যে-একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা।"[১]

বাংলা সাহিত্যে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুর। বর্তমানেও অনেক লেখক নগর কলকাতার মধ্যবিত্ত বা গ্রামীণ মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকথা অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করছেন। কিন্তু, এত সংখ্যক ঔপন্যাসিক এবং তাঁদের উপন্যাসের মধ্যেও দিব্যেন্দু পালিত আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। দিব্যেন্দু পালিত মূলত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত তিনি মধ্যবিত্ত মানুষের সংকট, হতাশা, নরনারীর দাম্পত্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, স্বপ্ন ও ব্যর্থতা, অস্তিত্বের সংকট ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্য কোনো ঔপন্যাসিককে এতোটা দীর্ঘ সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের স্তরকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করতে দেখা যায়নি। সুতরাং দিব্যেন্দু পালিত বাংলা উপন্যাস জগতে স্বতন্ত্র আসন পাবার যোগ্য দাবিদার।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অন্যান্য ঔপন্যাসিক বিশেষকরে মতি নন্দী (১৯৩১-২০১০), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০১), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০৫), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫-), একটু বয়সে বড়ো বিমল কর (১৯২১-২০০৩), রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮) প্রমুখদের রচনায় মধ্যবিত্ত মানুষের সমস্যা প্রধান হয়ে উঠেছে। এই অধ্যায়ে দিব্যেন্দু পালিতের সমকালীন, কিছু আগে কিংবা পরের কয়েকজন ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে দিব্যেন্দু পালিতের স্বতন্ত্রতার পরিচয় তুলে ধরা হবে। যেমন, রমাপদ

চৌধুরীর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত মানুষের নানা ভাঙা-গড়ার সাক্ষ্য রয়েছে। ১৯৬২ সালে লেখা তাঁর 'আরো একজন' উপন্যাসে দেখা যায় আপাত সুখী সচ্ছল দাম্পত্য জীবনের গোপন রন্ধ্রপথ দিয়ে তৃতীয় একজনের ঢুকে পড়া, পুরুষের বহুগামিতা, নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন-সংসর্গ ইত্যাদি বিষয়। আবার মতি নন্দীর 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান' (১৯৬৯), 'দ্বাদশ ব্যক্তি' (১৯৭০) ইত্যাদি উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জীবন সংকট ধরা পড়ে, তেমনই আবার সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'একক প্রদর্শনী' (১৯৭০), 'এখন আমার আর কোনো অসুখ নেই' (১৯৭৬) ইত্যাদিতে আতঙ্ক, মৃত্যুভয় বা হতাশা মধ্যবিত্ত জীবনকে নানভাবে উদ্‌ভ্রান্ত করে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে অসুখী দাম্পত্য, অবাধ যৌনতা, বহুগামিতা বড়ো জায়গা করে নিয়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে বহুগামিতার প্রসঙ্গ এসেছে একটা সংকট থেকে। আর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রেম-যৌনতা এসেছে সাময়িকভাবে। আবার বিমল করের রচনায় মৃত্যুভয়ের চিত্র আছে, কিন্তু দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে মৃত্যুভয় নেই। পরিবর্তে দিব্যেন্দু পালিতের রচনায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বেঁচে থাকার তীব্র লড়াই চালিয়েছে তাঁর চরিত্ররা।

সাতের দশকের যুদ্ধ, বামপন্থীদলের অন্তর্বিরোধ ও ভাঙন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ইত্যাদি স্বাধীনতা-পরবর্তী সামাজিক অবক্ষয়ের চেহারাটাকে আরো বেশি করুণ করে তুলেছিল। ফলে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের বিক্ষোভ ও কষ্ট, মেরুদণ্ডহীন সমাজব্যবস্থার নঞর্থক আগ্রাসী শক্তির নিকট আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিল সাধারণ মানুষ। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার অনিবার্য প্রতিফলন এসেছিল। যে ব্যক্তি এতোদিন তার চারপাশের সমাজকে দেখছিল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, সে এখন নিজেকে দেখতে শুরু করেছে। এই দৃষ্টি বদলের প্রাথমিক দায়িত্ব বহন করেছিলেন বিমল কর। তিনি ব্যক্তিমানুষের মনের গভীরতর কথাকে সাহিত্যে তুলে এনেছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি গল্প-উপন্যাসে নতুন রীতি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে স্ব-কৃত আত্ম-প্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটেছে। তাঁর রচনায় স্বীকারোক্তির পথে, চেতনায় মগ্ন ভাবপ্রবাহের পথে প্রকাশিত হয়েছে সমাজ ও বাস্তবের খণ্ডিত দৃশ্য। আর সেই সঙ্গে মানুষের অন্তর্লোকের উদ্‌ঘাটন। এক জটিল সূত্রে গ্রথিত অন্তর ও বাহিরের প্রকাশ ঘটে। 'দেওয়াল' উপন্যাসে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ভেঙে যাওয়া সমাজে নৈতিক পতন ও মূল্যবোধের ভাঙনের মধ্যে একটি নিম্নবিত্ত পরিবার কীভাবে বেঁচে থাকতে চাইছে তারই ছবি

তুলে ধরেছেন। চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষের ন্যায়-নীতি, প্রেম-ভালোবাসা বেঁচে থাকে। সুধা এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। পিতৃহীন সংসারের সব দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। চারিদিকে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মধ্যে একদিকে সুধা নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে চায়, অন্যদিকে তার মনের সহজ শুদ্ধ প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা রাখতে চায়। সে সুচারুকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসাটুকু নিয়েই সে বেঁচে থাকতে চায়। নিরন্ন পরিবারের সমস্ত ভার বহন করে সে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই শারীরিক ব্যাধি কিন্তু তার মনে ছড়ায়নি। তাই একদিকে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য, অন্যদিকে প্রেমিকের কাছে ফিরে যাবার বাসনা— এই দুইয়ের টানাপোড়েনে সুধার ভিতরে এক অদ্ভুত সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সত্তার এই সংকটে ক্ষতবিক্ষত সুধা অবশেষে প্রেমিককেই গ্রহণ করার জন্য রাজি হয়েছে। সুধার প্রেম এখানে জয়লাভ করেছে। সুধার বাঁচার আগ্রহই বড়ো হয়ে উঠেছে—

> "আমার খুব একটা মোহ আর কিছুতেই নেই... কিন্তু মায়া আছে। বাঁচার ইচ্ছেও। মরে না যাওয়া পর্যন্ত বাঁচতে হবে।"[২]

সুধার প্রেমিক সুচারুও যুদ্ধে গিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়লে সুধার কাছে ফিরে এসেছে। যে যুদ্ধে জীবন দেওয়ার জন্য তৈরী ছিল, সে এখন সুধার প্রেমের প্রতি প্রবল আগ্রহ নিয়েই জীবনে বেঁচে থাকার সংকল্প নিয়েছে। আর সুধার ভাই বাসু তার ভিতরের পাপবোধকে ধিক্কার জানিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। নিজেকে সে শুদ্ধ করতে চায়। এই শুদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা, আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা। কথাশিল্পী বিমল কর এখানে আধুনিক মানুষের মূল্যবোধের নানা রূপান্তরকে তুলে ধরেছেন। দিব্যেন্দু পালিত কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে কোনো উপন্যাস রচনা করেননি।

বিমল করের 'অপরাহ্ন' উপন্যাসটির সঙ্গে দিব্যেন্দু পালিতের 'আড়াল', 'অবৈধ', 'স্বপ্নের ভিতর', 'অনুভব' প্রভৃতি উপ্যনাসের ভাবগত কিছুটা মিল আছে। নারীপ্রধান এই উপন্যাসগুলিতে বিমল কর ও দিব্যেন্দু পালিত মেয়েদের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অপরাহ্ন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কমলা। চল্লিশোত্তর বয়সে সে এক সমস্যার মুখোমুখি হয়। স্বামী-বঞ্চিতা, লাঞ্ছিতা কমলা জীবনে বহু সংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে কন্যা অরুণা ও পুত্র কল্যাণকে নিজের মতো মানুষ করতে চায়। সে সেবিকার কাজ করলেও আত্মসম্মান নিয়ে সংসারে বেঁচে থাকতে চায়। সেই কমলার ভিতরে সন্তানের প্রতি মমতার

পাশাপাশি প্রেমসত্তাও দেখা দেয়। তার মাতৃসত্তার থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে নারীসত্তা। সে সত্তা পুরুষের সান্নিধ্য কামনা করে। দিব্যেন্দু পালিতের উপরিউক্ত উপ্যনাসগুলিতেও মাতৃসত্তার থেকে বড়ো হয়ে উঠেছে নারীসত্তা। রুচি, জিনা, অর্পিতা, বিশাখা কিংবা আত্রেয়ী— এরা পত্নীত্বে বা মাতৃত্বে নয়, নারীত্বেই খুঁজতে চেয়েছে তাদের ঠিকঠাক পরিচয়। এই খোঁজা 'অপরাহ্নে'র কমলার ক্ষেত্রেও যেমন সর্বাংশে সফল হয়নি, তেমনি দিব্যেন্দু পালিতের মেয়েদের ক্ষেত্রে সফল হয়নি। যৌবনে কমলা স্বামীর প্রেম-ভালোবাসা পায়নি। তাই তার বুভুক্ষু মন প্রায় প্রৌঢ় বয়সে এসে অবিনাশকে গ্রহণ করতে চায়। কমলার এই প্রেম পরিবারের সকলের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তখন সে সকলের অমর্যাদার পাত্রী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দিব্যেন্দু পালিতের 'অবৈধ' উপন্যাসের জিনাও স্বামীর ভালোবাসা না পেয়ে প্রেমিক পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। তবে প্রণয়ীর দ্বারা জিনা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতো মিল থাকা সত্ত্বেও দুজন লেখকের মধ্যে চরিত্রকে বিশ্লেষণ করার দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। একদিকে সন্তানদের প্রতি তীব্রটান, অন্যদিকে প্রেমিক পুরুষ অবিনাশের প্রতি মোহ কমলার মনে এক জটিল সংকটের সৃষ্টি করেছে। কমলার নিঃসীম যন্ত্রণা আত্ম-অন্বেষণের ভিতর দিয়ে মুক্তি খুঁজেছে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে কমলা একা, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। অপরদিকে জিনা স্বামী অসীম ও প্রেমিকপুরুষ পার্থ— এই দুই পুরুষের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয়। স্বামী ও প্রণয়ীর দ্বারা বৈধ ও অবৈধভাবে 'ব্যবহৃত' জিনা তাই অবলম্বন হতে চায় বিকলাঙ্গ শিশুদের। সে ক্রমশ আত্মধিক্কারে নিজেকে চিনেছে। এভাবে দিব্যেন্দু পালিতের নারী চরিত্ররা আত্মবিশ্বাসে টিকে থেকেছে। মেয়েরা বেঁচে থাকার জন্য স্বনির্ভর হয়েছে। স্বামী-সংসার-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকবার জন্য আলাদা জমি খুঁজেছে। এক ধরনের অদম্য আত্মবিশ্বাস তাদের পৌঁছে দিয়েছে কোথাও, যেখানে তারা অন্যের জন্য বাড়িয়ে দিতে পারে সাহায্যের হাত। এখানেই বিমল করের সঙ্গে দিব্যেন্দু পালিতের পার্থক্য।

বিমল করের 'খোয়াই', 'কেরানী পাড়ার কাব্য' প্রভৃতি উপন্যাসে প্রকরণের চমক দেখা যায়। তাঁর স্বকীয়তা দেখা যায়— 'খড়কুটো', পূর্ণ-অপূর্ণ', 'গ্রহণ', 'পরিচয়', 'ভুবনেশ্বরী' প্রভৃতি উপন্যাসে। বিমল কর অবিরাম জীবনের সন্ধান করে গেছেন। জীবন কী? জীবন কেন? জীবনের কেন্দ্রবিন্দু কোথায়? কোন আদর্শ থেকে শুরু হচ্ছে জীবন? শেষ হচ্ছে কোন পূর্ণতায়? এসব প্রশ্ন তাঁকে মথিত করেছে। আত্মমুখি মৃত্যুচিন্তাগ্রস্ত প্রশ্নকুশলী বিমল করের উপন্যাসে জীবন অন্বেষণ পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। 'পূর্ণ-অপূর্ণ' (১৯৬৭) উপন্যাসে তিনি

মানুষের জীবনে পূর্ণতার সন্ধান করেছেন। মানুষের জীবন অপূর্ণ। স্বভাবতই তার যাত্রা পূর্ণতার দিকে। মানুষ কীভাবে সে পথে যাবে? তার জীবনে এতো জটিলতা ও মালিন্য এসে গেছে যে তার ফলে জীবনে অবিশ্বাস আর ঘৃণারই প্রাধান্য। ফলে চোখের সামনে ভালোবাসাকে ক্ষয়ে যেতে দেখেও মানুষ অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। পূর্ণের সন্ধান একালের মানুষকে কে দেবে? সাহিত্যিক বিমল কর তা দিতে চেয়েছেন এই উপন্যাসে। সুরেশ্বর, অবনী, ললিতা, হৈমন্তী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যদিয়ে লেখক পূর্ণতার অন্বেষণ করেছেন। এরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিজীবনে আঘাত প্রাপ্ত মানুষ। উচ্ছ্বাস, ভাবাবেগ পেরিয়ে তারা এমন এক স্তরে উপনীত যেখানে রোমাঞ্চ নেই, রহস্য নেই, পরিবর্তে আছে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধ। পরিণত মানুষের অস্তিত্ববোধ হয় এই দায়িত্ব-কর্তব্যভিত্তিক সংযত ভালোবাসায়।

আবার 'গ্রহণ' উপন্যাসে বিমল কর মানুষের সঙ্গে মানুষের জটিল সম্পর্ককে রূপায়িত করেছেন। উপন্যাসের প্রধান চারটি চরিত্র পারস্পরিক জটিল সম্পর্কে আবদ্ধ। সেই জটিল সম্পর্ককে তারা ছাড়াতে চায়, কিন্তু পারে না। লেখক এভাবেই মানবজীবনের পর্যালোচনা করেছেন। অপরদিকে দিব্যেন্দু পালিত নরনারীর সম্পর্কের জটিলতাকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বিশেষকরে বিবাহ পরবর্তী দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়। দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যাবার পর চরিত্ররা নিজেদের কথা ভেবেছে। নিজেদের ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা ভেবেছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় মানসিকতা ধরা পড়েছে। স্ত্রী ঘরের বাইরে বের হলেই তাদের সন্দেহ করেছে। কিন্তু নারীরা পুরুষের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চায়নি। তারাও বিশাল বিশ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।

রমাপদ চৌধুরীও কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলি হলো— 'লালবাঈ' (১৩৬৩), 'আরো একজন' (১৩৬৯), 'বনপলাশির পদাবলী' (১৯৬২), 'পরাজিত সম্রাট' (১৯৬৬), ' এখনই' (১৩৭৬), 'খারিজ' (১৯৭৪), 'লজ্জা' (১৩৮৩), 'সাদা দেওয়াল' (১৯৯৪) প্রভৃতি। রমাপদ চৌধুরীর প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর' (১৩৬১)-এ ছেলেবেলায় কাটানো রেলশহরের জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। পরিণত বয়সে ট্রেনে যেতে যেতে উপন্যাসের কথক আমি-র হঠাৎই দেখা হয়েছে এক বাল্যসঙ্গিনীর সঙ্গে। উপন্যাসে শেষপর্যন্ত কথক তাকে চিনতে না পারলেও কথায় কথায় সে-ই জাগিয়ে তুলেছে তার শৈশব স্মৃতি। রমাপদ চৌধুরীর পরের উপন্যাস 'লালবাঈ'-এ

উঠে এসেছে বিষ্ণুপুরের ইতিহাস। উপন্যাসে অওরঙ্গজেবের শাসনাধিনে বাংলাদেশের পটভূমিতে তিনি লালবাঈ, রঘুনাথ ও চন্দ্রপ্রভার কাহিনিকে রূপ দিয়েছেন। 'অরণ্যে আদিম' উপন্যাসে উঠে এসেছে ভারতবর্ষের যন্ত্রযুগের প্রেক্ষাপটে রামগড়, আরগাতা প্রভৃতি অঞ্চলের অরণ্যের জীবনকথা। দিব্যেন্দু পালিত এইরকম ইতিহাস কিংবা অরণ্যজীবন নিয়ে উপন্যাস লেখেননি। পরবর্তীকালে রমাপদ চৌধুরী বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত জনমানসকেই তুলে ধরেছেন। যদিও 'বনপলাশির পদাবলী' গ্রামজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত। তবুও সেখানে মধ্যবিত্ত সমস্যাকেই মূল হিসেবে দেখানো হয়েছে। রমাপদ চৌধুরী এই মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হিসেবে নিজেই বলেছেন—

> "দরিদ্র বা সমাজের দুঃখের কথা বললেই কি বেশি সমাজ সচেতন হওয়া যায়? নাকি আমরা নিজেরা মুখে তাদের জন্য দরদ উঠলে দিয়ে নিজের বালক ভৃত্যটিকে কিভাবে রাখি; সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখালে বেশি সমাজ সচেতন হওয়া যায়? আসলে আত্মদর্শন, একজন মানুষকে তার ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা বা অসহায়তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখায়। তবে মানুষের ভাল করার কোন শর্ত নিয়ে আমরা সাহিত্য করিনা। শিল্পকর্মটাই প্রধান। সাহিত্য আসলে লেখকের আত্মদর্শন এবং সমাজদর্শন।"[৩]

তাই 'খারিজ', 'বাহিরি', 'লজ্জা', 'বাড়ি বদলে যায়', 'ছাদ' প্রভৃতি উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। 'খারিজ' উপন্যাসে একটি শিশুশ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। শিশুটি যে পরিবারে কাজ করতো সেই পরিবারটি শিশুটির পিতার প্রতি সহানুভূতি দেখানোর পরিবর্তে নিজেরা কীভাবে পুলিসের হাত থেকে, কোর্টের শাস্তির হাত থেকে বাঁচবে তার তাগিদেই যেন বেশি। বাড়িতে শিশুশ্রমিক রাখা নিষেধ জেনেও জয়দীপ ও অদিতি চাকর হিসেবে রেখে দিয়েছিল শিশুটিকে। বাড়ির মালিকের রান্নাঘরে ভেন্টিলেটর না লাগানোয় রাত্রে রান্নাঘরে দুর্ঘটনা বসত শিশুটির মৃত্যু হয় অথচ বাড়ির মালিক নিশিথবাবুও তার দায় নিতে চায় না। কথক জয়দীপের কথায় ফুটে উঠেছে মধ্যবিত্ত মানসিকতার রূপটি—

"মধ্যবিত্ত মানুষগুলো কি ভয়ঙ্কর ক্রিমিন্যাল। বড়লোকদের মতই। বিশ্বচরাচরে কোথায় কি অনাচার অবিচার চলছে সে বিষয়ে সব সময় সচেতন, শুধু নিজের গৃহকোণটির বেলায় একেবারে অন্ধ।"[৪]

'বাহিরি' উপন্যাসে মধ্যবিত্তের মুল্যবোধের অবক্ষয়ের আর একটি চিত্র দেখা যায়। পুরীতে রথযাত্রা দেখতে গিয়ে গল্পকথক সঞ্জয়ের মা দয়াময়ী ও বাবা সুধাময় দয়া করে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসেন একটি ছোট্ট ভিখিরি ছেলেকে। তার নাম দেন বংশীধর। বাড়িতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুধাময় পড়াশুনা করার জন্য তাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। তাদের দয়াদাক্ষিণ্যের দ্বারা সেই ছেলেটি বড়ো চাকরি পেলে, ভালো জায়গায় গেলে তাদের যেন কোথাও বাঁধে। মধ্যবিত্ত সমাজ চায় না বা পারে না তাদের কাছে টেনে নিতে। 'দাগ', 'লজ্জা' উপন্যাসে দেখা যায় মধ্যবিত্ত সমাজের আর এক চিত্র। মধ্যবিত্ত সমাজ যে তাদের অসহায়তা, সংকীর্ণতা ইত্যাদি সমস্ত কিছু গোপন করতে সদা ব্যস্ত তাই এই দুটি উপন্যাসে দেখা যায়। মফঃস্বলের ছেলে অনিমেশ কলকাতায় আসে পড়াশুনার জন্য। কলকাতার অ্যাডভোকেট পিশেমশাইয়ের বাড়িতে অনেকদিন থেকেও তাদের আপন হয়ে উঠতে পারেনি। সে যেন একজন আউটসাইডার। তাই পিসিমার বিবাহিত মেয়ে রেনু যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন সংসারে যে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে তা অনেক চেষ্টা করেও অনিমেশ জানতে পারেনি। রেনুর স্বামী অরুণের কাছে সে জানতে পারে রেনুর অস্বাভাবিক আচরণের কথা। এই একটি ঘটনাই নাড়িয়ে দেয় মধ্যবিত্ত সমাজের সৌখিন মানবতাবোধকে। তাই অনিমেশ দেখে রেনুর পাগলামির কথা যাতে মক্কেলরা না জানতে পারে সে ব্যাপারে পিসেমশাই সচেতন। প্রতিবেশীরা যাতে কোনোভাবেই জানতে না পারে সেদিকে পিসিমা ভীত সন্ত্রস্ত। আবার টুনটুনও তার বন্ধুদের কাছে সাবধানী দিদির পাগলামির ব্যাপারে। যেন বাড়ির মেয়ের পাগল হয়ে যাওয়ার দুঃখ যন্ত্রণার চেয়ে বাইরের লোকের কাছে জানাজানি হওয়ার লজ্জা আরো বেশি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দিব্যেন্দু পালিতের 'অনুসরণ' এবং 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসদুটি আলোচনা করা যেতে পারে। এই দুটি উপন্যাসেও দেখা যায় মধ্যবিত্ত মানুষের লজ্জাকে ঢেকে রাখার গোপনীয়তা। 'অনুসরণ' উপন্যাসে এষা দুর্বৃত্ত কর্তৃক অপহৃত হওয়ার পর তার স্বামী অনীশ দত্ত কাউকে বিষয়টি বলেনি। সে পেশায় সাংবাদিক। ইচ্ছে করলেই

খবরটি সংবাদপত্রে দিতে পারত। কিন্তু না করে সে স্মৃতির মধ্যেই আচ্ছন্ন থেকেছে। অফিসের সহকর্মী কিংবা বাড়ির পরিচারিকা পর্যন্ত জানতে পারেনি। 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসেও একই ঘটনা ঘটেছে। ধীমান তার অপহৃত স্ত্রীর কথা একবারও ভাবেনি। তার স্ত্রীকে খোঁজার পরিবর্তে সে অন্য নারীর প্রতি আকর্ষিত হয়েছে। নিজের স্বার্থপরতা, ভণ্ডামির পরিচয় দিয়েছে। মধ্যবিত্ত মানসিকতাসম্পন্ন চরিত্রগুলি রমাপদ চৌধুরী কিংবা দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে এভাবেই ফুটে উঠেছে।

রমাপদ চৌধুরীর থেকে দিব্যেন্দু পালিতের স্বতন্ত্র ধরা পড়েছে চরিত্রগুলিকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যে। দিব্যেন্দু পালিতের 'অনুসরণ' কিংবা 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসের অনীশ বা ধীমান শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থপরতা, পাপবোধ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেনি। তারা এই জটিল যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আর রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের চরিত্ররা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছে। কোথাও তাদের মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে বা তাদের কাছে সাম্প্রদায়িক ভাবনা বড়ো হয়ে উঠেছে। যেমন 'ছাদ' ও 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসদুটিতে মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাপত্তার অভাব ফুটে ওঠে। ভাড়াটে জীবনের নিরাশ্রয়তা প্রধান হয়ে ওঠে।

যে কঠিন কদাকার সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি বিধ্বস্ত, সেই সমাজের অখণ্ড ছবি না এঁকে সাহিত্যে শোনানো হয় দলিত বিধ্বস্ত মানুষের অন্তর্লোকের আর্তনাদ। বাইরের লোকসমাজ ও ঘটনা টুকরো টুকরো প্রতীকী হয়ে পড়ে এসময়। তবে তাতে ব্যক্তির মগ্ন চৈত্যন্যকে নাড়া দেওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সর্বজনীন কোনো অভিঘাত সৃষ্টি হয়নি। এই অভিঘাতের কথা শোনান সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকরা। তাঁরা দেখিয়েছেন মানুষের স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। তাঁরা যে অল্পবয়সী যুবক-যুবতীদের স্বপ্নভঙ্গের কথা বলেছেন দিব্যেন্দু পালিতও সেই কথাই তুলে ধরেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পারাপার' কিংবা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাসে দেখা যায় যুবক-যুবতীরা জীবনের মানে খুঁজতে চেয়েছে নিজেদের মতো করে। তারা জীবনের অর্থকে একটা সংজ্ঞায় বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাদের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে। দিব্যেন্দু পালিতের দ্বিতীয় উপন্যাস 'ভেবেছিলাম'-এর কথক যুবকও এদের সমগোত্রীয়। নামহীন এই

যুবকেরও আশা ও আশাভঙ্গতাই মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত জীবনে, চাকরি জীবনে, এমনকি প্রেম জীবনেও সে সফল হতে পারেনি। জগৎ ও জীবন তার কাছে এক নৈরাশ্যতার সৃষ্টি করেছে। ছোটোবেলা থেকে জগৎ ও জীবনের প্রতি তার যে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। যুবক বয়সে চাকরিহীনতায় বেকারত্বে তার দিন কাটে। কর্মহীন যুবকের কাছে পৃথিবীর সবকিছু তখন অন্ধকার হয়ে আসে। প্রেমিকাকে বিয়ে করতে পারে না। পারে না নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করতে। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়কার লেখকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন—

> "স্বপ্ন রচনা করার ক্ষমতা তাঁদের নেই, স্বপ্ন উপভোগ করার সময় তাঁদের নেই। তাঁরা জন্মেছে ভাঙা স্বপ্নের হাটে, তাদের চারপাশে বহু ভগ্ন মূর্তির জঞ্জাল।"[৫]

'সিন্ধু বারোয়াঁ'র সৌম্যও আপাত বেকারত্বের জ্বালায় বিয়ে করতে পারেনি। প্রেমিকা অরুন্ধতী বিয়ের কথা বললে সে পালিয়ে গেছে। সৌম্য নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছে। অরুন্ধতীর বিয়ের পর সৌম্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছে। তার জীবনে অরুন্ধতীর প্রেম কোনো রাস্তা দেখায়নি। বিবাহ পরবর্তী জীবনে অরুন্ধতীও সুখী হতে পারেনি। একধরনের চাপা অভিমান নিয়ে সে বিভাসের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। বিভাসও বিবাহের পর যে সুখ পেতে চেয়েছিল তা কোনোদিনই পায়নি। আসলে প্রত্যেকটি চরিত্রই এখানে সময়ের অন্তর্ঘাতে লাঞ্ছিত। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে বলেছেন—

> "সময়ের হাত পড়েছে গত কয়েক বৎসরের বাংলা উপন্যাসে। ব্যক্তি ও সমাজের অন্বয়ে অনন্বয়ে, সংঘাতে ও সংযোগে ব্যক্তিস্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে নানাভাবে। বাস্তবের সমস্যা ও শিল্পের সমস্যাকে একই প্রেক্ষিতে স্থাপন করে, স্বরমাত্রায় নানা লয়, নানা স্তর আরোপ করে লেখকেরা প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন আজকের সময়ের, সমাজের তথা জীবনের চলচ্ছন্দকে। পাল্টে যাচ্ছে গল্প বলার, ধরতাই, বুনুনি ও বিন্যাসের ধারা ধরন।"[৬]

কবি সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের সব চরিত্রই আসলে একা। অর্থাৎ মূলকথা হয়ে ওঠে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব-

সংকটের প্রশ্ন। 'সন্ধিক্ষণ', 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'একা', 'সহযোদ্ধা', 'অনুভব' প্রভৃতি উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রীরা বিরূপ বিশ্বে একা হয়ে পড়েছে। কোনো এক স্বতন্ত্র প্রহরে, নিদ্রাহীন রাত্রিতে 'আমরা' উপন্যাসের নায়ক প্রিয়নাথের হঠাৎ মনে পড়ে 'ফুটপাথে বসে থাকা এক ফেক্‌লু জ্যোতিষীর কথা— 'তোমার জীবন খুব একার হবে'। দিব্যেন্দু পালিতের সমকালীন আর এক ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা'র নায়ক শ্যামও এমন অস্তিত্বের প্রশ্নে জর্জরিত হয়েছিল একসময়। কিন্তু উপন্যাসের শেষে শ্যাম যেমন 'তবু পৃথিবী থেকে লোকজন ঢের কমে' গিয়ে 'আরো শালিক, চড়াই আর উড়িদে'র স্বপ্নই দেখে। দিব্যেন্দু পালিতের প্রিয়নাথ কিন্তু আদৌ তা নয়। সে অনেক বেশি মানবিক। সে রাস্তায় পথ হাঁটে। প্রিয়জনের সান্নিধ্য চায় আন্তরিকভাবেই। তাই একসময় উপন্যাসের সমাপ্তিতে 'ক্রমশ নির্জন হয়ে আসে রাস্তা।...দূর বেতারে সংযোগ স্থাপনের মতো একান্ত হাওয়ায় একটিমাত্র শব্দ ভাসে তার কানে, আস্তে আস্তে ঘুমের মতো ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। আছি, আছি'।[৭] শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শ্যামের মতো বায়বীয় আদর্শবাদের প্রকোপ চারপাশের চেনাজানা পৃথিবীর ঈর্ষা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা সবকিছুকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বেদনায় সে বলেনি, আমি গাছ বা মাছ হয়ে জন্মালাম না কেন?

এই পটভূমিতে মতি নন্দী সমাজকে সম্পূর্ণ দূরে রেখে ব্যক্তির আত্ম-ক্রন্দন শোনাতে চাননি। বিগলিত সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির অস্তিত্ব তাঁর রচনায় অনুপ্রবেশের মতো। সেখানে ব্যক্তির কৌতুক ও করুণা, বেদনা ও অপমান, স্বপ্ন ও কামনার ব্যর্থতা, বাস্তব চিত্রের সংযম সমাজেরই দেহে ফুটে উঠেছে। অথচ সে সমাজে ব্যক্তি যেন অনাহুত। সমাজ ব্যক্তিকে সাদরে গ্রহণ করছে না। ব্যক্তি সেই বর্জনের পংক্তিতে কখনো পরাজিতের লাঞ্ছনায় বিপর্যস্ত। সেখানে পরাজিত পৌরুষের দীপ্তি বহ্নিমান। মতি নন্দীর প্রথম উপন্যাস 'নক্ষত্রের রাত' (১৯৫৮) পরিবারকেন্দ্রিক উপন্যাস। স্বাধীনতা পরবর্তী দশ বছর পরেরকার বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি এতে ফুটে উঠেছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি দীনেশ ও তার স্ত্রী মাধবী আর তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নালিশ, অভাব, ভাড়াবাড়ির জীবন, পাওনাদারদের বিরক্তি, অদৃষ্টকে গালাগাল প্রভৃতি সমকালীন জীবনের ক্লান্তিবোধকে বহন করেছে। দীনেশ, মাধবী, তাদের ছেলেমেয়ে চিনু, রমা, মানু, অন্য ভাড়াটেরা— এরাই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। এদের সম্পর্কসূত্রে আসে রাজা, সুখী, যমুনা, শৈল, বেকার চিনুর নার্স ট্রেনিং নিতে থাকা বান্ধবী কাবেরী। এই

উপন্যাসে মতি নন্দী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে না গেলেও সময়ের দায়কে এড়াতে পারেননি। তাই ক্রুশেভের কলকাতায় আসার প্রতিক্রিয়া, ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপন্যাসে আসে। যদিও তা কোনো বড়ো ভূমিকা নেয়নি।

পরবর্তীকালে মতি নন্দী অস্তিত্বের প্রশ্নকে আরো বিভিন্নভাবে দেখেছেন। 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান' (১৯৬৯) উপন্যাসের হিরণ্ময় বলে—

> "আমি অপেক্ষা করেছি বহুদিন কিছু একটা ঘটাবার জন্য। কারণ আমি হাঁপিয়ে পড়েছি, আমি বদল চাইছিলাম এই নিত্যদিনের একঘেঁয়েমির থেকে। যখনই কলকাতায় কোনো কারণে পুলিস গুলি চালায় আমি রাস্তায় বেরিয়ে যেতাম এই আশায় একটু গুলি যদি গায়ে লাগানো যায়।"[৮]

তার এই চিন্তা আমাদের সামনে এক রুদ্ধশ্বাস মননের বিকৃত রূপ নেয়। উপন্যাসটিতে কয়েকটি পরিবারকে সামনে রেখে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যেও এই অস্তিত্বের প্রশ্ন আসে। লেখক এক পরিবারে দেখিয়েছেন বিধবা শেফালিকে, যে তার দাদা-ভাইয়ের সংসারে রান্না করে আর নানা বাড়ির সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণে বাঁচার অর্থ খুঁজে নেয়। আর এক পরিবারে দেখিয়েছেন ইলাকে, যে তার স্বামীর মদ খেয়ে ফেরা এবং শেফালির অনুসন্ধিৎসায় বিব্রত হয়। এরপর আসে শান্তিময় এক অধ্যাপক পরিবারের কথা, যেখানে অধ্যাপক হিরণ্ময় তার শালিকে গর্ভবতী করেছে। দ্বারিক নামে আর একটি চরিত্র আসে, যার প্রথম যৌবন গেছে বিবেকানন্দ ও মাও সে তুঙ-এর আদর্শে আর চাকরি জীবনে রবীন্দ্রনাথে। আর আছে খেলা পাগল অসীম। সে স্বপ্ন দেখে ইউসেবিয়ার অর্থ-প্রতিপত্তি পাবার। এই চরিত্রগুলি উপন্যাসে বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। আর এই আবর্তনের মধ্যদিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণতা, ক্লেদাক্ততা ও স্বার্থপরতা ফুটে ওঠে। সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "মতি নন্দীর এই ধরনের উপন্যাসে আধুনিক জীবনের ট্র্যাজেডি লুপ্তপ্রায় মানবিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস ক্রিয়াশীল।"[৯]

'দ্বাদশ ব্যক্তি' উপন্যাসে অপরাধবোধ, পাপবোধ, জীবনের উপহাস ও বিদ্রুপের মধ্যে দাঁড়ানো মধ্যবিত্তের কথা উঠে এসেছে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তারকের মানসিকতা, সামাজিকতা, রাজনৈতিকতা, নৈতিকতা সব হারিয়ে গেছে। সে সমাজের দ্বাদশ ব্যক্তি, খাটুনি

দিতেই যার ডাক পড়ে। তার কোনো ক্ষমতা নেই দলকে বাঁচাতে। দ্বাদশ ব্যক্তির উপমানটি ছড়িয়ে থাকে উপন্যাসের সর্বত্র। এই উপন্যাসে রাজনীতি উপেক্ষিত থেকেছে। চরিত্রগুলির উদাসীনতায় ও ব্যক্তিগত চাপের কাছে রাজনীতি গুরুত্ব হারায়। কোঅর্ডিনেশন কমিটির অধিবেশন, রাস্তায় গুলি চলা, ট্রাম বাস পোড়ানো, পথে পথে ব্যারিকেড, মানুষের রক্তে রাস্তা লাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ আছে। দিব্যেন্দু পালিতের 'আমরা' উপন্যাসেও প্রিয়নাথ বা তার বন্ধুর কাছে রাজনীতি কোনো সাড়া ফেলেনি। ভিয়েতনামকে সামনে রেখে মিটিং, মিছিল, জনসভার প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু প্রিয়নাথের বন্ধু যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে 'হ্যাঁ মশাই, প্রিয়নাথবাবু, ভিয়েতনাম জায়গাটা কোথায়?' তখন বোঝা যায় স্বাধীনতার এতো বছর পরেও সাধারণ মানুষ রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন নয়। এই দুটি উপন্যাসে ছয়-সাতের দশকের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে ঠিকই কিন্তু রাজনীতি নিয়ে লেখকদের উচ্ছ্বাস ততোটা ধরা পড়েনি। সত্যেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা' গ্রন্থে তারক সিংহকে 'অনুভূতির অসাড়তা' বলেছিলেন।[১০] এই অনুভূতির অসাড়তা প্রিয়নাথের মধ্যেও সমানভাবে চলতে থাকে। প্রিয়নাথও আবেগহীন, বস্তুসর্বস্ব। কোনো কিছুই তার মনকে সহজে স্পর্শ করতে পারে না।

বস্তুত খেলাকে সাহিত্যের উপকরণ করে মতি নন্দী নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। খেলা মানুষের জীবন যন্ত্রণা ও সুখের জরুরি কারণ হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যে। 'স্ট্রাইকার' (১৯৭৩), 'ননীদা নট আউট' (১৯৭৩), 'স্টপার' (১৯৭৪), 'একদা ক্রিকেট' (১৯৭৫), 'এম্পিয়ারিং' (১৯৭৬) প্রভৃতি গ্রন্থে মতি নন্দী মানুষের জীবনের সঙ্গে খেলাকে মিলিয়ে মিশিয়ে অঙ্গীভূত করে সুখ-দুঃখের কারণ রূপে উপস্থিত করেছেন। প্রেম-নারী-প্রকৃতি যেমন সাহিত্যের উপকরণ তেমনি খেলাকেও সাহিত্যের একটি সুখ-দুঃখের অনিবার্য শিল্পরূপ হয়ে উঠেছে মতি নন্দীর এই সব রচনাগুলিতে। খেলাকে উপলক্ষ করে মনুষ্যত্বের অপমানে খেলোয়াড়ের জীবন যে কি মর্মান্তিকভাবে শেষ হয়ে যায় তার কথাও যেমন মতি নন্দী লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন, সেই অমানুষিক কশাইবৃত্তির মধ্যেও খেলোয়াড়ি মানসিকতার পরিচয় পৌরুষের কথা। দিব্যেন্দু পালিত যেসময় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি লিখেছেন মূলত বিজ্ঞাপন জগৎ নিয়ে মতি নন্দীও সেই সময় ক্রীড়া জগৎ নিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি লিখেছেন। দুই লেখকের বিষয়বস্তু ভিন্ন কিন্তু চরিত্রগুলি কোথায় যেন এক জায়গায় এসে

মিলিত হয়। তাদের জীবন সমস্যা এক। একজন দেখিয়েছেন বিজ্ঞাপন জগতের ভিতর দিয়ে মানুষের জীবনঅভিজ্ঞতা। অন্যজন শুনিয়েছেন খেলার ভিতর দিয়ে মানুষের জীবনকথা।

এই সময়পর্বে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বহু বিচিত্র ধরনের উপন্যাস লিখেছেন। সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর লেখা সম্পর্কে জানান—

> "মাটির নিবিড়তায় ফলে ওঠা গাছ-পালা, জলে জঙ্গলে বিচরণশীল পশুপাখি নিয়ে লিখেছেন। মানুষের গড়ে তোলা ঘরবাড়ি, বিষয় আশয় নিয়ে; কখনো একান্ত শহরের মানুষের অন্য কোনো ব্যবসায়ের নেশা— কারখানা-কোলিয়ারি; কিংবা অর্থসঞ্চয় ও লগ্নির বিভিন্ন খুঁটিনাটি ঘেরা জটিল জাল— এসব নিয়েও উপন্যাস লিখেছেন।...আবার ইতিহাসের বিশাল-জঙ্গম প্রেক্ষাপট, সরাসরি ইতিহাসের বিখ্যাত মানুষ নিয়েও কাজ করেছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।"[১১]

তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি হলো— 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭), 'পরস্ত্রী' (১৯৭১), নির্বান্ধব' (১৯৭২), 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬), 'হাওয়া গাড়ি' (১৯৭৯, ১৯৮০), 'শাহজাদা দারাশুকো' (১৯৯১) 'এখানে বিরাজি শুয়ে আছে' (১৯৯৪), ইত্যাদি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় গ্রামজীবন ও শহরজীবন— দুটি জগৎকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। প্রথম দিকের রচনাগুলিতে প্রকৃতি আর মানবজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, গ্রামের মানুষের বিশিষ্ট মানসিকতা, তাদের সম্পর্কের জটিলতা ইত্যাদি বিষয় ফুটে উঠেছে। যেমন, 'কুবেরের বিষয় আশয়', ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', 'স্বর্গের আগের স্টেশন', 'চন্দনেশ্বর জংশন' ইত্যাদি গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাস। 'কুবেরের বিষয় আশয়' এই পর্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এরপরে নগরজীবন নিয়ে লিখেছেন 'নির্বান্ধব', 'স্বর্গের পাশের বাড়ি', 'অদ্য শেষ রজনী', 'হাওয়া গাড়ি'। মফঃস্বল শহর, পোড়ো বাড়ি, মরা জ্যোৎস্না, বর্ষায় কালো মেঘ এসব ছেড়ে কলকাতার নাগরিক জীবনে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম প্রবেশ করেন 'নির্বান্ধব' উপন্যাসে। শহর জীবনে অর্থের ক্ষমতার লোভ, মানবিক মূল্যবোধের সীমিত সম্পর্ক— সেই শহর কলকাতায় নিবারণ সব সময় নিজেকে বিশ্লিষ্ঠ মনে করে। সে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা, প্রাণের সম্পর্ক বজায় রাখতে চায় কিন্তু সে জানে কারোর হৃদয়ে তার স্থান নেই। 'স্বর্গের পাশের বাড়ি' উপন্যাসে তিনি শহরের উচ্চাশা বৈচিত্র্য এবং জটিলতার পরিচয় দিয়েছেন। 'হাওয়া গাড়ি' উপন্যাসে দেখা যায় শহরজীবনের বিচিত্র শ্বাসরোধী ষড়যন্ত্র। এলজন কর্মদক্ষ মানুষকে কাজের কোনো

সুযোগ না দিয়ে হাসিমুখে ধীরে ধীরে শেষ করে দেওয়ার মসৃণ ভয়ানক রাজনীতি, তারই মধ্যে দিলীপ কষ্ট পায় তাকে বন্ধু বলে প্রাণের সঙ্গে কেউ গ্রহণ করছে না।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের যে কোনো লেখায় তাঁর অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি আর পূর্ণতা আমাদের আশ্চর্য করে তোলে। তাঁর নিজের কথাতে জানা যায়, তিনি ইস্পাত কারখানায় কাজ করেছিলেন। জমি-জায়গা সংক্রান্ত কেনা-বেচা, বাড়ি করা, ফসল ফলা, পশুপালন, মাছ ধরা ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অপরদিকে দিব্যেন্দু পালিত গ্রামজীবন নিয়ে উপন্যাস রচনা করেননি। তাঁর উপন্যাসে কলকাতা শহর ও সেই শহরের মানুষজন মূলত মধ্যবিত্ত মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েনই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', 'চন্দনেশ্বর জংশন'-এর মতো উপন্যাসে অস্তিত্বের মাত্রাবদলের চেহারা ধরা পড়েছে। তাঁর 'এখানে বিরাজি শুয়ে আছে' সামাজিক পারিবারিক ছকে আঁকা একটা জীবননাট্য। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নাট্যকর্মী সৌরভের অভিজ্ঞতার আধারে ধৃত। দিব্যেন্দু পালিতের 'সংঘাত' এবং 'মৌনমুখর' উপন্যাসের কাহিনিও নাট্যকর্মী ঋতুপর্ণা, ব্রততী কিংবা তড়িতের জীবনসংগ্রাম। উপন্যাস দুটিতে নাটক এবং জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঋতুপর্ণা কেবলমাত্র আর্থিক সংকট থেকে মুক্তির জন্য নাটক করেনি। এক ধরনের আত্মিক মুক্তি নাটকের মধ্যদিয়ে পেতে চেয়েছিল। তা না হলে সে স্কুলের চাকরি দিয়েই পরিবারকে রক্ষা করতো। সংসার আর নাটক— এই দুইয়ের মাঝে পড়ে চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণ দেখিয়েছেন লেখক দিব্যেন্দু পালিত। 'মৌনমুখর' উপন্যাসে সাত-আটের দশকের বাজার অর্থনীতি কীভাবে শিল্পের জগৎকেও গ্রাস করেছিল তার চিত্র আছে। ছোটো ছোটো নাট্যদলগুলি ভেঙে টিভি সিরিয়াল বা সিনেমার দিকে ঝুঁকেছিল। নাটকের দিকে মানুষের ঝোঁকও কমে গিয়েছে। মুনাফালোভীরা ভালো ও দক্ষ নাট্যশিল্পীদের সিনেমার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নাট্যদলগুলি। 'মৌনমুখর' উপন্যাসের ব্রততী একজন দক্ষ নাট্যকর্মী। কিন্তু তার স্বামীর মুনাফালাভের চক্রে পড়ে তার শিল্পীসত্তা বিনষ্ট হয়েছে। অপরদিকে নাটক যার প্রাণ, আবেগ, ভালোবাসার কেন্দ্র, সেই নাট্যশিল্পী তড়িৎ এদের থেকে বাঁচতে পারেনি। উপন্যাসের মধ্যে নাটক ও নাট্যকর্মীদের জীবনকথা এবং বেঁচে থাকা দিব্যেন্দু পালিতই খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দিব্যেন্দু পালিতের সমসময়ের আর একজন ঔপন্যাসিক হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বিভ্রান্ত যুবসমাজের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসগুলি হলো— 'আত্মপ্রকাশ', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'জীবন যেরকম', 'অর্জুন' প্রভৃতি। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে তিনি হতাশাগ্রস্ত এক উদ্‌ভ্রান্ত তরুণের আত্ম-উন্মোচন করেছেন। বলাবাহুল্য এই উপন্যাসের নায়ক সুনীল লেখকরই স্বীয়-সত্তা। বিশ শতকের সাতের দশকে সাহিত্য ক্রমশই সমাজকে উপেক্ষা করে আত্মসচেতন অন্তর্মুখি হয়ে ওঠে। সেখানে জীবনের সমগ্র রূপ নয়, কেবল ব্যক্তিসত্তার আত্ম-জিজ্ঞাসাই বড়ো হয়ে ওঠে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রধান হয়ে উঠেছে। একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত যুবক কেমন করে নিজের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে চাইছে, স্বপ্ন দেখতে চাইছে— এটাই বড়ো হয়ে উঠেছে। চারিদিকের অবক্ষয়ের মধ্যেও ব্যক্তিমানুষের চেতনায় জীবনকে ঘিরে বেঁচে থাকার স্বপ্ন জেগে ওঠে। বেকারত্বের, দারিদ্র্যের জ্বালা থাকলেও জীবন এখানে শেষ হয় না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসটির সমসময়ে সমরেশ বসুর 'বিবর', বিমল করের 'যদুবংশ', রমাপদ চৌধুরীর 'এখনই' আর দিব্যেন্দু পালিতের 'ভেবেছিলাম' প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত উপন্যাসে ধংসকারী যুগের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। এই যুগের মানুষ একটা অস্থিরতার মধ্যে বাস করেছে। তারা কিছু করতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। এই না পারার বেদনায় 'আত্মপ্রকাশ'-এর নায়ক সুনীল পুনরায় শৈশবে ফিরে যেতে চেয়েছে। নতুন করে আবার জীবন আরম্ভ করতে চেয়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে যেমন 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ' প্রভৃতি উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররা অনেক সময় জীবনের নৈরাশ্য বা নিঃসঙ্গতা থেকে বাঁচতে অতীতস্মৃতি চারণা করেছে। শৈশবে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেনি। 'আত্মপ্রকাশে'র নায়ক শেষপর্যন্ত জীবন ও জগতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে চলতে চেয়েছে। অপরদিকে দিব্যেন্দু পালিতের চরিত্ররা নতুন করে বেঁচে থাকার কথা চিন্তা করতে পারেনি। প্রবল আত্মজিজ্ঞাসায় যখন নিজেদের পাপবোধ, অপরাধবোধ সামনে উঠে এসেছে তখন তারা হয় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, নতুবা নিঃসীম একাকীত্বের জীবন বেঁচে নিয়েছে, কেউ কেউ আত্মহত্যাও করেছে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারী চরিত্ররা বেশি সবল। তারা জীবনে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করেছে। আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক

অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকার পথ খুঁজেছে। সেদিক থেকে দিব্যেন্দু পালিতের নারী চরিত্ররা স্বতন্ত্র।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৬৮) উপন্যাসের নায়ক বেকার ছেলে সিদ্ধার্থ। অর্থনৈতিক তাড়না থাকলেও তার কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে সহজ সরল একটা সুন্দর জীবনের আকাঙ্ক্ষা। নিজের অস্তিত্বকে সে সম্মানের সঙ্গে টিকিয়ে রাখতে চায়। তাই এই বিপর্যস্ততার যুগে তার এতো লড়াই। অন্যায়ের সঙ্গে সে আপস করেনি। দিনের পর দিন যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি না হলেও সে অন্যায় পথে টাকা রোজগারের পথকে ঘৃণা করেছে। দিব্যেন্দু পালিতের 'ভেবেছিলাম'-এর নায়কও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপস করেনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে তার চাকরি খোয়া গেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন' উপন্যাসে দেশবিভাগের যন্ত্রণা নিয়ে উদ্বাস্তু মানুষের অর্থনৈতিক সংগ্রামের কথা আছে। তবে কেবল দারিদ্র্যজনিত হাহাকারই নয়, উপন্যাসের নায়ক অর্জুনের মানসিক শক্তির স্ফুরণও দেখিয়েছেন লেখক। অর্জুনও কোনোভাবেই অন্যায়কে মেনে নিতে পারেনি। সে সবসময়ই মহাভারতের অর্জুনের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। দেশবিভাগের ফলে তার স্বপ্ন হারিয়ে গেলেও সে ভেঙে পড়েনি। সে বেকার হয়েও সজীব, গরীব হয়েও উদার। সে উদ্বাস্তু কলোনিকে নতুন করে গড়ে তুলতে চায়। মায়ের দুঃখ ভোলাতে চায়। সে শুক্লা নামের একটি মেয়েকে ভালোবাসে। মহাভারতের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের মতোই এই উপন্যাসের অর্জুনকে লেখক প্রতিকূল অবস্থাতেও অবিচল শান্ত সংযত হয়ে জীবনের প্রতি দায়বদ্ধ রেখেছেন। দিব্যেন্দু পালিতও দেশবিভাগ বা বস্তিজীবন নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছেন 'ভোরের আড়াল' (১৯৯৩)। মধ্যবিত্ত জীবন যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে এসে লেখক দেখান বস্তিবাসীদের জীবন সংগ্রাম। সরস্বতী, জলধর, মৌসুমী, সন্ধ্যা, মৃদুলা, শ্রীধর, গোপাল প্রভৃতি চরিত্ররা বস্তিজীবনের পরিবেশে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছে। সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট পরিবেশ থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের থেকে দিব্যেন্দু পালিতের পার্থক্য হলো পৌরাণিক মিথকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন। মহাভারতের অর্জুনের 'ইমেজ'কে সামনে রেখে 'অর্জুন' উপন্যাসের নায়ককে গড়ে তুলেছেন। আর দিব্যেন্দু পালিত তা করেননি। তিনি কলকাতার বস্তিজীবনের নিম্নবিত্ত মানুষদের নিজেদের শক্তি সামর্থানুযায়ী অঙ্কন করেছেন।

দিব্যেন্দু পালিতের সমকালের লেখক দেবেশ রায়, মতি নন্দী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা কলকাতাকেন্দ্রিকতার লেখক। তাঁদের সৃষ্ট চরিত্ররা দিশাহীন হয়ে পড়ে। চরিত্রদের মধ্যে প্রেমের প্রেরণাময় দীপ্তি অপেক্ষায় দাহ ও দীর্ণতা বড়ো হয়ে ওঠে। অস্তিত্বের সংকট আসে ব্যাপকভাবে। যদিও চরিত্রগুলির এই অস্তিত্বের সংকট যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের ফল তা কিন্তু নয়। আলব্যের কাম্যু ও সার্ত্র চর্চার আধিক্য ও অস্তিত্ব অনুদানের প্রশ্নেও এসময় গুরুত্বপূর্ণ হয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'অস্তিত্ব সংক্রান্ত কতকগুলি মূলীভূত প্রশ্ন প্রবল হয়ে উঠেছে মতি নন্দী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের উপন্যাসে'।[১২]

দিব্যেন্দু পালিতের সময়কার একজন শক্তিশালী লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি সেই সকল কথাকারদের অন্যতম, প্রশ্ন যাঁদের উদ্যত অস্তিবোধের দিকে। সেই অস্তিবোধ কখনো সামাজিক সংকটের ঘূর্ণাবর্তের পাক খায় আবার কখনো জিজ্ঞাসায় কাতর হয়। 'ঘুণপোকা' (১৯৬৭), 'পারাপার' (১৯৭১), 'শ্যাওলা' (১৯৭৭), 'মানবজমিন' (১৯৮৮) ইত্যাদি উপন্যাসে তিনি আধুনিক মানুষের জীবন সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের প্রকরণ ও কাঠামো সৃষ্টিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। জটিল মানবমনের চোরাবালিতে আলো ফেলেছেন নিজস্ব রীতিতে। তাঁর চরিত্রগুলির আগ্রহ আছে জীবনে, অস্তিত্বের চরিতার্থতার সন্ধানে, অন্তরের গভীর নিঃসঙ্গ অভিযাত্রায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা' এবং দিব্যেন্দু পালিতের 'ভেবেছিলাম' 'সন্ধিক্ষণ' কিংবা 'আমরা' উপন্যাসগুলি কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত হয়। তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নতুন পথে বাঁক নিয়েছে। রাজনীতির জগতে কংগ্রেসের স্বপ্ন হঠাৎ এক নতুন বাস্তবের সঙ্গে সংঘর্ষে হোঁচট খেয়েছে। স্বপ্নোত্থিত রাষ্ট্রনায়কদের আশাভঙ্গের প্রথম আর্তনাদ সেদিনের যুবমানসে নানা প্রশ্ন জাগিয়েছিল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' কিংবা দিব্যেন্দু পালিতের 'ভেবেছিলাম', 'সন্ধিক্ষণ', 'আমরা' ইত্যাদি উপন্যাসগুলি রাজনৈতিক জিজ্ঞাসায় কণ্টকিত নয়। যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে তার চেয়েও দ্বন্দ্ব-কাতর এবং আত্মজিজ্ঞাসার প্রশ্নই ভাবিত করেছে দুই ঔপন্যাসিককে। 'ঘুণপোকা' উপন্যাসের নায়ক শ্যামের জন্ম স্বাধীনতার আগে লেখকের প্রায় সমসময়ে। আবার 'ভেবেছিলাম' উপন্যাসের নামহীন যুবক কিংবা 'আমরা' উপন্যাসের প্রিয়নাথেরও জন্ম স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে। তারাও লেখকের সমবয়সী প্রায় ত্রিশ বছরের যুবক। দুটি উপন্যাসেই লেখক সমানভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন।

'ঘুণপোকা'র শ্যাম ব্যক্তি স্বাধীনতাকেই শুধু স্বাধীনতা বলে ভাবতে পারে, অথচ নতুন ভাবনার পথে ১৯৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন তাকে স্পর্শ করেনি। স্বয়ং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও রাজনীতি-সচেতন অথচ রাজনীতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। শুধু 'ঘুণপোকা'য় নয়, সাধারণভাবেই তাঁর নায়কেরা কোনোভাবে বিযুক্ত বা একক হয়ে পড়ে। 'ঘুণপোকা' এর তিন বছর আগে 'ভেবেছিলাম' (১৯৬৪) এবং ছয় বছর পর 'আমরা' (১৯৭৩) উপন্যাস দুটি লিখিত। সময়ের ব্যবধানে শুধু 'আমরা' উপন্যাসটিতে নকশাল আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে। তাতেও রাজনীতির বর্ণনা নেই। রাজনীতি সচেতন লেখক দিব্যেন্দু পালিত রাজনীতিকে ব্যবহার করেননি। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিরিশ বছরের যুবকের চাকরি খোয়ানো দিয়ে 'ভেবেছিলাম' উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। অপরদিকে 'ঘুণপোকা' উপন্যাসটি শুরু হয় শ্যামের চাকরি খোয়ানো দিয়ে। চাকরি, প্রেম ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত যুবকের আশা ও আশাভঙ্গের কাহিনি 'ভেবেছিলাম'। লেখক এই সময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন। উপন্যাসের কথকও গম্ভীর ভাব নিয়ে দার্শনিকের ভঙ্গিতে অজস্র মানুষের মুখ দেখেছেন। দেখেছেন জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া আত্মহত্যা প্রবণ মানুষদের। প্রকৃত মৃত্যুর আগেই যে মানুষের মৃত্যু ঘটে যায় তা সে পলকে পলকে অনুভব করেছে। বন্ধু নিকুঞ্জর মধ্যে দেখেছে শূন্যতার এক গভীর নৈরাশ্য। দিব্যেন্দু পালিত আত্মবিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে যুবকটির বোধ ও অস্তিত্ব হারানো গল্প আমাদের শোনান। শ্যামও তার চারদিকে ছায়ার মতো হেঁটে যাওয়া 'অলীক লোকজন' দেখে নিজেকে হারায়, মানুষগুলিকে দেখে তার মনে হয় মায়াবী হরিণ। কিন্তু সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও দুজন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। আধুনিক নাগরিক সভ্যতার ফাঁকি, অন্তঃসারশূন্যতা শ্যাম ও নামহীন যুবককে বারবার তাড়না করেছে ঠিকই কিন্তু দিব্যেন্দু পালিতের নায়ক বোধ ও অস্তিত্ব হারিয়ে শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে যায়। আর শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নায়ক নিজের জানার তাড়নায় আবারও অস্থির হয়ে উঠেছে, ভবঘুরে হয়ে ঘুরেছে, খুঁজেছে জীবনের অর্থ।

'ঘুণপোকা' উপন্যাসের চরিত্ররা স্বীকারোক্তি ও আত্মময়তার মধ্যদিয়ে আত্ম-আবিষ্কার করতে পেরেছে। তা আরো স্পষ্টতর হয়েছে 'পারাপার' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে রাজনীতির ব্যাপ্তি আছে। একদা কলেজের কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা ললিত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত।

'ঘুণপোকার মতো এককেন্দ্রিকতা এই উপন্যাসে নেই। ললিত, রমেন, বিমান, তুলসী, আদিত্য— সবাই আত্মসন্ধানে বেরিয়েছে। এরা প্রত্যেকেই অন্তর্মুখি। ছোটো ছোটো ঘটনা বলয়ে একে অপরকে স্পর্শ করলেও তারা সবাই একা, নিঃসঙ্গ। সমাজে তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিন্তু আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াসই তাদের জীবনের প্রথম ও শেষ কথা। শ্যাম বড়ো মায়ায়, বড়ো ভালোবাসায় পৃথিবীর ধুলোমাটিকে আঁকড়ে ধরেছিল। আর 'পারাপারে'র রোগাক্রান্ত ললিতের ইচ্ছে করে আর একবার শিশু হয়ে এই ধরিত্রী মায়ের কোলে ফিরে আসতে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে এরকম ভাবনা নেই। তাঁর উপন্যাসে চরিত্ররা মৃত্যুকে ভয় পায় না। জীবনের পাপ-পঙ্কিলতা, অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করার চিন্তা করে তারা। আসলে দিব্যেন্দু পালিতের চরিত্ররা অনেক বেশি প্রকৃতি বিরোধী। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে নিজেরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন বেশি ধরা পড়েছে। প্রথম জীবনে দু-একটি উপন্যাসে অল্পবয়সী যুবক-যুবতীর প্রেম ও প্রেমহীনতা, আশা ও আশাভঙ্গতা, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা গেলেও ১৯৭১ সালের পর দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে সেই ধারার পরিবর্তন ঘটে। দিব্যেন্দু পালিতের লেখালিখির স্বতন্ত্র জগৎ এই দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে শুরু হয়। তাই হয়তো সমকালীন লেখকদের দু-একটি রচনার চরিত্রের সঙ্গে তার উপন্যাসের চরিত্রের মিল ঘটে যায়।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসগুলি আকারে ছোটো। তাতে কাহিনি নেই বললেই চলে। একটি ব্যতীত দুটি কাহিনি নেই। চরিত্রের মনোজগতকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। চরিত্রের সংখ্যাও কম। নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা প্রধান হয়ে উঠে তাঁর উপন্যাসে। সেই সঙ্গে সম্পর্কের ভাঙন অনিবার্য রূপ নেয়। তারপর তাদের সন্তান-সন্ততির মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি আকারে বড়ো। কেবল আয়তনে বিশাল নয়, ব্যপ্তিতেও বিশাল। 'মানবজমিন', 'দূরবীন' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি গভীরতায় ও ব্যঞ্জনায় পাঠকের সম্ভ্রম আদায় করে নেয়। বহু চিন্তার অভিজ্ঞতা, প্রখর মনন ও এক ধরনের দার্শনিকতা উপন্যাসগুলিকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় নিপুণভাবে চরিত্রগুলিকে গড়ে তুলেছেন এবং তাদের মধ্যে মানবিক অনুভূতির বিচিত্রলীলা দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা জটিল এবং বিশাল বিশ্বের নানান প্রশ্নের মায়াবী বিষণ্ণতায়

আচ্ছন্ন। শ্যাম, সোমেন, ললিত, কুকু, ধ্রুব, সজল, কৃষ্ণজীবনরা বিচিত্র জটিলতার মধ্যে কেমন যেন বিষণ্ণতায় মন্থর। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রশংসনীয় হয়ে ওঠেন অন্তত এই কারণে যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা অস্তিত্বের শিকড় খুঁজেছে সত্য সন্ধানের ব্যাকুলতা নিয়ে। এছাড়া কখনো কখনো মমতা মাখানো 'নস্টালজিয়া', কখনো দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ বর্তমানকে নানাদিক থেকে লক্ষ করতে করতে বিপুল এক কম্পমান জিজ্ঞাসাকে অনন্তে মেলে ধরে। তারা সত্তাকে একবিন্দুতে কেন্দ্রিভূত করেছে। আর দিব্যেন্দু পালিতের চরিত্ররা সম্পর্কের বেড়াজাল ভেঙে বিরূপ বিশ্বে নিয়ত একাকি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, সন্তানের সঙ্গে বাবা-মার সম্পর্ক, বন্ধুত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সব ভেঙে গেছে ব্যক্তিসত্তার খোঁজে। সময়ের চাপেই হোক আর সম্পর্কের ভালো না লাগার চাপেই হোক চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই তাঁর উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দিব্যেন্দু পালিত এক একটি চরিত্রকে অন্তরের গভীরে নিয়ে গিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে তাঁর উপন্যাসে কাহিনি বড়ো হয়ে ওঠেনি। উপকাহিনি যেমন নেই, তেমনি চরিত্রের সংখ্যাও কম। এই সব দিক থেকে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর সমকালীন লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের থেকে স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সামাজিক জীবনে নানা পালা-বদল ঘটেছে। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, উপার্জনশীল নারীসমাজের আবির্ভাব, ফ্ল্যাটবাড়িকেন্দ্রিক ছোটো পরিবারের অভ্যুদয়, হিন্দুকোড আইন পাশের পর পৈতৃক সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার এবং বিবাহবিচ্ছেদ আইন সম্মত সুযোগ লাভের ফলে সমাজের চেহারা খুব দ্রুত বদলে যেতে থাকে। সাহিত্যেও এর প্রকাশ ঘটেছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল' উপন্যাসে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন এবং 'মহানগর' ও 'দূর ভাষিণী' উপন্যাসে ওয়ার্কিং গার্ল-এর ছবি দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙন পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি শাসন ও সংস্কার বন্ধনের অবসানের চিত্র ধরা পড়েছে। বিবাহবিচ্ছেদ-অধিকারের প্রয়োগ এবং দাম্পত্যনিষ্ঠার অবসান দেখা যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'প্রথম কদমফুল' ও 'বন্যাকন্যা' উপন্যাসদুটিতে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'দম্পতি' উপন্যাসে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে দাম্পত্যজীবনে বিপর্যয়ের ছবি ফুটে ওঠে। মানবিক মূল্যবোধের অবসান ও ব্যক্তিচরিত্রের বিনষ্টির চিত্র বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ও 'একক দশক শতক' উপন্যাসে দেখা যায়। সামাজিক পালাবদলের নানা ছবি ফুটে ওঠে বিমল করের 'কালের নায়ক' উপন্যাসে। আশির দশকের কলকাতার নিম্নবিত্ত

একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের ভাঙনের কাহিনি এতে ধরা পড়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজ আশাহীন হয়ে পড়েছে। একই পরিবারে থেকে রথীন পৃথক বাড়ি তৈরীর জন্য অর্থসঞ্চয় করে, একান্নবর্তী সংসারে টাকা দিতে চায় না। পরিবারের সবার মধ্যে এক ধরনের সম্প্রীতির আলগা বন্ধন দেখা দেয়। রথীন, মহীন, সতীন আর তাদের অবিবাহিত বোন কাজল ক্রমশ পরস্পরের থেকে দূরে সরে যায়। শেষ পর্যন্ত রথীন আর সতীন হাতাহাতি-মারপিঠ করে। আহত সতীনকে দেখে কাজলের মনে হয় যেন দ্বিতীয়বার বাবাকে পুড়িয়ে এসে নুয়ে পড়ে দাদা কাঁদছে। সার্বিক ভাঙনের এই বাস্তব চিত্র আজো নির্মমভাবে প্রতিফলিত।

সুনীল গঙ্গোপাধায়ের 'জীবন যে রকম' (১৯৭৯) উপন্যাসে নাগরিকতার একটি বাস্তবরূপ ফুটে উঠেছে। পুরনো মূল্যবোধের অবসান, পারিবারিক নৈতিক শাসন, সেন্টিমেন্টের পরাজয়, ব্যক্তিচরিত্রের ঔদ্ধত্য ও অহংবোধের প্রতিষ্ঠা— এই সব লক্ষণ এখানে ধরা পড়েছে। চাইবাসা হলুদ পুখরি থেকে সকাল সাড়ে ন'টায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছায় দীপু। প্রকৃতির শান্ত ও নিভৃতি থেকে চলে এসে উপনীত হয় দ্রুতগতি ঊর্ধ্বশ্বাস কলরবমুখরিত নাগরিক জীবনে— এখানে সবাই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ব্যস্ত। বেকার সমস্যা, বন্ধুজীবনের সমস্যা, কলেজজীবনের সমস্যা, পাড়ার মস্তানদের নিয়ে সমস্যা, পারিবারিক জীবনের সমস্যা ইত্যাদি নানা সমস্যায় বিপর্যস্ত দীপু। এই সব সমস্যা এসেছে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ নিয়ে। অপরদিকে দিব্যেন্দু পালিতের 'বৃষ্টির পরে' উপন্যাসে ঠিক এর বিপরীত চিত্র ধরা পড়েছে। অশোক এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। "আট বছর আগে একদিন যখন হাওড়া স্টেশন থেকে লুপ লাইনের ট্রেনে চড়ে রওনা হয়েছিল এই অজ শহরের দিকে চাকরি করতে, তখন মনে হয়েছিল জীবন এরপর অর্থহিন হয়ে পড়বে। ভাগ্যকে দোষ দিয়েছিল সে। অব্যক্ত অভিমানে ইচ্ছে হয়েছিল আত্মহত্যা করতে। এখনো তার মন পড়ে রয়েছে কলকাতার দিকে।"[১৩]

দিব্যেন্দু পালিতের চরিত্ররা কলকাতা শহরের বাইরে বেরতে চায়নি। কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবনযাত্রা প্রসারিত। শহরের বাইরে যখনই গেছে তখন তাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। শহর কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অশোক নিজেকে জিজ্ঞাসা করে, 'সত্যিই কি একা তুমি? সত্যি ক্লান্ত?' অশোক সত্যিই একা। সে পরিবারহীন, আত্মীয়-স্বজনহীন। শহর কলকাতা থেকে গ্রাম বাংলায় আসে চাকরি নিয়ে। এখানে

হরবিলাসবাবুর বাড়িতে সাতদিনের ভাড়া থেকে পরিবারের সবার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে হয়ে পড়ে। হরবিলাসবাবু মারা গেলে তার স্ত্রী তিন মেয়েকে নিয়ে বিপাকে পড়ে। একমাত্র খেপাটে ছেলে কলকাতায় পালিয়ে যায়। একটি মেয়েরও বিয়ে দিতে না পারায় অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রুপ শুনতে হয় রাজবালাকে। তার বড়ো মেয়ে গায়ত্রীকে নিয়ে অপবাদ, মেজো মেয়ে শিখা এক মুসলিম যুবকের পাণিপ্রার্থী হয়ে একসময় পালিয়ে বিয়ে করে। গ্রাম বাংলার নির্মল প্রকৃতির পরিবর্তে অশোকের চোখে ধরা পড়ে মানুষের কদর্যতার বিভিন্ন দিক। বাণী ও কল্যাণের একমাত্র শিশুকন্যা তাদেরই চাকরের হাতে ধর্ষিতা ও খুন হয়। হরেন ঘোষের গুণ্ডাদের হাতে কলেজের প্রিন্সিপাল বিনয়বাবু আক্রান্ত হয়, মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে হরেন ঘোষ তার পালিত গুণ্ডাদের থানা থেকে ছাড়িয়ে আনে। একরকম পাপ-ক্রোধ, হিংসা-মারামারি, আদর্শহীনতা, দুর্নীতি ইত্যাদি সবকিছুতে কলঙ্কিত হয়েছে গ্রাম বাংলার পরিবেশ। এইরকম পরিস্থিতিতে বাণী আর কল্যাণ চাকরি থেকে রিজাইন দিয়ে কলকাতামুখি হয়। গ্রামবাংলার সমাজজীবন এভাবে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে পরিবর্তিত হতে থাকে। এই একটি মাত্র উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিত গ্রামবাংলার পটভূমিকে তুলে ধরেছেন। তবে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে সামাজিক-পারিবারিক সমস্যাগুলি খুব বড়ো পটভূমিতে অঙ্কিত নয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের এক একটা দিক এক একটা উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন। অন্যান্য ঔপন্যাসিকরা যেখানে মধ্যবিত্ত পরিবারের সামগ্রিক ভাঙনের ছবি অঙ্কন করেছেন, দিব্যেন্দু পালিত তা করেননি। তাঁর উপন্যাসে ভাঙনের পর পরিবারে বা মানুষের জীবনে কি প্রভাব পড়েছে তা বড়ো হয়ে উঠেছে। যেমন 'প্রণয়চিহ্ন' উপন্যাসে একান্নবর্তী পরিবারে নমিতার বিয়ে হওয়ায় সে তার স্বামীকে নিবিড়ভাবে পায়নি। তাই স্বামী যখন ফ্ল্যাট কেনার সিদ্ধান্ত নেয় তখন নমিতা খুশি হয়। নমিতা একান্নবর্তী পরিবারের আবেষ্টনী ছেড়ে নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু পারস্পরিক সন্দেহে স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়। নমিতা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। বিবাহবিচ্ছিন্না নমিতাকে কেউ ঘর ভাড়াও দিতে চায়নি। লেখক এখানে দেখান স্বামী পরিত্যক্তা একজন নারীর একা সমাজে বসবাস করলে কি কি অসুবিধায় পড়তে হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে পালাবদল ঘটে আটের দশক থেকে। এই সময় পর্বে দিব্যেন্দু পালিত দেশ-কাল প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"একজন লেখক হিসাবে ঐ সময়ের (নকশাল আন্দোলন ১৯৬৭-১৯৭১ সাল) রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে আমি অংশগ্রহণ না করলেও এর পরোক্ষ চাপ এড়াতে পারিনি। যখন 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসটি লিখেছি তখন আমার বয়স চল্লিশ-একচল্লিশ হবে। কিন্তু যখনকার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছি তখন আমার বয়স প্রায় আরও দশ বছর কম। নকশাল আন্দোলনে যারা সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আমার সমবয়সী বা আমার চেয়ে বয়সে বড় এবং আরও অনেকেই ছিলেন আমার চেয়ে বয়সে ছোট। অর্থাৎ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। আমার পরিচিতদের মধ্যে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী সেইসময় রাজনীতিতে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে এবং তাঁদের কেউ কেউ পুলিশের গুলিতে মারা যায় বা বন্দী অবস্থায় অত্যাচারিত হয়ে কোনও না কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে এই আন্দোলন-বিরোধিতার রাষ্ট্রিক দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাউকে কাউকেও আমি চিনতাম। সবমিলিয়ে যখন অবস্থাটা এমনই ছিল যা যে-কোনও বিবেকবান মানুষের আত্মিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। কোন্ পক্ষ দোষী, কোন্ পক্ষ নির্দোষ তা বিচার করার সময় ছিল না, ঘটনা ঘটেই চলেছিল এবং দুপক্ষের মনোভাবেই এসে গিয়েছিল অন্ধকার। কিন্তু একান্তে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করতে গিয়ে কখনও কখনও আমার মনে হয়েছে যে দেশের সঠিক অবস্থা এখন এমনই যে একটা প্রতিবাদ ও পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। নকশাল আন্দোলন ঠিক পথে চালিত হয়েছিল না ভুল পথে চালিত হয়েছিল সে প্রশ্ন গৌণ, কিন্তু পথ যেমনই নেওয়া হোক না কেন, উদ্দেশ্য বা আদর্শ কিন্তু অন্যরকম ছিল। তা হল আন্দোলন দমনের নামে একটি রাষ্ট্রিক গণহত্যার প্রবণতা, যার অন্যদিকে ছিল নকশালদের একাংশের বেপরোয়া সংগ্রাম।"[১৪]

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাসে দুজন সমমতাদর্শী যুবকযুবতীর অন্তর্লোক উদ্‌ঘাটন করেন, তখন মতাদর্শের সংকট সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠেনি। কিন্তু 'বিবাহবার্ষিকী' উপন্যাসে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিখণ্ডীভবনের প্রতিফলন ঘটেছে সহকর্মীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে। চীনা আক্রমনের পর যখন ১৯৬৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি দুভাগে ভাগ হয়ে যায় তখনো মতাদর্শের সংঘাত থেকে কোনো বড়ো লেখা বের হয়নি। অথচ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কালেই পাওয়া যায় ননী ভৌমিকের 'ধুলো মাটি'র মতো

জোরালো উপন্যাস। নায়ক চরিত্রের সংগ্রাম ও আত্মসচেতনার বিকাশ ঘটলেও আরো অনেকের মতোই তিনিও অন্যতর বিবেচনায় নীরব থাকেন। সাতের দশকের পর যে বিষয়টি বাংলা সাহিত্যকে সবথেকে বেশি পুষ্টি প্রদান করেছিল তা হলো নকশাল আন্দোলন। এটি আমাদের অস্তিত্বের মূলে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এই সময় রাজনৈতিক উপন্যাস নতুনভাবে লেখা শুরু হয়। সমরেশ বসুর 'যুগ যুগ জিয়ে' উপন্যাসে পলিটিক্যাল পার্টিকে গ্রুপ হিসেবে দেখার একটা মনোভাব লক্ষ করা যায়। গ্রুপের প্রেসার যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ও স্বাধীনতা গ্রাস করতে চায় ত্রিবিদেশের মধ্যদিয়ে সে কথা বলতে চেয়েছেন। 'মহাকালের রথের ঘোড়া'য় রুইতন কুর্মির রাজনৈতিক দুরাশার বাস্তব পৃষ্ঠপট অবহেলিত থেকে গেছে। এই উপন্যাসে সামাজিক টেনশন আর ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া— একসঙ্গে দেখতে হয়।

নকশাল আন্দোলন নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই ব্যক্তির বিষণ্ণ পরাভবের কথা বলতে চেয়েছেন। এই সময়ের চরিত্রদের বাহ্যিক দিকটা লেখকরা খুব একটা ভিতর থেকে দেখেননি। চরিত্রদের পরিস্থিতিই তাদের ভাবিয়েছে। যেমন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'শ্যাওলা' উপন্যাসের হিরণ্ময়। এই সময়ের রাজনৈতিক অস্তিত্ব অনেক বেশি চঞ্চল ও যন্ত্রণাময়। ভিতর থেকে যাঁরা বিষয়টাকে বুঝলেন তাঁদের মধ্যে দুজন ঔপন্যাসিক হলেন দেবেশ রায় এবং অসীম রায়। দেবেশ রায় 'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' উপন্যাসে রক্তাক্ত পটভূমি ও মনোভূমিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। অসীম রায় 'আবহমান কাল' উপন্যাসে রাজনৈতিক রূপান্তর ও ব্যক্তির রূপান্তরের ছন্দকে তুলে ধরেছেন। এর বিপরীতে আবার সমরেশ মজুমদার 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসে দেখান আমাদের স্বপ্নভঙ্গের যুগে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের গোড়ার দিকের কথা, যেখানে স্বপ্ন আর স্বপ্নদ্রষ্টা দুইয়ের মধ্যে কতো অসঙ্গতি ছিল। অসীম রায়ের 'একদা ট্রেনে', 'শব্দের খাঁচায়' ইত্যাদিতে ব্যক্তি চেতনার সমগ্রতার প্রেক্ষাপটে রাজনীতির কথা উঠে আসে। 'আবহমান কাল'-এর নায়ক টুটুলের সমগ্র হয়ে ওঠায় তার রাজনৈতিক গঠন-ভাঙন গোটা অস্তিত্বের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

যাঁরা নকশাল আন্দোলনকে অত্যন্ত একটা জটিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁরা হলেন— স্বর্ণ মিত্র এবং শৈবাল মিত্র। স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো' উপন্যাসের রঘুর ভিতর দিয়ে দেখা যায় সেদিনের যুবক-সংকল্পের চেহারা। চরিত্রটি রাজনৈতিক মতাদর্শ-সমভূত এমন একটা চরিত্র যা একটা সময়ের বাঙালি যুবমানসের সৎ,

সংকল্পের প্রতিনিধি। 'অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসেও শৈবাল মিত্র সেই দুর্দমনীয় যুবকদের বীরত্বের দিকটি তুলে ধরেছেন। এঁদের থেকে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' এবং 'অপারেশন বসাই টুডু' অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বসাইটুডু স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে একটি অগ্নিস্তম্ভ চরিত্র। এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তী কথাসাহিত্যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ শিল্পসার্থক রাজনৈতিক ব্যক্তিচরিত্র। তবে বাঙালি লেখকরা নকশাল আন্দোলনের আগুনঝরা দিনগুলিতে একটা কথা বুঝেছিলেন যে, এ আগুন, এ রক্ত আমাদের সকলের। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্রোতের মুখে' বা 'গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'বন্ধুমেধ' কিংবা তপোবিজয় ঘোষের 'সামনে লড়াই' প্রমাণ করে বাঙালির উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগকে।

এই সময়ের সন্ধিক্ষণের মধ্যে আধুনিক মানুষের বন্দীত্ব, ব্যক্তিসত্তার বন্দীত্ব, নিঃসঙ্গতাবোধ এগুলির প্রকাশ পায়নি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন—

> "এতকাল ধরে সাহিত্যিকরা যে নিঃসঙ্গতার মধ্যদিয়ে সাহিত্য রচনা করে এসেছেন সেই নিঃসঙ্গতার রূপ তাদের চোখে ধরা পড়েও পড়েনি, কারণ এই নিঃসঙ্গতা আধুনিক সময়েরই একটা নতুন ধরনের প্রতিক্রিয়া। সেই প্রতিক্রিয়াটা খুব সুন্দরভাবে এবং গুছিয়ে, ভাষাকে অত্যন্ত শাণিত ও মার্জিত করে এবং অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দিব্যেন্দু লিখতে পেরেছে। এইভাবে কিন্তু কেউ লিখতে পারেনি।"[১৫]

দিব্যেন্দু পালিত আধুনিক নাগরিক সমাজের কথাকার। মনে নাগরিকতাকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। তাঁর সত্তা যেন একটা জায়গায় কেন্দ্রিভূত হয়েছে। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, চেতনা সমস্ত কিছুই এই নাগরিকতার উপর দাঁড়িয়ে কাজ করেছে। তাঁর লেখার মধ্যে কলকাতা শহরের মানুষ আর সেই মানুষের সামাজিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক বদলে যাওয়ার ছবি দেখা যায়। অনেক লেখকই এই সময় কলকাতা শহরের মানুষ ও তাঁদের জীবনযাত্রা নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু দিব্যেন্দু পালিত যেভাবে লেখেন সেভাবে অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ধরা পড়েনি। যেমন, 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের শুরুতে একটা মৃত্যুর প্রসঙ্গ আছে। এই মৃত্যুটিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রদের মানসিক টানাপোড়েন দেখান তিনি। কনকের বন্ধুবান্ধব, তার বাবা-মা, দুই বোন, এবং প্রাক্তন প্রেমিকা যার সঙ্গে এক বন্ধুর বিয়ে হয়েছিল— তাদের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কের জটিলতা, ধ্বসে যাওয়া, কখনো কখনো কিছু

প্রত্যাশার জন্ম এই সব নিয়ে তাদের অন্তর্জগৎটিকে দিব্যেন্দু পালিত অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। দিব্যেন্দু পালিতের সমবয়সী যাঁরা তাঁদের কিন্তু এইভাবে চরিত্রের অন্তর্জগতে বসে থাকা বা অন্তর্জগতে চলে আসা লক্ষ করা যায় না। দিব্যেন্দু পালিত চরিত্রগুলিকে খুঁটিয়ে দেখেছেন। দেখেছেন তাদের অন্তর-বাহির, মনের অলিগলি, অন্দরমহল। আর সর্বোপরি চরিত্রগুলির সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত অবস্থান বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনের বহু অভিজ্ঞতা তাঁকে এই বোধ ও চেতনা দিয়েছে। যেমন বিজ্ঞাপন জগৎ নিয়ে লেখা তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ঢেউ' প্রকাশমাত্রই সাড়া জাগিয়ে ছিল পাঠক মহলে। কেননা এই জগতের অন্দরমহলটা তিনি নিবিড়ভাবে চিনেছেন তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে।

'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসটি সাতের দশকের প্রত্যক্ষ অগ্নিগর্ভে লিখিত নয়। দিব্যেন্দু পালিত এই সময় মাঝে মাঝে যে সমস্ত বিষয়কে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন সেখানে বিজ্ঞাপন জগৎ বা সংবাদ জগৎ নিজে আলোড়ক হয়ে দেখা দিয়েছে। সংবাদ নিজে নিজে সাহিত্য নয়। সংবাদের রহস্য হয়তো অনেকদিন ধরে পাঠককে আকর্ষণ করে রাখে। কিছুদিন পর তা আর সংবাদপাঠকের মনে থাকে না। কিন্তু দিব্যেন্দু পালিত সেই সংবাদকে সংবাদপত্রিকা থেকে সরিয়ে আনেন। রিপোর্টার্স ডেস্ক থেকে সেই সংবাদ ঠাঁই পায় তাঁর লেখার টেবিলে। তারপর তা সাহিত্যের এলাকায়। 'অনুভব', 'অন্তর্ধান', 'অনুসরণ', 'সোহিনী এখন কোথায়' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি এই বিষয়ে তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সময়েই আর একটি উপন্যাস লিখেছিলেন 'স্বপ্নের ভিতর'। এটি কিন্তু সে-জাতীয় রচনা নয়। এতে সময়ের কোনো অভিঘাতও হানা দেয়নি। সমালোচক সরোজ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন—

> "সময়ের প্রবর্তিত জীবনের নতুন ছাঁদ, নতুন প্রেক্ষাপট ও পটবিধৃত চরিত্র ও তাদের সংকট এ উপন্যাসে প্রধান কথা। দুটি কর্মরত জীবন জীবিকার সূত্রে নিবদ্ধ দুটি নারীর উচ্চাবচ অস্তিত্বের আবর্ত এখানে প্রধান কথা। সন্দেহ নেই এও এক বিপন্ন সীমান্তের কথা।"[১৬]

'সহযোদ্ধা' আর এক ধরনের উপন্যাস। যেখানে অস্থির সময়ের বিপন্নতার মধ্যেও মানুষ বিবেকবান হয়ে ওঠে। 'অনুভবে' চরিত্রচিত্রণ এবং উপলব্ধির শীর্ষতায় পৌঁছেছিলেন। বিষয়বৈচিত্র্যের অসাধারণত্বও নজর কেড়েছিল পাঠকদের। এমনকি তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস

‘একদিন সারাদিন’ও এক অদ্ভুত অনুভূতির মুখোমুখি দাঁড় করায় পাঠককে। বিবাহবিচ্ছিন্না নারীরা সমাজে একা বসবাস করলে কি কি ঘটতে পারে তার রূপরেখা দেখিয়েছেন তিনি। চেনা সমস্যাকেই কি অসাধারণ দক্ষতায় এঁকেছেন এই উপন্যাসে। প্রায় তিরিশ বছরের কাছাকাছি যুবতী শর্মিলার সঙ্গে অজয়ের ভুল বোঝাবুঝি, বিবাহবিচ্ছেদ, অজয়ের ভাই সুজয়ের সঙ্গে তার এক চিলতে সম্পর্ক এবং অচিনের সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সবকিছুই পরিবেশিত হয়েছে এক শিল্পিত সুষমায়।

দিব্যেন্দু পালিত এমন এক তীক্ষ্ণ সংবেদনে নারীমনস্তত্ত্বকে আমাদের গোচরে আনেন কিংবা এমন একটা আন্তর্জাতিক বীক্ষা উপন্যাসে গড়ে তুলেছেন যা এই বিশ্বায়নের সময়েও অনেক জনপ্রিয় লেখকদের রচনায় সচরাচর দেখা যায় না। তিনি সহানুভূতিপূর্ণ মন দিয়ে নারীর ভিতরের সমস্যাগুলিকে দেখিয়েছেন।

চরিত্রের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জীবনদর্শন। ‘উড়োচিঠি’ উপন্যাসে অনীশ বলেছিল, ‘লাইফ আসলে একটা উড়োচিঠির ব্যাপার। একদিন না একদিন সকলেই পায়। কেউ সুখের খবর, কেউ দুঃখের। যে যেমন পায় সেভাবেই চলে’। একথার সত্যতা ধরা পড়েছে দিব্যেন্দু পালিতের বেশিরভাগ চরিত্রের ক্ষেত্রে। তিনি অস্তিস্ত্বের চেনা জগৎটাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এই ব্যাপক চেনা বৃত্তের মধ্যে যে ছোটো ছোটো অচেনা অংশ আছে— সেই মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের অচেনা অথচ সম্ভাব্য অন্তঃস্রোতগুলি তাঁর লেখায় এমনভাবে ধরা পড়েছে যা পাঠকের চেনা আরো তীব্র ও গভীরতর হয়। নিজেদের শ্রেণি ও জীবনকে এবং শেষপর্যন্ত হয়তো মানুষকে, আরো একটু বেশি করে বুঝতে শুরু করে পাঠকেরা। অথচ বুদ্ধিদীপ্ত পরিমিতিবোধে সেগুলি নিখুঁত নির্মাণ। আপাততুচ্ছ অভিজ্ঞতায় ভিন্নতর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এখানেই দিব্যেন্দু পালিত স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড), কলকাতা, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, পৃ. ৫১১

২. কর, বিমল : দেওয়াল (অখণ্ড), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, পৃ. ৫৫১

৩. পুরকাইত, উত্তম (সম্পাদিত) : শশাঙ্কশেখর, হিরণ্ময় এবং রমাপদ চৌধুরী, সাক্ষাৎকার-দীপঙ্কার দাস, সাপ্তাহিক বর্তমান, বর্ষ-২, অক্টোবর ১৯৮৯, উজাগর, একাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪২০, পৃ. ৩৮

৪. চৌধুরী, রমাপদ : খারিজ, সপ্তর্ষি প্রকাশন, হুগলী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ১৯

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩৪১

৬. তদেব : পৃ. ৩৪৮

৭. পালিত, দিব্যেন্দু : দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৮২

৮. নন্দী, মতি : নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান, দশটি উপন্যাস, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১১৫

৯. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর

বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৩৪৫

১০. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ : বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৯ পৃ. ১৮২

১১. দে, অমর (সম্পাদিত) : লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আর ভালোবাসা, সুমিতা চক্রবর্তী, গল্পসরণি, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা : দুই, দ্বাবিংশতি বর্ষ, ২০১৮, পৃ. ৭২

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩৭

১৩. পালিত, দিব্যেন্দু : দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৯০

১৪. ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত) : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, শারদীয়, ১৪০০, পৃ. ৭২

১৫. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : চ্যালেঞ্জ নিতে সমর্থ হয়েছে, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত, বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১১

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩৫০

উপসংহার

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯) থেকে শেষ উপন্যাস 'একদিন সারাদিন' (২০০৩) — এই কালপর্বে গভীর ও পরিব্যাপ্ত এক আধুনিক নগর চেতনাকে সংহত ভাবে বিম্বিত করেন। এই সময়ের মধ্যে ঔপন্যাসিক রূপেই কেবল বাঙালি নয়, সর্বভারতীয় পাঠক গোষ্ঠীর কাছে নিজের আসন পাকা করে নিয়েছেন তিনি। তাঁর উপন্যাস কোনো না কোনো দিক থেকে জীবন সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধিতে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে। সমকালীন লেখকদের তুলনায় কমই লিখেছেন তিনি। কিন্তু যা লিখেছেন, মননশীল পাঠকের কাছে তা মূল্যবান হয়ে উঠেছে। তিনি সুখপাঠ্য উপন্যাস লিখতে চাননি। ভুরি ভুরি লিখতে গিয়ে বিস্তর অপাঠ্যও লেখেননি। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হয়েই পাঠককে ভাবিয়ে তুলেছেন। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা-মায়া-স্নেহ-মমত্ববোধ এক স্নিগ্ধ আলোর মতো ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে তাঁর উপন্যাসগুলোকে। তাঁর 'সিন্ধু বারোয়াঁ', 'সেদিন চৈত্রমাস', 'অচেনা আবেগ' প্রভৃতি উপন্যাসে প্রেমের স্নিগ্ধতা, 'সোনালী জীবন' উপন্যাসের দেশান্তরী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবার, 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসে ভোররাতে খুন হতে দেখে ফেলা আদিত্যর মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব, 'উড়োচিঠি'র বাউন্ডুলে রজতকে নিয়ে টুপুরের মনের দোলাচলতা, 'বিনিদ্র'তে দীপ্তর চড়াই-উৎরাই, 'স্বপ্নের ভিতর'-এ অর্পিতা ও বিশাখার অতীত স্মৃতি চারণা, 'অনুভব'-এ আত্রেয়ীর আত্মবিশ্লেষণ— এসবই সময়ের প্রেক্ষাপটে নিপুণ বাস্তবগ্রাহ্য ভঙ্গিতে তুলে ধরেছিলেন তিনি। এছাড়াও সংবাদপত্রের ঘটনা স্থান পেয়েছে 'অন্তর্ধান', 'অনুসরণ', 'সোহিনী এখন কোথায়' প্রভৃতি উপন্যাসে। বিজ্ঞাপন ও বিপণন সংক্রান্ত বিষয় স্থান পেয়েছে 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ' প্রভৃতি উপন্যাসে— যেখানে নারীকে পণ্য করে ব্যবসা চালানো হয়। পুঁজিবাদী সভ্যতার নগ্নতা ফুটে ওঠে। আবার অন্যান্য বৈদগ্ধে চেনা ছকের মধ্যেই তিনি তার কাহিনির ক্যানভাসে সাজিয়ে তুলেছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন মানুষের প্রেম, বিরহ, স্মৃতি, আবেগ, উদ্বেগ, দুঃখ, কৌতূহল, অসম্পূর্ণতা, নিষ্ঠুরতা, মালিন্য ও উত্তরণের কাহিনি। সব মিলিয়ে তিনি এক বুদ্ধিদীপ্ত ও মননশীল কথাসাহিত্যিক ছিলেন।

দিব্যেন্দু পালিত সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ একজন লেখক। তৎকালীন ও বর্তমান বাংলায় অবক্ষয়িত একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে ছত্রাকের মতো গজিয়ে উঠেছে 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'। তথাকথিত আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় সনাতনী পারিবারিক রীতির অবলুপ্তিকরণ

যেন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন সময় কর্মস্থানের অজুহাতে নাগরিক সমাজে ‘শান্তির নীড়’ গড়ে তোলার এক হাস্যময় প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় নিজেকে হারিয়ে অন্যের কাছে নিজেকে হাজির করার প্রচেষ্টা কলুর চোখ বাঁধা বলদের পরিস্থিতি মাত্র। ‘আধুনিক’ হয়ে ওঠার অন্ধ প্রচেষ্টা মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজকে ঘুণপোকার মতো কুঁড়ে খায়। বাস্তুভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু হওয়ার এক অট্টহাস্য অনুকরণ ও অনুসরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানসিক যন্ত্রণা ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু পালিত তাঁর কথাসাহিত্যে নিপুণ শিল্পীর তুলির টানে জীবন্ত করে তুলেছিলেন।

দিব্যেন্দু পালিতের লেখনীর স্বর নাগরিক। নগর কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের অনিশ্চয়তা, নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা ছিল তাঁর অন্যতম বিষয়বস্তু। সব সময়ই তিনি একটা সমান্তরাল বাস্তবতাকে তৈরী করেছিলেন। যেখানে বাস্তবের থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে মানুষের বিবেক। পরিবার ও সমাজের থেকেও তখন বড়ো হয়ে ওঠে নীতি ও দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, একজন খাঁটি ও সৎ মানুষের বিবেক। এইজন্য তাঁর চরিত্রগুলো বাস্তবতাকে এড়াতে না পেরে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। তখন তারা নিজেদের মতো করে পরিত্রাণের পথ খোঁজে। আর এই খুঁজতে গিয়েই তাদের উত্তরণ ঘটে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে আর্থসামাজিক কিছু ভ্রান্ত নীতির প্রবল চাপে মানুষের অসহায় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তাদের অপূরিত আকাঙ্ক্ষা, অপ্রাপ্তি, অভিমান, ব্যর্থতা এবং দুর্বলতাও। মানুষের মধ্যে থেকে তিনি আবিষ্কার করেছেন অন্য এক মানুষকে। বাংলা সাহিত্যে তিনিই বোধহয় সবচেয়ে নগরমনস্ক লেখক, যিনি আগাগোড়া নাগরিক জীবনের সমস্ত সংকট-নির্বেদ ও প্রতারণা কৃত্রিমতাকে নির্ভুলভাবে বিদ্ধ করতে পারেন। বিদ্রুপ করতে পারেন তাদের প্রতিবাদহীন জীবনযাত্রাকে।

নাগরিক মানুষের প্রতি দিব্যেন্দু পালিতের সত্তা যেন একটা জায়গায় কেন্দ্রিভূত হয়েছে। কাজেই তাঁর লেখার মধ্যে নাগরিক মানুষ আর তাদের সামাজিক এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বদলে যাওয়ার ছবি ফুটে উঠেছে। এ ছবি আবার প্রত্যেকের বিপন্নতার ছবি, নিঃসঙ্গতার ছবি। একটা মূল্যবোধ থেকে আর একটা মূল্যবোধে পৌঁছে দেওয়ার ইতিবৃত্ত। একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে আর একটা সময়ের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গেছে মানুষ। ফলে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দিব্যেন্দু পালিতের সমস্ত উপন্যাসই একটা বিশেষ সামাজিক

স্তরের। এই কারণেই তিনি সাধারণভাবে কিছু মানুষকে বেছে নিয়েছিলেন। তাতে সামাজিক সমস্যা অবশ্যই কিছু এসেছিল। কিন্তু সামাজিক বা শ্রেণিগত সমস্যা কিংবা অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে যা উৎপন্ন হয় তার চাইতেও তাঁর লেখায় ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সম্পর্কের টানাপোড়েন বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। আর এই কারণেই তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো বেশি ভাবুক প্রকৃতিরও।

দিব্যেন্দু পালিতের লেখায় লঘুতা একেবারেই নেই। তিনি সাহিত্যকে মনন এবং মানবিক চেতনার এক্সপ্রেশন হিসেবে বিচার করেন। একজন সচেতন লেখকের মতোই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বক্তব্যবিষয়। সন্দেহ নেই, সবকিছুতেই তিনি নিজস্ব চিন্তায় সম্পূর্ণ একটি শিল্পকর্মের মর্যাদা দাবি করেন।

গ্রন্থপঞ্জি
(Bibliography)

আকর গ্রন্থাবলি :

১. পালিত, দিব্যেন্দু : অচেনা আবেগ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫

২. পালিত, দিব্যেন্দু : অনুভব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৪

৩. পালিত, দিব্যেন্দু : অনুসরণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০

৪. পালিত, দিব্যেন্দু : একদিন সারাদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩

৫. পালিত, দিব্যেন্দু : ওঠা কিংবা নামা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫

৬. পালিত, দিব্যেন্দু : দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫

৭. পালিত, দিব্যেন্দু : দশটি উপন্যাস-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২

৮. পালিত, দিব্যেন্দু : প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫

৯. পালিত, দিব্যেন্দু : বহুদূর অভিমান, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট, লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২

১০. পালিত, দিব্যেন্দু : ভোরের আড়াল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩

১১. পালিত, দিব্যেন্দু : মাইন নদীর জল, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৮৮

১২. পালিত, দিব্যেন্দু : মাত্র কয়েকদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮

১৩. পালিত, দিব্যেন্দু : মৌনমুখর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

১৪. পালিত, দিব্যেন্দু : যখন বৃষ্টি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২

১৫. পালিত, দিব্যেন্দু : সংঘাত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২

১৬. পালিত, দিব্যেন্দু : সেকেণ্ড হনিমুন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৩

১৭. পালিত, দিব্যেন্দু : সোহিনী এখন কোথায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট, লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২

১৮. পালিত, দিব্যেন্দু : হঠাৎ একদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১০

সহায়ক গ্রন্থাবলি :

ক. বাংলা সহায়ক গ্রন্থ :

১. আচার্য, অনিল (সম্পাদিত) : ষাট - সত্তরের ছাত্র আন্দোলন, কলকাতা, অনুষ্টুপ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯৮

২. আচার্য, অনিল (সম্পাদিত) : সত্তর দশক (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, অনুষ্টুপ, তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৪

৩. আফরিন, নীলিমা : বাংলাদেশের উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ (১৯৪৭-২০০০), ঢাকা, বাংলাদেশ, কথাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৪. কর, বিমল : আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৯২

৫. গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ : বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, কলকাতা, পাব্‌লভ ইনস্টিটিউট, জানুয়ারি, ১৯৯৯

৬. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ২০০২

৭. ঘোষ, নির্মল : নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১ মাঘ ১৪০১

৮. ঘোষ, বিনয় : মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, প্রথম দীপ সংস্করণ, জুন ২০২০

৯. চক্রবর্তী, কৃষ্ণরূপ : কথাসাহিত্যের নতুনপাঠ, কলকাতা, সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮

১০. চক্রবর্তী, কৃষ্ণরূপ : বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ, কলকাতা, বর্ণালী, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

১১. চক্রবর্তী, সুমিতা : উপন্যাসের বর্ণমালা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৩

১২. চক্রবর্তী, বিপ্লব (সম্পাদিত) : শৈলীচিন্তাচর্চা, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০০৩

১৩. চট্টোপাধ্যায়, ড. প্রবীরকুমার : জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য : ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে, কলকাতা, বেস্টবুকস, প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ ১৯৯২

১৪. চৌধুরী, কমল (সম্পাদিত) : স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯

১৫. চৌধুরী, সিদ্ধার্থরঞ্জন (সম্পা.) : বাঙালি মধ্যবিত্ত মানস, কলকাতা, উবুদশ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১

১৬. দত্ত, বীরেন্দ্র : বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

১৭. দত্ত, শিখা : আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প চর্চা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০২

১৮. দত্ত, সম্রাট : বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০

১৯. দাস, অমিতাভ : আখ্যানতত্ত্ব, কলকাতা, ইন্দাস, ২০১০

২০. দাস, অরূপকুমার : ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১২

২১. দাস, বেলা ও চৌধুরী, বিশ্বতোষ : বাংলা আখ্যান বহুমাত্রিক পাঠ, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১১

২২. নন্দী, ধীরেন্দ্রনাথ : মনের বিকার ও প্রতিকার, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৮

২৩. পাল, রবিন : উপন্যাসের বর্ণময় ভুবন, কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১১

২৪. পাল, রবিন : কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প, কলকাতা, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১১

২৫. পালিত, দিব্যেন্দু : আমাদের সময় এবং আমরা, কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০০৫

২৬. পালিত, দিব্যেন্দু : প্রেমপত্র, কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬৮

২৭. পালিত, দিব্যেন্দু : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১

২৮. পালিত, দিব্যেন্দু : সিনেমা হওয়া গল্প, কলকাতা, সপ্তর্ষী প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১

২৯. পালিত, দিব্যেন্দু : সেরা দিব্যেন্দু, কলকাতা, সপ্তর্ষী প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫

৩০. পুরকাইত, উত্তম (সম্পাদিত) : রমাপদ চৌধুরী : বৈচিত্র ও অনুসন্ধান, হাওড়া,

উজাগর প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯

৩১. ফ্রয়েড, সিমমুন্ড : মনোবিশ্লেষণ, ভাষান্তর-সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা, বাংলাদেশ, হাওলাদার প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

৩২. ফ্রয়েড, সিমমুন্ড : মনঃ সমীক্ষণের ভূমিকা : স্বপ্ন, ভাষান্তর-অরূপরতন বসু, ঢাকা, বাংলাদেশ, হাওলাদার প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০০০-২০০১

৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩

৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : উত্তরপ্রসঙ্গ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৬

৩৬. ভট্টাচার্য, জগদীশ : আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, কলকাতা, ভারবি, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭

৩৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর : আখ্যানের স্বরান্তর, কলকাতা, দিবারাত্রির কাব্য, ২০০৭

৩৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর : আখ্যানের সাতকাহণ, মেদিনীপুর, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২০১০

৩৯. ভট্টাচার্য, তপোধীর : আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর, কলকাতা,

পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪

৪০. ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের প্রতিবেদন, কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯

৪১. ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১২

৪২. ভট্টাচার্য, তপোধীর : প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, মেদিনীপুর, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৭

৪৩. ভট্টাচার্য, দেবীপদ : উপন্যাসের কথা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৩

৪৪. ভট্টাচার্য, বীতশোক : কথাজিজ্ঞাসা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪

৪৫. ভট্টাচার্য্য, ড. সুধীন্দ্রনাথ : উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র, কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, মার্চ ২০০৩

৪৬. মজুমদার, অভিজিৎ : চণ্ডীমঙ্গল (আখেটিক খণ্ড) : সংগঠন ও শৈলী বিচার, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫

৪৭. মজুমদার, অভিজিৎ : শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬

৪৮. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮

৪৯. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : পঞ্চাশের দশকের কথাকার, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

৫০. মজুমদার, ড. সমরেশ : বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর (১৯২৩-৪৭), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮

৫১. মজুমদার, পরেশচন্দ্র; মজুমদার, অভিজিৎ : বাংলার সাহিত্যপাঠ : শৈলীগত অনুধাবন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১০

৫২. মজুমদার, বিমলকুমার : সাহিত্যবিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

৫৩. মজুমদার, সঙ্গীতা : দুই দশকের বাংলা উপন্যাস (১৯৫০-১৯৭০), কলকাতা, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২

৫৪. মণ্ডল, ড. জহর এ. : মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯

৫৫. মান্না, গুণময় : বাংলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক, কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৫

৫৬. মিশ্র, পুষ্পা (সম্পাদিত) : সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮

৫৭. মিশ্র, সুতপা; মিত্র, মাধবেন্দ্র : ফ্রয়েড : মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, কলকাতা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ২০০৫

৫৮. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর

বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪

৫৯. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪

৬০. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে : বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯

৬১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : লেখকের মুখোমুখি, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯

৬২. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার : বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মে, ২০১৩

৬৩. রায়, অপূর্বকুমার : শৈলীবিজ্ঞান, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯

৬৪. রায়, অলোক : সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য, কলকাতা, সাহিত্যলোক, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৩

৬৫. রায়, অলোক : বাংলা উপন্যাস : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০০

৬৬. রায়, দেবেশ : উপন্যাস নিয়ে, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩

৬৭. রায়, দেবেশ : উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, কলকাতা,

দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৬

৬৮. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ : বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৯

৬৯. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৪

৭০. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : বাংলা কথাসাহিত্যের প্রকরণ ও প্রবণতা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯

৭১. লাহা, চিত্তরঞ্জন : মূল্যবোধ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭

৭২. শ', রামেশ্বর : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

৭৩. সরকার, সুনীলকুমার : ফ্রয়েড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, তৃতীয় প্রকাশ, মার্চ ১৯৯০

৭৪. সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত) : আলব্যের কামু, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪

৭৫. সামন্ত, সুবল : বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অন্বীক্ষা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

৭৬. সামন্ত, সুবল : বাংলা উপন্যাস সমীক্ষা (৩য় খণ্ড), কলকাতা, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪

৭৭. সিকদার, অশ্রুকুমার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৮

৭৮. সিংহ রায়, জীবেন্দ্র : কল্লোলের কাল, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৮

৭৯. সেন, অঞ্জন; সিংহ, উদয়নারায়ণ : উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা, রক্তকরবী, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৩

৮০. সেন, নবেন্দু : বাংলা গদ্য স্টাইলিসটিকস, বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মহাদিগন্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১

৮১. সেন, নবেন্দু : শৈলীবিদ্যার আলোয় বাংলা কবিতা, কলকাতা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১১

খ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ :

১. Benvenuto, Bice; Kennedy, Roger : The Works of Jacques Lacan, an introduction, FAB, 1986

২. Coleman, James C. : Abnormal Psychology and Modern Life, Printed and Published by Russi. J. Taraporevala for D.B. Taraporevala sons & Co. Bombay, Forth Indian Reprint 1975

৩. Edel, Leon : The Modern Psychological Novel, New York, Grosset & Dunlop, 1964

৪. Ellis, Havelock : Psychology of Sex, London, Pan Books Limited, First published 1933

৫. Freud, Sigmund : Anxiety and Instinctual life, New Introductory Lectures, The complete Introductory Lectures on psycho-analysis, translated & edited by James strachey, George Allen & Unwin Ltd. London, 1971

৬. James, William : Principles of Psychology, Great Books of the Western World : 53 William Berton, Chicago, 1952

৭. Jung, C. G. : Collected Papers on Analytical Psychology, edited by Dr. Constance E. Long, Moffat Yard and Company, New York, Second Edition -1917

৮. Jung, C. G. : The Modern Man in Search of a Soul, Translated by W. S. Dell and Cary F. baynes, printed by great britian by Lund Humphrise, London, Bradford, Reprinted-1961

৯. Jung, C. G. : Two Essays on Analytical Psychology,

translated from the German by R. F. C. Hull, New York, Second Edition -1966

গ. সহায়ক পত্র-পত্রিকা :

১. কর্মকার, লক্ষ্মণ (সম্পাদিত) : সৃজন (ছোটগল্প বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা), পশ্চিম মেদিনীপুর, আগষ্ট ২০১৯

২. গঙ্গোপাধ্যায়, স্বাতী (সম্পাদিত) : কৃত্তিবাস (নবপর্যায়), উনসত্তর সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি - মার্চ ২০১৯

৩. চক্রবর্তী, কল্যান (সম্পাদিত) : দরবারি সাহিত্য পত্রিকা, দিব্যেন্দু পালিত সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৯১

৪. চট্টোপাধ্যায় ও সোম; (সম্পাদিত) : কৃত্তিবাস (মাসিক), কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯
নীলাঞ্জন ও দেবকুমার

৫. দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত) : বইয়ের দেশ, দিব্যেন্দু পালিতের মুখোমুখি, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬

৬. দে, অমর (সম্পাদিত) : গল্পসরণি, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা : দুই, কলকাতা, দ্বাবিংশতি বর্ষ : বার্ষিক সংকলন ১৪২৪/২০১৮

৭. ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত) : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, শারদীয়, ১৪০০

৮. মিত্র, সুহৃদচন্দ্র (সম্পাদিত) : চিত্ত (মনোবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা), ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৮

৯. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত, বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি - মার্চ ২০০৩

১০. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১

১১. সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত) : এবং মুশায়েরা, উপন্যাস বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, শারদীয়, ১৪১৪

১২. সেনগুপ্ত, সুমন (সম্পাদিত) : দেশ, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি ২০১৯

পরিশিষ্ট-১

কালপঞ্জি

১৯৩৯	—	বিহারের ভাগলপুরে দিব্যেন্দু পালিতের জন্ম।
১৯৫৩	—	স্থানীয় দুর্গাচরণ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন।
১৯৫৫	—	'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'রবিবাসরীয়'তে প্রথম ছোটগল্প 'ছন্দ-পতন' প্রকাশিত হয়।
১৯৫৫-১৯৫৬	—	'দেশ' পত্রিকায় প্রথম কবিতা 'তোমার ভালোবাসা' প্রকাশিত হয়।
১৯৫৮	—	লেখকের পিতৃবিয়োগ এবং কলকাতায় আগমন।
১৯৫৯	—	প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ' প্রকাশিত হয়।
১৯৬০	—	প্রথম গল্পসঙ্কলন গ্রন্থ 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি' প্রকাশিত হয়।
১৯৬১	—	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ পাশ করেন। 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় সাব এডিটরের কাজে যোগ দেন।
১৯৬২	—	দ্বিতীয় উপন্যাস 'সেদিন চৈত্রমাস' প্রকাশিত হয়।
১৯৬৪	—	কল্যাণী পালিতের সঙ্গে বিবাহ। 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার চাকরি থেকে ইস্তফা দেন।
১৯৬৫	—	১৯৬৫ সালে যোগ দেন বিপণন ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত পেশায়।
১৯৭০	—	প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাজার বাড়ি অনেক দূরে' প্রকাশিত হয়।
১৯৭১	—	প্রথম আত্মজৈবনিক প্রবন্ধ 'প্রেমপত্র' প্রকাশিত হয়। 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসটি প্রকাশিত।
১৯৭৮	—	আমেরিকা এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করেন।
১৯৮৪	—	শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'সহযোদ্ধা' প্রকাশিত হয় এবং এর জন্য আনন্দ পুরস্কার পান। 'শুক্রে শনি' ও 'আলমের নিজের বাড়ি' গল্পগ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়।
১৯৮৬	—	'সহযোদ্ধা' উপন্যাসের জন্য রামকুমার ভূয়ালকা পুরস্কার প্রাপ্তি।
১৯৮৭	—	'আনন্দবাজার' পত্রিকায় সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর রূপে যোগ

দেন। যুক্ত হন 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়' বিভাগ এবং সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদনার সঙ্গে।

১৯৯০ — 'ঢেউ' উপন্যাসের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পান।

১৯৯২ — জার্মানি ভ্রমণ।

১৯৯৩ — আন্তর্জাতিক উপন্যাস 'অনুভব' প্রকাশিত হয়।

১৯৯৬ — 'শতবর্ষে চলচ্চিত্র' (প্রথম খণ্ড) নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন নির্মাল্য আচার্য্যের সঙ্গে।

১৯৯৮ — 'অনুভব' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। এছাড়াও চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার হিসেবে পান Bengal Film Journalists' Association Award। 'শতবর্ষে চলচ্চিত্র' (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হয়।

১৯৯৯ — ইতালি ভ্রমণ।

২০০১ — 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

২০০২ — কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। শেষ প্রবন্ধগ্রন্থ 'সিনেমা থিয়েটার' প্রকাশিত হয়।

২০০৩ — শেষ উপন্যাস 'একদিন সারাদিন' এবং শেষ কাব্যগ্রন্থ 'সতর্কবার্তা' প্রকাশিত হয়।

২০১৯ — হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন।

পরিশিষ্ট-২

বংশতালিকা

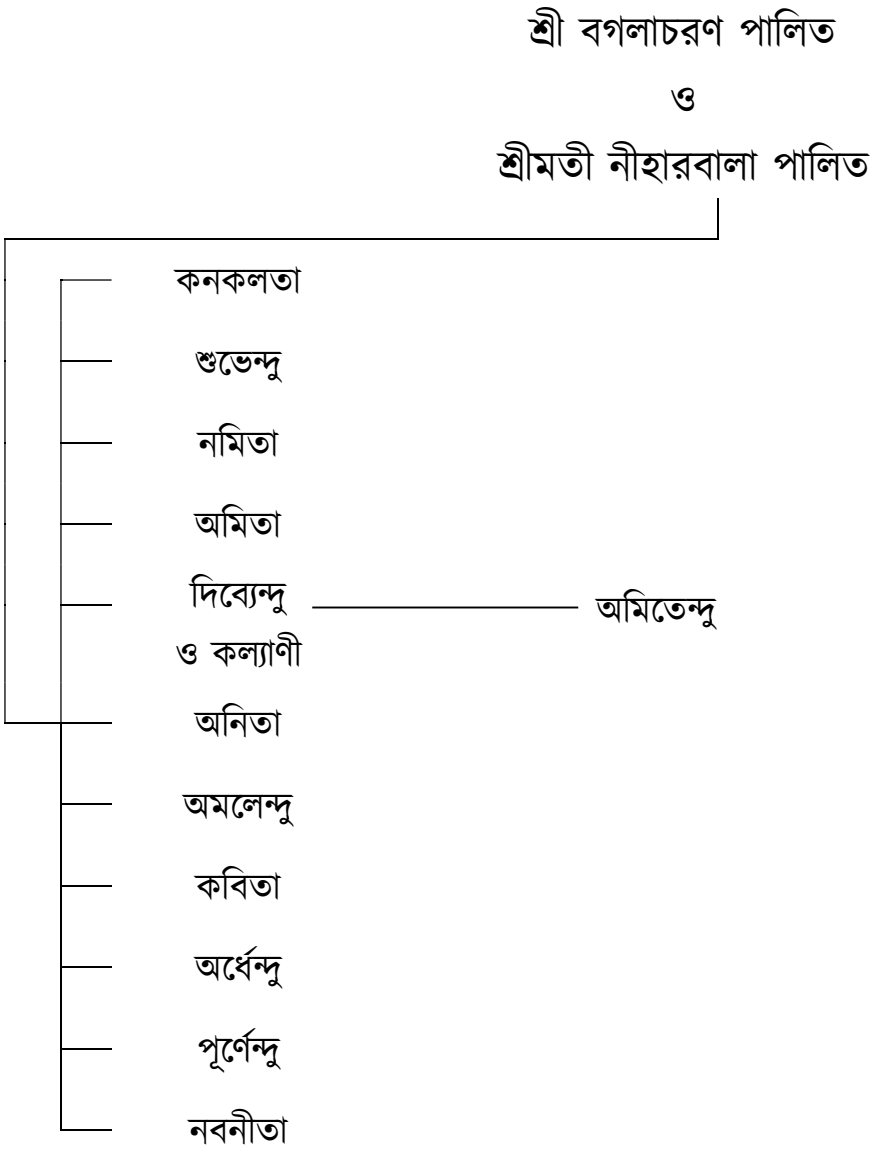

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থনাম :

অ

অচেনা আবেগ – ২৬, ২৭, ৬৭, ৭২
অজ্ঞাতবাস – ২১৩
অদ্য শেষ রজনী – ২০১
অনুভব – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৬২, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৯৪, ৯৯, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৯, ১৯১, ১৯৮, ২১৪
অনুসরণ – ১৯, ২৬, ২৭, ৫৩, ৬৩, ৬৫, ৭৫, ১১৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৯৫, ১৯৬, ২১৪
অন্তর্ধান – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৫৩, ৬৩, ৬৪, ১১৬, ১৬৫, ১৭৬, ২১৪
অন্ধকার পেরিয়ে – ১৪
অপরাহ্ণ – ১৯১, ১৯২
অপারেশন বসাই টুডু – ২১৩
অবসর – ১৫
অবৈধ – ২৬, ২৭, ৫৩, ৬৯, ৯৬, ১৪৪, ১৬৪, ১৬৯, ১৯১, ১৯২
অমৃত হরিণ – ১৬
অরণ্যে আদিম – ১৯৪
অরণ্যের দিনরাত্রি – ২০২
অহংকার – ২৬, ৩৮, ১১২, ১২৫, ১৬৯, ১৮১

আ

আড়াল – ২৬, ২৭, ৫৩, ৫৬, ৬৯, ৯৩, ৯৪, ১৬৪, ১৭৭, ১৯১
আত্মপ্রকাশ – ১৯৬, ২০২, ২০৩
আমরা – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৯, ১০৫, ১২৪, ১৪২, ১৬১, ১৬৭, ১৭১, ১৭৩, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৯৮, ২০০, ২০৫, ২০৬
আরো একজন – ১৯০, ১৯৩
আলমের নিজের বাড়ি – ১৪
আহত অর্জুন – ১৬

ঈ

ঈশ্বরীতলার রূপোকথা – ২০১, ২০২

উ

উড়োচিঠি – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৯, ৫১, ১১১, ১১৫, ১৬৪, ১৭৭, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ২১৫

এ

একক দশক শতক – ২০৮
একক প্রদর্শনী – ১৯০
একটি মন্দিরে জন্ম ও মৃত্যু – ১৫
একদা – ৪৮
একদা ক্রিকেট – ২০০

একদা ট্রেনে – ২১২
একদিন সারাদিন – ২৬, ২৭, ৬৭, ১৬৩, ১৬৯, ২১৫
এম্পিয়ারিং – ২০০
একা – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪১, ১০৯, ১৪৩, ১৪৫, ১৬৫, ১৬৯, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৪, ১৯৮
এখনই – ২০৩
এখন আমার আর কোনো অসুখ নেই – ১৯০
এখানে বিরাজি শুয়ে আছে – ২০১, ২০২

ও

ওঠা কিংবা নামা – ৭৮, ১০০

ক

কড়ি দিয়ে কিনলাম – ২০৮
কিছু স্মৃতি, কিছু অপমান – ১৬
কুবেরের বিষয় আশয় – ২০১
কেরানী পাড়ার কাব্য – ১৯২

খ

খড়কুটো – ১৯২
খারিজ – ১৯৩, ১৯৪
খেলা – ১৫
খোয়াই – ১৯২

গ

গন্ধের আবির্ভাব – ১৫
গৃহবন্দী – ২৬, ২৭, ৪৯, ৫৩, ৫৫, ১১১
গ্রহণ – ১৯২, ১৯৩

ঘ

ঘরবাড়ি – ২৬, ২৭, ৫৩, ৫৬, ৯৩, ৯৪, ১২৫, ১৮৫
ঘরে বাইরে – ৪৮
ঘুণপোকা – ১৯৮, ২০৫, ২০৬

চ

চন্দনেশ্বর জংশন – ২০১, ২০২
চরিত্র – ২৬, ২৭, ৩৮, ৫২, ১০৮, ১২৪, ১৪৪, ১৭৫, ১৭৭
চার অধ্যায় – ৪৮
চিলেকোঠা – ১৫
চেনামহল – ২০৮

ছ

ছন্দপতন – ১৩, ১৪
ছাগল বিষয়ে দু-চার কথা – ১৫
ছাদ – ১৯৪, ১৯৬

জ

জাগরী – ৪৮
জীবন যেরকম – ২০৩, ২০৮

ঢ

ঢেউ – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৪৫, ৫৩, ৬১, ১১০, ১৪৫, ১৮৩, ২০৩, ২১৪

ত

তিন পুরুষ – ৪৮
তৃতীয় ভুবন – ১৯৬, ২২১

তোমার ভালোবাসা – ১৬

দ

দম্পতী – ২০৮
দাঁত – ১৫
দুঃসময় – ১৫
দূরবীন – ২০৭
দূরভাষিণী – ২০৮
দেওয়াল – ১৯০
দেহমনের বৈতালিক – ১৯
দ্বাদশ ব্যক্তি – ১৯০, ১৯৮

ধ

ধুলো মাটি – ২১১

ন

নক্ষত্রের রাত – ১১৮
ননীদা নট আউট – ২০০
নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান – ১৯০, ১৯১
নিয়ম – ১৩, ১৪
নির্বান্ধব – ২০১
নির্বাসন, নয় নির্বাচন – ১৬

প

পথের পাঁচালী – ৫
পথের দাবী – ৪৮
পরস্ত্রী – ২০১
পরাজিত সম্রাট – ১৯৩
পরিচয় – ১৯২
পারাপার – ১৯৬, ২০৫, ২০৬
পুতুল নাচের ইতিকথা – ২০
পুরুষ – ৬৪
পূর্ণ-অপূর্ণ – ১৯২
প্রণয়চিহ্ন – ২৬, ২৭, ২৮, ৩৬, ৯২, ১২১, ১২২, ১৩৯, ১৬২, ১৬৮, ১৮০, ২১০
প্রতিদ্বন্দ্বী – ২০৩, ২০৪
প্রতিনায়ক – ১৫
প্রথম কদমফুল – ২০৮
প্রথম প্রহর – ১৯৩
প্রেমপত্র – ১৯

ব

বড় ছেলে ছোট ছেলে – ১৬, ১১৫
বনপলাশির পদাবলী – ১৯৩
বন্যাকন্যা – ২০৮
বহুদূর অভিমান – ২৬, ৬৭, ৭৭, ১৫২, ১৮৪
বাড়ি বদলে যায় – ১৯৪, ১৯৬
বাহিরি – ১৯৪, ১৯৫
বারো ঘর এক উঠোন – ২০৮
বিনিদ্র – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৫, ৪৭, ৬২, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১৪৫, ১৬৪, ১৯৮, ২০৩
বিবর – ২০৩
বিবাহবার্ষিকী – ২১১
বৃষ্টির পরে – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪০, ১১০, ১৬৪, ২০৯

ভ

ভুবনেশ্বরী – ১৯২

ভেবেছিলাম – ২৬, ২৭, ৩১, ১০১, ১৬১, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০, ১৯৬, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬
ভোরের আড়াল – ২৬, ৬৭, ১২৯, ২০৪

ম

মধ্যরাত – ২৬, ২৭, ২৮, ৩৫, ৬৩, ৯১, ১২৭, ১৬১, ১৬৭
মহাদশায় – ১৫
মহানগর – ২০৮
মাইন নদীর জল – ২৬, ৫৭
মাছ – ১৫
মাড়িয়ে যাওয়া – ১৫
মাত্র কয়েকদিন – ২৬, ৬৭, ৭৩, ১৪৭, ১৫০, ১৬৯, ১৮৪
মানবজমিন – ২০৫, ২০৭
মানুষের মুখ – ১৫
মায়াতরু – ১৪
মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ – ১৪, ১৫
মূকাভিনয় – ১৪, ১৫
মৌনমুখর – ২০, ২৬, ২৮, ৬৭, ৬৮, ১৮৪, ২০২

য

যখন বৃষ্টি – ২৬, ৬৭, ৭৭, ১৫২
যদুবংশ – ২০৩
যুগ যুগ জিয়ে – ২১২

র

রজত জয়ন্তী – ১৪
রাজার বাড়ি অনেক দূরে – ১৬
রোম আর রম্য – ১৯

ল

লজ্জা – ১৯৩, ১৯৪
লালবাঈ – ১৯৩

শ

শতবর্ষে চলচ্চিত্র – ২০, ৬৭
শব্দ চাই, দাও – ১৬
শব্দের খাঁচায় – ২১২
শাহজাদা দারাশুকো – ২০১
শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি – ১৪, ১৫
শুক্রে শনি – ১৪
শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে – ৪৮
শোকসভা – ১৫
শ্যাওলা – ২০৫, ২১২
শ্রীকান্ত – ৫

স

সংঘাত – ২৬, ২৭, ৬৭, ৬৯, ৯৪, ৯৮, ১০০
সঙ্গ ও প্রসঙ্গ – ১৯
সতর্কবার্তা – ১৬
সন্ধিক্ষণ – ১৮, ২৬, ২৭, ৩৮, ১০২, ১১৬, ১২৩, ১২৫, ১৪৫, ১৬৩, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৯৮, ২০৫, ২১৪
সবুজগন্ধ – ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৩, ৯৩, ১৭০

সম্পর্ক – ১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ৩৮, ৪৫, ৪৭, ৬২, ১০৪, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১৪১, ১৪৪, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০, ১৯৮, ২০৩
সহযোদ্ধা – ২৬, ২৭, ৪৯, ৫৩, ৬৩, ৬৯, ১০০, ১২৭, ১২৮, ১৬২, ১৬৪, ১৮১, ১৯১, ২১৪
সাদা দেওয়াল – ১৯৩
সাহিত্যের পথে – ১৮৯
সিতাংশু – ১৫
সিনেমা থিয়েটার – ১৯
সিনেমায় যেমন হয় – ২৬, ২৭, ৪৫, ৫৩, ৫৯, ১৬৯
সিন্ধু বারোয়াঁ – ১৭, ২৬, ২৭, ২৮, ৮৭, ১১৯, ১২০, ১৩৬, ১৪০, ১৪১, ১৬০, ১৬৮, ১৭৫, ১৮০
সীমানা – ১৫
সেকেন্ড হনিমুন – ২৬, ২৭, ৬৭, ৭৫, ১৫২, ১৬৯
সেদিন চৈত্রমাস – ২৬, ২৮, ৩০, ৮৮, ৯৩, ১২০, ১৩৭, ১৬১, ১৬৮, ১৬৯, ১৮২
সোনালী জীবন – ২৬, ২৮, ৫৩, ৬০, ৯৪, ৯৭, ১২৬, ১৪৫, ১৪৬, ১৭০, ১৭৫, ১৭৮, ১৮০
সোহিনী এখন কোথায় – ২৬, ৬৩, ৬৭, ৭৫, ১১৮, ১৫৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৮৩, ১৯৫, ১৯৬, ২১৪
স্টপার – ২০০
স্ট্রাইকার – ২০০
স্বর্গের আগের স্টেশন – ২০১
স্বর্গের পাশের বাড়ি – ২০১
স্মৃতির মতন কিছু – ১৬

হ

হঠাৎ একদিন – ২৬, ২৭, ৬৭, ৭৩, ৭৪, ১৩৫, ১৪৮, ১৫০
হাওয়া গাড়ি – ২০১
হাজার চুরাশির মা – ২১৩
হিন্দু – ১৪

ব্যক্তিনাম :

অ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত – ২০৮

অনুরূপা দেবী – ১০

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় – ১৯৯

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত – ৬

অসীম রায় – ২১২

আ

অ্যাডলার – ১৩৫

ই

ইয়ুং – ১৩৫, ১৪১, ১৪৯, ১৫০, ১৫১

উ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় – ১০

এ

এড্ওয়ার্ড দুজারদিন – ১৪৬

এরিক ফ্রম – ১৩৫

ও

ওয়েনার রেফিল্ড – ৬

ক

কাফ্কা – ২১

কাম্যু – ২১, ২২, ১৭০

গ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র – ২১৩

গুস্তাভ ফ্লবেয়ার – ১৩৫

গোপাল হালদার – ৪৮, ১৩৫

জ

জগদীশ গুপ্ত – ১৩৫

জাক লাকাঁ – ১৩৫, ১৪৪, ১৪৫

জীবনানন্দ দাশ – ১৬, ১১৪, ১৭৯

জেন অস্টেন – ৬

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী– ১২, ২০৮

ট

টলস্টয় – ১৩৫

ড

ডিকেন্স – ৬

ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ান – ৬

ত

তপোবিজয় ঘোষ – ২১৩

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় – ৬, ১২, ১৩৫

দ

দস্তয়েভস্কি – ২১, ১৩৫

দিব্যেন্দু পালিত – ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৪, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯২, ৯৪,

৯৫, ৯৯, ১০১, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৪, ১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৯, ১৯০, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ২০২, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১৩, ২১৪, ২১৫
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় – ১৮৯, ১৯৬, ২১১
দেবেশ রায় – ১৮, ৪৮, ২০৫

ধ

ধনঞ্জয় বৈরাগী – ২০৮
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় – ১৩৫

ন

ননী ভৌমিক – ২০৮, ২১১
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য – ৬
নরেন্দ্রনাথ মিত্র – ৬, ৮, ১২, ১৯, ২০৮
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় – ৬, ১৪, ২১, ২১৩
নিরুপমা দেবী – ১০
নির্মাল্য আচার্য্য – ২০

প

পবিত্র সরকার – ১৫, ২১
প্রেমেন্দ্র মিত্র – ১৫

ফ

ফাদার ফালো – ৬
ফ্রয়েড – ১৩৫, ১৪৪, ১৪৫

ব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – ৬, ১৩৫, ১৭৯
বনফুল – ৪, ১১, ১২
বরেন গঙ্গোপাধ্যায় – ১৮, ২০৫
বিভাস চক্রবর্তী – ৬৭
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৪, ৫, ৬, ১০, ১২
বিমল কর – ৮, ১২, ১৩, ১৪, ১৮, ২১, ৩৬, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ২০৩, ২০৮
বিমল মিত্র – ২০৮
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত – ১৫
বুদ্ধদেব বসু – ৬, ৮, ১২, ১৮, ১৯, ২১, ১৩৫, ১৭৯

ভ

ভার্জিনিয়া উলফ্ - ১৩৫
ভ্লাদিমির নবোকভ – ১৩৫

ম

মতি নন্দী – ১৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০৫
মনোজ মিত্র – ৬৭
মপাসাঁ – ৬
মহাশ্বেতা দেবী – ৪৮, ২১৩
মাদার আতোঁয়ানি – ৬

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় – ৬, ১২, ২০, ১৩৫
মার্ক্স – ১৩৫
মৃণাল সেন – ৬৭

র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ৬, ১২, ৪৮, ১৩৫, ১৭৯, ১৮৯, ১৯৯
রমাপদ চৌধুরী – ৮, ৪৫, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৬, ২০৩

ল

লরেন্স – ১৩৫
লেওন এডেল – ১৪৩

শ

শক্তি চট্টোপাধ্যায় – ১৮
শঙ্খ ঘোষ – ১৮
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৩৫, ১৭৯
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় – ১০, ১৮, ১৮৯, ১৯৬, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১২
শৈবাল মিত্র – ২১২, ২১৩
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় – ১৮, ১৮৯, ২০১, ২০২

স

সতীনাথ ভাদুড়ী – ১২, ৪৮
সন্তোষ কুমার ঘোষ – ৬, ৮, ১২, ১৪
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় – ১৮৯, ১৯০
সমরেশ মজুমদার – ২১২
সমরেশ বসু – ১২, ১৯, ৪৮, ২০৩, ২১২
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় – ১৯৭, ২০৫, ২১৪
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত – ৬, ১৯৭
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় – ১৮, ১৮৯, ১৯৬, ২০৩, ২০৪, ২০৯
সুবোধ ঘোষ – ৬, ১৩, ২১
সুভাষ মুখোপাধ্যায় – ৬০
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ – ১৮, ২১৩
স্বর্ণ মিত্র – ২১২

হ

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় – ১১
হেনরি জেমস – ১৩৫

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৬ পৃ.
তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৩১ সংখ্যা, মার্চ, ২০২১

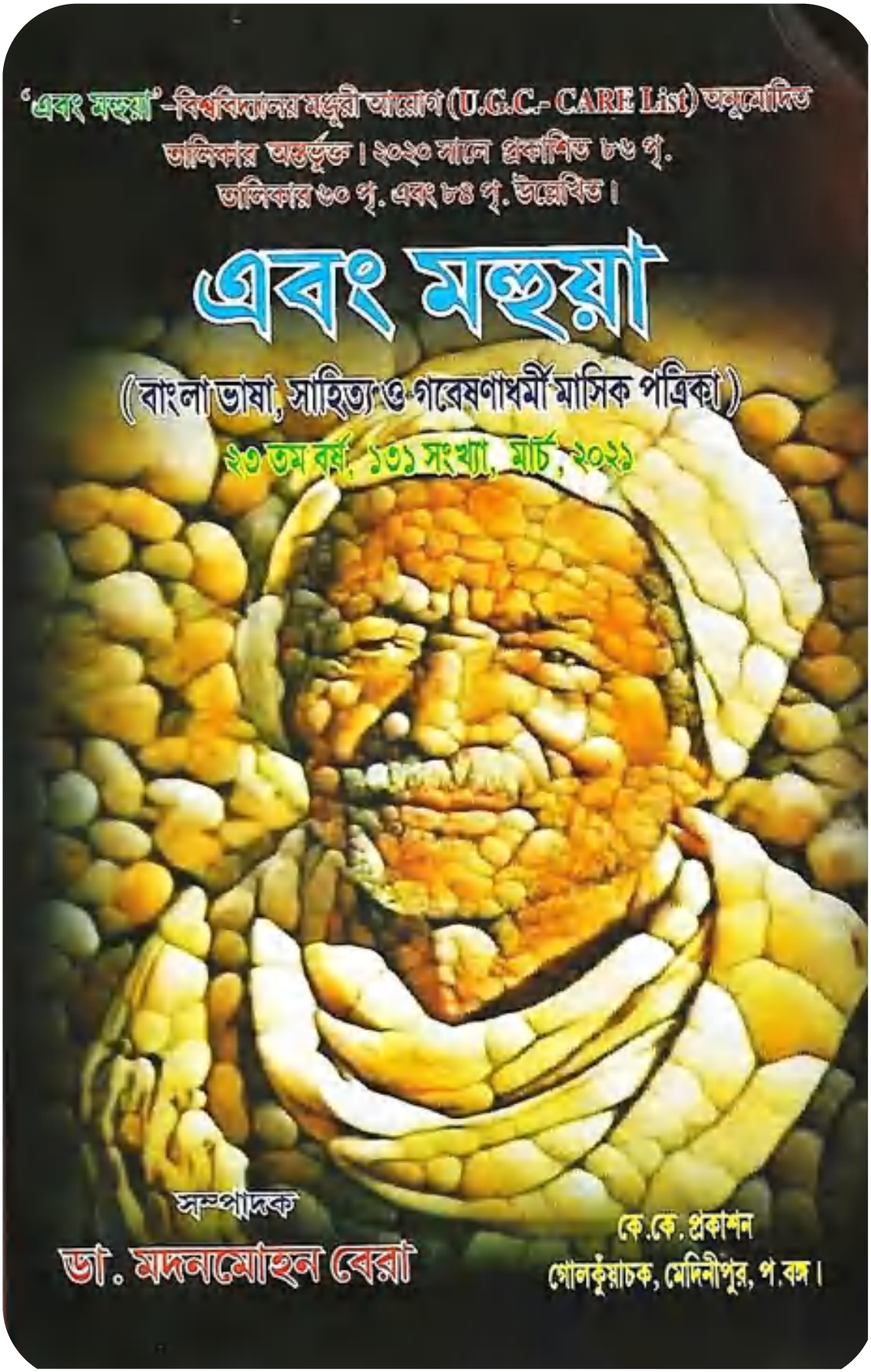

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২০সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩তম বর্ষ, ১৩১ সংখ্যা
মার্চ,২০২১

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

সূচিপত্র

১.পূর্ব মেদিনীপুরের লোকবিশ্বাসে লৌকিক দেবদেবীর স্থান :
একটি পর্যালোচনা :: মুক্তেশ্বর দাস.....৯
২.রমেশ চন্দ্র সেনের উপন্যাস 'পূর্ব থেকে পশ্চিমে' :
দেশ ভাগের গোটা ইতিবৃত্ত :: অচিন্ত্য সে.....১৮
৩.রামকৃষ্ণদেবের চতুর আর্যসত্য :: অভিজিত মণ্ডল.....২৮
৪.পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ :
প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' :: বরুণ সীট.....৩৬
৫.ভস্মপুতুল : সঙ্গ নিঃসঙ্গতার চরিত্রশালা :: বিমান দাস.....৪১
৬.জৈব সৌর কোষ : সংক্ষিপ্ত আলোকপাত
:: বিশ্বজিৎ হালদার.....৪৭
৭.নাট্যচর্চার আঙিনায় পশ্চিম বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলের
নাট্যচর্চার অবদান :: দীপক মুদি.....৫৪
৮.চাকমা উপজাতির সমাজজীবন ও সংস্কৃতি : 'গোমতী'
উপন্যাসের আলোকে :: চাঁদমালা খাতুন.....৬২
৯.সাহিত্যে নারী : প্রসঙ্গ বারাঙ্গনা ও যৌনতা
:: দেবাশিস সরদার.....৭০
১০.মূল্যবোধ ও সুস্থ সমাজ : প্রেক্ষাপট কাণ্টের নীতিতত্ত্ব
:: ভবেশ গায়েন.....৭৪
১১.গণনাট্য সংঘের নাটকে তেভাগা-কৃষক আন্দোলন
:: অর্পণ দাস.....৮০
১২.শ্রীঅরবিন্দ ও ভারতীয় সংস্কৃতি :: অজয় কুমার দাস.....৮৯
১৩.অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাস :
লোকভাষা সন্ধান :: আতোয়ার হোসেন.....১০২
১৪.রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ':
বাংলা কাব্য দর্শনের প্রথম পাঠ :: গোপাল ঘোষ.....১১৩
১৫.বিবর্তনের স্রোতে বাংলা ছোটো পত্রিকা : লিটল
ম্যাগাজিন থেকে ওয়েবজিন :: জয় চক্রবর্তী.....১২২
১৬.প্রাদেশিক ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ ও অনুসরণ
:: কৈলাশপতি সাহা.....১২৮

১৭.নদীয়া জেলার আদিবাসী সমাজ :: কৃত্তিবাস দত্ত.....১৩৭
১৮.বাণী বসুর উপন্যাসে ভারতকথার নবনির্মাণ
:: মধুমিতা রক্ষিত.....১৫১
১৯.নীতিবিদ্যার আলোকে রোগী –চিকিৎসক সম্পর্ক
:: মন্দ্রিতা ভট্টাচার্য আইচ.....১৬৬
২০.পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশগত স্বাস্থ্য আন্দোলনের ইতিহাস :
প্রসঙ্গ চিকিৎসা-বর্জ্য দূষণ :: নটরাজ মালাকার.....১৭১
২১.কৃষক আন্দোলন : স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটক
:: পাপিয়া নস্কর.....১৭৭
২২.স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু নারী সমাজ ও
সমকালীন রাজনীতি : একটি পর্যালোচনা:: পায়েল নন্দী.....১৮৬
২৩.মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের স্বর ও সংকেট : প্রসঙ্গ কবি
বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' :: পিংকি বর্মণ.....১৯৪
২৪.শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস নিবিড়পাঠে::রাজীব ঘোষ.....২০২
২৫.ঔপনিবেশিক শাসনকালে উত্তরবঙ্গের রাভা সমাজের
রূপান্তরের উৎস সন্ধানে :: রমেশ চন্দ্র বর্মন.....২০৮
২৬.দিব্যেন্দু পালিতের 'সহযোদ্ধা' : আদিত্যর প্রতিবাদী সত্তা
:: রবীন্দ্র কুমার বর্মন.....২১৬
২৭.উত্তর আধুনিকতা : জয় গোস্বামী
:: সাজিত হোসেন দফাদার.....২২১
২৮.উপনিষদ সাহিত্যে মানবিক মূল্যবোধ
:: সঞ্চিতা কুণ্ডু.....২২৬
২৯.জন্মশতবর্ষ-উত্তর রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বান্দ্বিকতা :
'অমৃত' ও 'দেশ' পত্রিকা :: সন্ধ্যা মন্ডল.....২৩২
৩০.ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'হাড়' পর্যবেক্ষণ
:: সারমিন রহমান.....২৩৮
৩১.প্রসঙ্গ সংরক্ষণ : স্বাধীনতোত্তর পর্বের একটি রূপরেখা
:: সেন্টু কোনাই.....২৪৩
৩২.একুশ শতকের প্রেম চেতনা :: শুভব্রত মাইতি.....২৫৩
৩৩.বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ব্যবহার
ও তাৎপর্য : প্রসঙ্গ 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' :: স্বরূপ হালদার.....২৫৬
৩৪.দলিত আন্দোলন ও ড: বি. আর. আম্বেদকর

দিব্যেন্দু পালিতের 'সহযোদ্ধা':আদিত্য-র প্রতিবাদী সত্তা

রবীন্দ্র কুমার বর্মন

"মানুষ মেরেছি আমি— তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; " ('১৯৪৬-৪৭' / জীবনানন্দ দাশ)

দিব্যেন্দু পালিতের 'সহযোদ্ধা' (১৯৮৪) উপন্যাসের নায়ক আদিত্য রায় এরকমই একজন নিহত মানুষের ভাই হয়ে উঠেছেন। তার বিবেকে গেঁথে গেছে একটি ঘটনা। সে একটি গুপ্ত রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ডের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। সে চায় গুপ্ত ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসুক এবং ক্রমশ তা হয়ে উঠুক আলোচনা ও প্রতিবাদের বিষয়।

'সহযোদ্ধা' উপন্যাসটি আটের দশকের গোড়ায় রচিত। কিন্তু এর পটভূমিতে রয়েছে ছয়-সাতের দশকের নকশাল আন্দোলন। চারিদিকে তখন বারুদের গন্ধ। ষোলো থেকে ছত্রিশ বছর হলেই পুলিশ এনকাউন্টার করে। তবুও যুবশক্তি শোষণশক্তির হাত থেকে মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। এই টালমাটাল রাজনৈতিক হাওয়ার ঝড় আদিত্য রায়ের গায়েও লেগেছিল। তবে রাজনীতির কোনো মতাদর্শ এখানে নেই। উপন্যাসের পরিণতিতে স্থায়িত্ব লাভ করেছে আদিত্যর বিবেক।

একদিন ভোরে মর্নিং-ওয়াকে গিয়ে আদিত্য পুলিশের গুলিতে একটি রোগা ও লম্বা লোককে নিহত হতে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে আসে বাড়িতে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার আত্মবিবেক জেগে ওঠে এবং আত্মদ্বন্দ্বে ভুগে। সে সাক্ষ্য দিবে কী না? পুলিশের কাছে জানাবে কী না? জানিয়েই বা লাভ কী? আর যে খুন হলো তার সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও কেন সে সাক্ষ্য দিবে? কিংবা যে খুন হলো সে কোনোদিন জানতেই পারলো না তার খুনের কেউ সাক্ষী আছে? খুনীদের কোনো বিচার হবে কী না? তার মনে প্রশ্ন জাগে, এই যে আমি এতদিন ধরে লেখার মধ্যদিয়ে যা বলতে চেয়েছি, এই যে প্রতিবাদের এত বিবৃতি দিয়েছি। এর অর্থ কি? প্রচণ্ড যন্ত্রণাবোধ মনে নিয়ে দুদিন কেটে যায়। অবশেষে সে স্থির করে থানায় ডায়েরি করবে। পার্ক স্ট্রিট থানায় ফোন করে ঘটনাটি জানালে থানা থেকে তাকে রূঢ়ভাবে ধমক দেওয়া হয়। আদিত্য শেষ পর্যন্ত খুনের প্রমাণ হিসাবে খবরের কাগজে স্বনামে চিঠি লিখে। লিখে সে খুন হতে দেখেছে। সমস্ত ঘটনাটির সঙ্গে মিলে যায় একটা খবর, নকশালদের একজন বড়ো নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং চারু মজুমদার

স্টেটমেন্ট দিয়েছে, সেদিন ভোর রাতেই তাকে পুলিশ মেরে ফেলেছে। তাই নকশালরাও আদিত্যকে রাতে ফোন করে হুমকি দেয়, "আপনাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে যাকে মার্ডার করা হয়েছে সে কমরেড শৈবাল মজুমদার। তিনদিন সময় দেওয়া হল। আমাদের অর্ডার না শুনলে আপনাকে শ্রেণিশত্রু বলে ধরে নেওয়া হবে।"[১] আদিত্যর মনে বিস্ফোরণ ওঠে। তার কানে নিজেরই কণ্ঠস্বর বাজতে থাকে সে 'হিপোক্রিট' বা 'কাওয়ার্ড' নয়।

আদিত্যর স্রষ্টা দিব্যেন্দু পালিতের জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটেছিল। ৮ জুন ১৯৯২ সালে বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে চোখের সামনে অন্যায় ঘটতে দেখে চুপ করে থাকতে পারেননি দিব্যেন্দু পালিত। তিনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। এরপর তাঁকে চিঠিতে, ফোনে, এমনকি প্রত্যক্ষেও অনেকে ভয় দেখিয়েছিলেন। এছাড়াও দু'একটি বেনামী চিঠিতে এমন কথাও লেখা হয়েছিল যে, তিনি যে আঙ্গুল দিয়ে ঐ প্রতিবাদ লিখেছেন, সেই হাত কেটে ফেলা হবে। যেন আর কোনো দিনও এরকম দুঃসাহস দেখাতে না পারেন। কার্যক্ষেত্রে সেরকম কিছুই ঘটেনি। কিন্তু মনোভাবটা অস্পষ্ট ছিল না।[২]

আদিত্য একটি বড়ো কোম্পানীর (কমার্সিয়াল ফার্ম) এক্সিকিউটিভ এবং প্রতিবাদী লেখক হিসাবে তার খ্যাতি। 'স্বকাল', 'শঙ্খ' প্রভৃতি পত্রিকায় তার লেখা নিয়মিত বের হয় ন। সে বলে, "লেখক হিসেবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে আমি রাইফেল হাতে রাস্তায় নামব না; শ্রেণি সংগ্রামের জিগির তুলে সস্তা হাততালি পাবার দিকেও যাব না। আপনি তো জানেন, আমি কংগ্রেস, কমিউনিস্ট কি নকশাল— কোনও রাজনৈতিক দলেরই সদস্য নই।"[৩] ঘটনাটির কোনো সাক্ষী নেই বলে আদিত্যকে একা লড়াইয়ে নামতে হয়েছে। লড়াইয়ের চেহারাও পৃথক। সে এক নিঃশব্দ বিপ্লব। আদিত্য বুঝতে পারে সে একটা অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। যে সময় মানুষের মনের মধ্যে হারিয়ে গেছে বিশ্বাস, প্রতিবাদ করার ন্যূনতম ভাষাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে মানুষ। গণতন্ত্রের কণ্ঠকে রোধ করার জন্য সরকার তৎপর হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রপতি শাসনে দেশ চলছিল। কোনো স্তরের মানুষেরই বাকস্বাধীনতা ছিল না। সাংবাদিক এমনকি শিল্পীরও নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা ছিল না। পুলিশি হামলায় বহু যুবকের মৃত্যু হয়েছে। দেশের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন অনেকেই— "গত চার-পাঁচ বছরে আমাদের বেস্ট বয়েজদের একটা জেনারেশন শেষ হয়ে গেল। বিপ্লবের স্বপ্ন না দেখে এরা পড়াশুনা করে সহজেই চাকরি-বাকরি, প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেতে পারত। ভুল হোক, ঠিক হোক, কী অসম্ভব সাহস, আত্মত্যাগ! দেশ একদিন এদের মিস করবে। একদিন বুঝতে পারবে—।"[৪] কয়েকদিন আগে বেলেঘাটার খালপাড়ায় চারটে ছেলেকে গুলি করে মেরেছে পুলিশ। খবরটা শুনেই নিরাপত্তার চিন্তায় ডান হাতের মুঠো হাঁটুর উপর ঠুকতে থাকে, দাঁত দিয়ে চেপে ধরে ভিতরের ঠোঁট। কেননা নিজের ছেলে বাচ্চুর আর কয়েক মাস পরে ষোলো হবে। সে এক নিরাপদ আশ্রয়ের

জন্য চিন্তা করতে থাকে। মেয়ে পৃথার কলেজ বন্ধ। প্রতি দিন তার বন্ধুদের গ্রেপ্তারে মেয়েটাও ভেঙে পড়েছে। জীবন বদলে যাচ্ছে ক্রমশ— টান পড়ছে শিকড়ে। কার্ফুর আতঙ্কে যত দ্রুত সম্ভব সকলেই ঢুকে পড়তে চাইছে আশ্রয়ে। সঙ্গে সঙ্গে পালটে যাচ্ছে নিরাপত্তাও।

আবার লেখক সুবন্ধু মিত্র প্রশাসনকে আক্রমণ করে 'জল্লাদের প্রশাসন' লেখার জন্য অ্যারেস্ট হয়েছে। বিদ্রোহী লেখা প্রকাশিত হওয়ায় 'স্বকাল' পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেছে। সম্পাদক দেবু চৌধুরী সরকারি রোষে প্রকাশনা বন্ধ হওয়ায় চরম আতঙ্কের মুখে পড়েছে। এরকম অবস্থায় আদিত্য রায়ের সরকার বিরোধী লেখা প্রকাশ করতে সে দ্বিধাগ্রস্থ। এই পরিস্থিতিতেও আদিত্য মনে মনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে।

তবে এরকম লড়াইয়ে সে ক্রমশ একা হতে থাকে। মনে একটা প্রবল ধাক্কা লাগে। ক্রমশ অস্থির হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষ কোনো রাজনীতি সে করে না। সবসময় নিজের কাছে সৎ থাকতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই সময় তার লড়াইটা শুধু গোটা সিস্টেমের বিরুদ্ধেই নয়, নিজেরও বিরুদ্ধে। ঘটনাটি বন্ধু ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অশোক দত্তকে জানালে সে আদিত্যকে সতর্ক করে দেয়। স্ত্রী শ্বেতাও তাকে সন্দেহ করেছে, প্রশ্ন করেছে— "তোমার হেঁয়ালি কিছুই বুঝি না। নিজেও মরবে, আমাদেরও মারবে।"* স্ত্রীর কাছে আদিত্য খোলামেলা হতে পারেনি। সে বুঝতে পেরেছে এই লড়াইটা তার একার। তার এই ভাবনা চেঁচিয়ে বললেও কেউ বুঝতে পারবে না। আসলে তার অবস্থা হয়েছে—

আলো-অন্ধকারে যাই— মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয়— শান্তি নয়— ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;

('বোধ' / জীবনানন্দ দাশ)

লোকাল থানার পুলিশ ২৩ আগস্ট গভীর রাতে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির হয় আদিত্যর বাড়ি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না থাকলেও এই মুহূর্তে আদিত্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে এক অলৌকিক শক্তি। সাধারণ মানুষ বিমূঢ় অবস্থায় যা করতে বাধ্য হয়। মেয়ে পৃথা ভবিষ্যতের ভয়ংকর পরস্থিতি বুঝে ভয় পেলে আদিত্য দৃঢ় কণ্ঠে জানায়, "মারা সহজ নয়। বুঝতে পারছিস না, ওরা ভয় না পেলে আমাকে অ্যারেস্ট করার কথা ভাবত না।"*

আদিত্য সাহসী, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, সামাজিক বোধ এবং বিবেকধর্মী। উপন্যাসের শেষে তার মনন মৃত্যুঞ্জয়ী উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ। এমনকি তার স্রষ্টা দিব্যেন্দু পালিতের জীবনদর্শনও তাই। উপন্যাসের শেষে আদিত্যকে যখন পুলিশ নিয়ে যেতে এসেছে তখন মেয়ে ভয় পেয়ে বলেছে 'ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে বাবা', তখন আদিত্যর

কণ্ঠস্বর 'ওরা আমাকে মারতে পারবে না ওরা ভয় পেয়েছে'। এই সাহস, আত্মবিশ্বাস একজন সাহসী শিল্পীর। আর এই উপলব্ধিতে পৌঁছানোতেই দিব্যেন্দু পালিত আদিত্য চরিত্রের শুরু থেকে শেষ অবধি ক্রমবিবর্তন ঘটিয়েছেন।

আদিত্যর উৎস আমরা 'উড়োচিঠি' উপন্যাসের রজতশুভ্রর মধ্যে খুঁজে পাই। রজত স্কুলে পড়াকালীন বিনা কারণে পুলিশের ফাঁদে পড়ে। মিথ্যা খুনের অপবাদে পুলিশের মার খায় ও তিন বছর জেল খাঁটে। কিন্তু জেল থেকে বের হয়ে ভেঙে পড়েনি। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। টুপুরের ভালোবাসা তার কাছে জীবনাশ্রয় হয়ে উঠে। আদিত্য যেন সেই রজতেরই পরিণত বয়স্ক একজন মানুষ। সেদিন পুলিশের যে অত্যাচার রজত গায়ে সহে ছিল, সেই মিথ্যা খুনের অপবাদে ক্ষমতার রাজনীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছিল। সেদিন হয়তো একা সাহস পায়নি রজত লড়াই করতে। কিন্তু আদিত্য সাতচল্লিশ বছর বয়সে একা পুলিশের অমানবিক দমননীতিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। তাকে শেষে জেলে যেতে হয় ঠিকই, কিন্তু প্রশাসন ভয় পেয়েছিল বলেই মুষলধারা বৃষ্টিতে গভীর রাতে তাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছিল।

শুধু তাই নয়, দিব্যেন্দু পালিতেরও পুলিশের আচরণ আর মানবিক ন্যায়বোধের মধ্যে যে ফারাক তার প্রতি রয়েছে অসমর্থন এবং ঘৃণা। আসলে লেখক ভিতরে ভিতরে বহুদিন ধরে এরকম একটি চরিত্র হয়তো খুঁজেছেন কিন্তু রজতের মধ্যে তা পূর্ণতা পায়নি বা যুবক বয়সের যে রক্তের গরম তা দিয়ে তিনি প্রতিবাদ করতে চাননি। তাই সচেতনভাবে আদিত্যকে নিয়ে এলেন।

আটের দশকের গোড়ায় দিব্যেন্দু পালিত এমনই একটি চরিত্র সৃষ্টি করে দেখালেন, যে চৈতন্যের মমতায় শান্ত অথচ দৃঢ় মনোবলের অধিকারী।

তথ্যসূত্র :

১। পালিত, দিব্যেন্দু : সহযোদ্ধা, দশটি উপন্যাস (২), তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট ২০১২, পৃ.- ৬৭।
২। ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত) : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, শারদীয়, ১৪০০, পৃ.- ৭১।
৩। পালিত, দিব্যেন্দু : সহযোদ্ধা, দশটি উপন্যাস (২), তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট ২০১২, পৃ.- ৫১।
৪। তদেব, পৃ.- ৫৩।
৫। তদেব, পৃ.- ৩৮।
৬। তদেব, পৃ.- ৬৯।

সহায়কগ্রন্থ :

১। দাস, অরূপকুমার : ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১২।

২। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : লেখকের মুখোমুখি, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০০৯।

৩। সামন্ত, সুবল : বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অন্বীক্ষা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, ১৯৯৮।

৪। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪।

সহায়ক পত্রপত্রিকা :

১। চক্রবর্তী, কল্যাণ (সম্পাদিত) : দরবারি সাহিত্য পত্রিকা, দিব্যেন্দু পালিত সংখ্যা, ১৩৯১।

২। দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত) : বইয়ের দেশ, দিব্যেন্দু পালিতের মুখোমুখি, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৬।

৩। ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত) : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয়, ১৪০০।

৪। রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি—মার্চ, ২০০৩।

'Ebong Mahua'--UGC - CARE List Approved Journal.
Indian Language - Arts and Humanities Group out of 86
Pages in Page 60 & 84.

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and
Referred with Peer-Review Journal
23 rd Year, 131 Volume
March, 2021

Edited, Printed and Published by
Dr. Madanmohan Bera, Editor.
Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.
Mob.-9153177653
madanmohanbera51@gmail.com
kohinoor.bera @ gmail.com

Rs. 500

৫৫ বছরের ঐতিহ্যময়

সূর্যদেশ

মালীবুড়ো প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত

ISSN 2347-

মালীবুড়ো প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত

সূর্যদেশ

৩ অক্টোবর, ২০২১ সংখ্যা

সম্পাদক

সুস্নাত জানা

সহযোগিতায়

ললিতা জানা, চন্দনেশ্বর নরগার, সুদীপ্ত জানা,
অঞ্জন মাইতি, শিবশংকর রাউল

প্রচ্ছদ

সুশ্রুত জানা

যোগাযোগ

গ্রাম ও ডাকঘর– নরঘোলা, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, সূচক: ৭২১৬৫১

মোবাইল : ৮২৫০৮ ৫৩৪৫১, ৯৪৩৪৩ ৫৪৭২৪

e-mail: susnatajana64@gmail.com

মুদ্রণ

কর্ষিতিকা, কমলেশ নন্দ

রাঙামাটি, মেদিনীপুর, কথা: ৯৮৩২১৩০০৬৮

মূল্য

একশ টাকা

সূ চি

প্রবন্ধ

শিল্পী-সাহিত্যিকরা কি মেহনতী মানুষের জীবনে বহিরাগত । অমৃত মাইতি ৫

কবিতার অন্ধকার যাত্রা । গৌতম ভট্টাচার্য ১৪

শিল্পের মর্ম আচার্য । অঞ্জন মাইতি ২১

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস : চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ । রবীন্দ্র কুমার বর্মন ২৭

সেলিনা হোসেনের ত্রয়ী উপন্যাস : প্রসঙ্গ ত্রিমুখী শ্রেণীচেতনা । আশিস করণ ৪১

গুপময় মান্নার জীবন ও সাহিত্য । গার্গী চট্টোপাধ্যায় ৪৮

স্বাধীনতার ৭৫ বছরে মুসলিম মহিলারা কোথায় দাঁড়িয়ে । রোশেনারা খান ৫২

শহিদ গ্রাম । সুবলচন্দ্র পাল (জটায়ু) ৫৬

লাল শালুক দিঘির কাহিনী । কটিক চাঁদ ঘোষ ৫৯

বন্দী শৈশব । লাবণ্য দরবার ৬৭

যাদের প্রেরণায় লিখি । শোভা চন্দ ৭১

নাটকের চোখে যন্ত্র মানব । চন্দন মাইতি ৭৬

বৈজ্ঞানিক বুড়ো থেকে মালীবুড়ো । সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য ৮০

তুমি রবে নীরবে । নিছা জানা দরবার ৮৪

লক্ষ তারার বিনিদ্র চোখে আমরা রয়েছি জেগে । সুলাতা বেরা ৮৬

ক্ষমতার ভাষা : উপন্যাসের অন্তর্বয়ানে । সুব্রত জানা ৮৯

Relevance of Walt Whitman । Sankar Sarkar ৯৮

Women, Society and the Aspect of Gender Consciousness : An Overview । Dr. Haraprasad Ray ১১০

Mallika Asks Marx । Souharna Jana ১১৭

মালীবুড়ো স্মারক সম্মান ২০২১ । রফিক উল ইসলাম ১২১

মালীবুড়ো স্মারক সম্মান তালিকা ১২৪

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস : চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ

রবীন্দ্র কুমার বর্মন

'বিজ্ঞান মানুষের মনের ভিতরে ঢুকতে পারেনি; ফ্রয়েড-ইয়ুংরাও পারেনি। অন্তত পুরোপুরি।'—'হঠাৎ একদিন' (২০০০) উপন্যাসেরও সূচনায় দিব্যেন্দু পালিত একথা বলেছেন। সত্যি নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা এবং সেই সম্পর্ককে ঘিরে নারী-পুরুষের মনোজগতের বিচিত্র দিক সবসময় কোনো তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফ্রয়েড, ইয়ুং, এরিখ ফ্রম, জাঁক লাকা প্রমুখের চিন্তাধারায় নারী- পুরুষের মনস্তত্ত্ব সবসময় একভাবে ধরা পড়েনি। আরো গভীরে কোথায় যেন ফাঁক থেকেই যায়। এই মনোজগতের চেতনা-প্রবাহের উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন গুস্তাভ ফ্লবেয়ার, ফিওদর দস্তয়োভস্কি, লিও টলস্টয়, হেনরি জেমস, ভার্জিনিয়া উলফ্, ডি. এইচ. লরেন্স, জেমস জয়েস, ভ্লাদিমির নবোকভ প্রমুখ। বাংলার সাহিত্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, গোপাল হালদার, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে নরনারীর সম্পর্ক এবং তাদের মনোবিশ্লেষণে নিত্য নতুন ভাবনা নিয়ে আসেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতাসম্পন্ন নরনারীর জীবন প্যাটার্নের বিচিত্র আবেগ ও অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। আবেগের সঙ্গে অনুভব ও ইচ্ছার সম্বন্ধসূত্রে মন সক্রিয় হয়। আর সেই সক্রিয় চেতনার অবলম্বন হচ্ছে দেহ। মানুষের মনোদৈহিক তাড়নার অবদমন দীর্ঘতর হলে জন্ম নেয় মানসিক ব্যাধি। মানুষের মনোজগতের বিকলন, বহুমাত্রিক বিচ্ছিন্নতা, বিচিত্র টানাপোড়েন, অস্তিত্বের সংগ্রাম সবকিছুই ভিন্নমাত্রার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উঠে এসেছে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে। যতই আধুনিকতার ছাপ ছড়িয়ে অত্যাধুনিক হয়ে উঠেছে মানুষ ততই তার ভিতরে জন্ম নিচ্ছে অতৃপ্তি আর অপ্রাপ্তির ক্লেদ। সংবেদনশীল মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত, হারিয়ে ফেলছে প্রিয়জনের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ সহানুভূতি। ফলে মানুষ হয়ে পড়েছে আত্মমুখী,

নিঃসঙ্গ। এই চলমান অস্থির সময়ে নারী-পুরুষ বিভিন্ন বিকারের মধ্যে প্রবেশ করছে হতাশা কাটিয়ে উঠতে না পেরে কেউ কেউ আত্মবিনাশের পথও খুঁজে নিয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার নিগূঢ় মনোবিকলন এই সময়ে দিব্যে পালিতের উপন্যাসে ফুটে ওঠে।

দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ'র মনস্তাত্ত্বিক,সংকটের বীজ উ হয়েছে অরুন্ধতীকে ঘিরে। প্রেমিক পুরুষ সৌম্যর সঙ্গে বিয়ে না হওয়ায় সে কিছুটা অভিমা আর আত্মমুখী হয়ে পড়েছে। যার ফলে বিভাসের সঙ্গে তার দাম্পত্যসম্পর্ক সুখের হয়নি পাড়ার বখাটে যুবক সুনীলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং তাকে আত্মহত্যা পথ বেছে নিতে হয়। এই আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে উপন্যাসের শেষে ডাক্তার মি অরুন্ধতীর রোগের রিপোর্টে বলেন—

"...ট্রাবলটা সেন্ট পার্সেন্ট মেন্টাল।...বলতে পারেন, নিউরোসিস। পরস্পর বিরো কোনো আঘাতে বা মন-বিরোধী কোনো একটি ঘটনার এইরকম হওয়া সম্ভব। মস্তি অসাড় হয়ে তখন নিজেকে নিজেই আঘাত করতে চায়। আঘাতের পদ্ধতিও হয় অত্য স্থূল।"[১]

একদিকে সৌম্যকে না পাওয়ার তার ইচ্ছার অবদমন, অন্যদিকে সুনীলকে পছন্দ না করলেও তার সঙ্গে জোর করে মেলামেশা— এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে অরুন্ধতী। সৌম্যকে না পাওয়ায় তার ক্ষোভ, অপূর্ণতা সবই তার নিজের যন্ত্রণাকে বাড়িয়েছে।

অরুন্ধতীকে ঘিরে সৌম্য আর বিভাসের মধ্যে কিছুটা মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে। বিয়ের পরেও সুনীলের সঙ্গে অরুন্ধতীর মেলামেশা মেনে নিতে পারেনি বিভাস। কিন্তু কোনোদিন প্রকাশ্যে বাধাও দিতে পারেনি। একধরনের বিষের জ্বালায় পুড়ে পুড়ে একেবারে শেষ হয়ে গেছে সে। তাদের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তার মনে একধরণের অশান্তি আসে...

"সেই ঘৃণাটাকে অবলম্বন করেই ও ক্রমশ নিজের যন্ত্রণা বাড়িয়ে চলছে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমি তা সহ্য করেছি, এখনও করছি। এই জ্বালার জগৎ থেকে পালাতে পারলে আমি বাঁচতাম।"[২]

তীব্র এক অস্বস্তিতে ছটফট করে সৌম্যও। জ্বালা করে চোখদুটো। আর নিজেরই কথায়—

"চোখ ভরা এই যে জ্বালা, সেটা শুধু একটা আত্মধিক্কার। অরুন্ধতীর কথা মনে পড়লে রাগ হয় না; সুনীলের ওপরেও বিন্দুমাত্র আক্রোশ জাগে না। রাগ হয় শুধু নিজের ওপর। নিজেরই বুকের ভেতর ফুটে ওঠা একটা সুন্দর ভালোবাসাকে অসম্মান করে শুধু অরুন্ধতী নয়; বিভাসের জীবনটাকেও যে বিষময় করে তুলেছে সে।"[৩]

'সেদিন চৈত্রদিন' উপন্যাসে দুই পুরুষের মাঝে অবস্থানরত একজন নারীর মনোদৈহিক সত্তার উন্মোচন ঘটিয়েছেন লেখক। অল্প বয়সে বিয়ে যাওয়া এবং বেশি বয়সের স্বামীকে মেনে নিতে পারেনি। বিবাহিত জীবনে সে সুখ পায়নি। বিয়ের প্রথমরাতে স্বামীর সঙ্গ ভালো লাগেনি তার। সে সুখ অমলেন্দুর কাছে নেয়—

"সেদিন স্পর্শে শরীর সাড়া দেয়নি, জ্বালায় জ্বলেছে। আজকের অনুভূতি অন্য। অমল আজ জ্বালিয়ে দিল; এবং সেই তীব্র উত্তাপে জ্বলে নিজেকে নিঃশেষ করতে করতে এবার মনে হয়েছিল, সে যেন শরীরের সীমায় পৌঁছে গেছে; পুরুষের স্পর্শে এত স্ফূর্তি, সে জানত না; যে এতদিনে তার শরীর সার্থক হল।"[৪]

তাই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী অমলেন্দুর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু অমলেন্দু ভালোবাসলেও আশ্রয় দিতে পারেনি। অপরদিকে তার স্বামী মৃণ্ময়কান্তি আশ্রয় দিতে পারে কিন্তু ভালোবাসতে পারে না। এই অবস্থায় এলার কাছে তার নারীধর্ম বড় হয়ে উঠেছে। সে কারো কাছেই আবদ্ধ থাকতে চায়নি। তাই একসময় স্বামী ও প্রেমিককে ছেড়ে একার জীবন বেছে নিয়েছে সে।

"মন বলে একটা বস্তু আছে,...সে আমার, আমার, আমারই নিজস্ব, তাকে আমি অন্যের মুঠোয় তুলে দিতে পারি না। আমি আমার সর্বস্ব দেব, কিন্তু আমার শূন্যতা যে ভরে দেবে, সে কোথায় ?"[৫]

মনোধর্মে মানুষ ইচ্ছা করে, যে-ইচ্ছা পূরণ করতে পারলে খুশি হয়, তার সবটা না হলেও কিছু কিছু ফলে যায়। 'ভেবেছিলাম' উপন্যাসে কথকের এরকমই ইচ্ছার কথা বলেছেন লেখক। ছোটবেলায় কথক সাঁতার কাটতে পারতো না। জলে তার খুব ভয় ছিল। তার বাল্যবন্ধু সুধাংশু একবার তাকে মাঝ নদীতে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। ডুবে যেতে যেতে কোনরকমে দম নিয়ে তীরে ফিরে আসে। ডুবাডুবির ঘটনার পরও অনেকদিন পর্যন্ত মৃত্যুর আশঙ্কা কথকের মন থেকে দূর হয়নি। নদীর দিকে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল। কথকের ধারণা হয়েছিল, নিতান্ত কৌতুকের জন্য সুধাংশু তাকে মাঝ নদীতে নিয়ে যায়নি। যে-কারণেই হোক সুধাংশুর আক্রোশ ছিল তার উপর এবং সুযোগ পেলেই তাকে হত্যা করবে। এইভাবে মৃত্যুর আশঙ্কা ক্রমশ মুহ্যমান করে ফেলেছিল তাকে। রাত্রে দুঃস্বপ্নও দেখে, সুধাংশু বা সুধাংশুর মতো কেউ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত, আবিষ্ট করত, টেনে নিয়ে যেত জলের মধ্যে এবং ডোবানোর চেষ্টা করত। এইসময় অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করত কথক। এখানে কথক ফোবিয়ায় ভুগেছিল। ফোবিয়া সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন—

"ফোবিয়া একরকমের নিউরোসিস। এই রোগে দেখা যায়, রোগীরা যখন কোনো বিশেষ অবস্থায় পড়ে, তখনি ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে— যদিও ওই অবস্থা বা বস্তুর

মধ্যে বাস্তবিক ভয়াবহতা কিছুই থাকে না। এই সঙ্গে আরও দেখা যায় যে, এই ধরনের রোগীরা সবসময়েই চেষ্টা করে ওই অবস্থায় না পড়ার, অথবা এইসব বস্তুর মুখোমুখি না হওয়ার। যদি ওই অবস্থায় পড়ে যায় তাহলে— কিভাবে সেখান থেকে পালাবে তার পথ খোঁজে।"[৬]

আতঙ্কে, ঘৃণায়, ক্রোধে কথকের অবচেতন মন চেয়েছিল, যে কোনো প্রকারে সুধাংশুর মৃত্যু হোক। দশ-বারো বছর পর টিবি রোগে সুধাংশুর মৃত্যু হয়। তখন হঠাৎ কথকের মনে হয়, সুধাংশুর মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী। এক ধরনের অপরাধবোধের চিন্তায় সে অভিভূত হয়ে পড়ে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে এমন কতগুলি চরিত্র আছে যারা অহেতুক সন্দেহ করে। এরা নিজেদের আত্মীয়, বন্ধু অথবা সহকর্মীদের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। স্বামী বা স্ত্রী চরিত্রে সন্দেহ করে দাম্পত্য জীবনকে বিষিয়ে তোলে। অতি তুচ্ছ কারণে অপমানিত বোধ করে। কেউ এদের অপমান করলে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে মনে হলে এরা সে কথা ভুলে যেতে পারে না, প্রতিশোধের সুযোগ খোঁজে। এরা কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না, বিশ্বাস করে কাউকে কোন কথা বলে না। এরা নিরর্থক ঝগড়াঝাটি করতে অতিশয় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অন্যের দোষ দেখতে নিদারুণ ব্যগ্র হলেও নিজেদের বিরূপ সমালোচনা বরদাস্ত করতে পারে না একেবারেই। নিজেদের প্রাধান্য যেখানে নেই, সেখানে তারা থাকতে চায় না। মনোবিজ্ঞানে একে প্যারানয়েড পারসোনালিটি বা সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিত্বের বিকার বলে। এইরকম ব্যক্তিত্বের বিকার দিব্যেন্দু পালিতের 'প্রণয়চিহ্ন' উপন্যাসের মহীতোষের মধ্যে দেখা যায়। মহীতোষ তার ব্যবসার সুবিধার জন্য স্ত্রীকে মক্কেল ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিজেই ঘনিষ্ঠ হতে বলেছিল। কিন্তু এর মধ্যে যে মানসিক ঔদার্য, তা কোনোকিছুই তার মধ্যে ছিল না। কোনো কারণ ছাড়াই পরবর্তীতে সে স্ত্রীকে সন্দেহ করেছে। এবার কাকার বন্ধু পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গেও জড়িয়ে এষাকে সন্দেহ করেছে মহীতোষ। আসলে সন্দেহ মহীতোষকে অন্ধ করে দিয়েছিল। সন্দেহের বশেই মহীতোষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে—

"খুন আমি তোমাকে করব। তোমরা যত প্রেমিক আছে সকলের সামনে খুন করব। একটা নষ্ট মেয়েমানুষকে কী করে ট্রিট করতে হয় আমি জানি।"[৭]

তাদের দাম্পত্যসম্পর্ক আর টিকেনি। মহীতোষ এষাকে ডিভোর্স দেয় এবং সে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। অপরদিকে এষার মনোবিশ্লেষণ নির্মাণে লেখক কাহিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। দিব্যেন্দু পালিত পুরুষ অপেক্ষা নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বেশি যত্নবান হতেন। নারীর মনকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এষার আর কেউ ছিল না। ডিভোর্স তাকে এক ধরনের মুক্তি দিলেও নিজেকে নিয়ে চিন্তায় ক্লান্তি ছাড়া আর কিছু পায়নি। যত ভেবেছে ততই তীব্র হয়ে উঠেছে তার মানসিক অবসাদ। এর একটি কারণ সে একাকিত্বের ভোগে। একসময় আত্মহত্যার কথাও ভাবতে হয় তাকে, কিন্তু এষা বাঁচতে চায়। সকলের

সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়। তাই এরা বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে মিশেছে। শেখর, মনীশ, পরিতোষ তার প্রেমিক পুরুষ হয়ে ওঠে। তারাই তার সুখদুঃখের সঙ্গী, একাকিত্ব কাটানোর বন্ধু। কিন্তু কামনা-বাসনার অবদমিত ইচ্ছাকে এরা কোনোদিনই ভুলতে পারেনি। তাই খুব সহজেই এরা শেখর কিংবা মনীশের সঙ্গে শরীরী খেলায় মেতে উঠেছে। আর নিজের দেবর পরিতোষকে একসময় সম্পর্কের বন্ধনে ছোট মনে হলেও এখন তাকেই অবচেতন মনে প্রেমিক পুরুষ ভাবতে থাকে।

'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসে চেতন-অবচেতন মিলেমিশে ঘটে চলে প্রগাঢ় এক স্ট্রিম অব কনশাসনেস। উপন্যাসের শুরুতে কনকের মৃত্যুকে ঘিরে দাশরথি, অমিয়, শ্যামল, নিখিল, রেখা, বুলা, ঝুমি— প্রত্যেকটি চরিত্রের বিচিত্র ভাবনার স্রোতকে লেখক তুলে ধরেছেন। কনকের মৃত্যুর দিনে অমিয় বলেছে— 'জেগে থাকার ইচ্ছেটাই ঘুমোতে দিচ্ছে না।' ঘুমের মধ্যেও স্বপ্ন জাগরণ থাকে। নিখিল স্বপ্নেই পেরিয়ে যায় অনেকটা পথ। স্বপ্নে বর্ণিল রঙের রূপবদল চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে নিখুঁতভাবে চিনিয়ে দেয়। সিনেমা হলে ঢুকে ঝুমির চোখের পাতা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে আসে।' 'তখন স্বাভাবিক হলদে রঙ ক্রমশ নীলাভ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পর্দায়, চোখের পলকেই আবার লালের আভা। ঠিক লালও হয়তো নয়— যাকে ক্রিমসন বলে, অনেকটা তাই, রঙের ওঠাপড়া দেখে মনে হয় জলের নিচ দিয়ে তীব্র বাতাস ছুটে চলেছে। ওরই মধ্যে ঘুমন্ত মেয়েটির অস্পষ্ট মুখ ভেসে উঠে হারিয়ে গেল আবার— দুটো তেজী ঘোড়ার পা— ক্রমাগত রঙ বদলের আড়ালে পা দুটি অদৃশ্য হতেই আরেকটি দৃশ্য : অস্ফুট স্তনের ওপর সোনালী অশ্বক্ষুর ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে...''[৮] এখানে জড়িয়ে থাকে যৌনতা ও শরীরী চেতনা।

'সন্ধিক্ষণ' অশান্ত অস্থির নাগরিক ব্যক্তিত্বের অসহায়তা ও বিপন্নতার ছবি। ইয়ুং তাকে বলেছেন— "the yearing for rest that arises in a period of unrest."[৯] সেইজন্য চরিত্রগুলি অবিরাম পথ হাঁটে। বাস্তবের চড়া আলোয় নয়, অন্ধকারে সেই পথ হাঁটা। তার সঙ্গে চলে চেতনাপ্রবাহ। এ হাঁটা শুধু রাস্তায় হাঁটা নয়, মনের সরণী, স্মৃতির সড়কও পেরিয়ে যাওয়া। "রাস্তাটা বড়ো দীর্ঘ মনে হয় অমিয়র। ক্লান্তিতে পা আর চলে না। অথচ মানুষজন চলে, চলে শব্দ, ট্রাফিক সঙ্কেতে মাছের ঝাঁকের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি গাড়ির ঝাঁক, আবার চলতে শুরু করে— ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটর— চলার কোনো বিরাম নেই।"[১০]

অমিয় এক অজানা জগতে নিয়ে যায় পাঠককে। যেখানে এক রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে হয়। অচেনা অলিগলি অরণ্যে পথ পরিক্রমা করার মতো। বাড়ি ফিরে চৌবাচ্চার জলে অনেকক্ষণ স্নান করে অমিয়। প্রত্যুষের অবসাদ আসে। স্ত্রীর নিঃশ্বাসের মতো 'অসংখ্য অদৃশ্য পোকা এই সময় অমিয়র বুক বেয়ে হাঁটাচলা শুরু করে দেয়। হঠাৎ মনে হয় 'টাইমপিসটা তার বুকের ওপর কেউ চেপে ধরেছে।' নিখিলের ক্ষেত্রেও বুলার

সঙ্গে তার সম্পর্কে মৃদু ঘুম এবং পুরনো অবসাদের প্রসঙ্গ আছে।

'সম্পর্ক' উপন্যাসের রামতনুরও রাতে ঘুম আসে না। রীতিমতো অবসন্নবোধ করে সে। অপরাধবোধ তার সমস্ত মন জুড়ে বসে। বড়ো ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রামতনু কাজপাগল মানুষ। তার কাছে পরিবারের জন্য নৈতিক দায়িত্বটুকুও পালনের অবসর ছিল না। মেয়ের সঙ্গে স্টেশনে যাবার কথা ছিল। কিন্তু কথা দিয়েও যেতে পারেনি। সে ভুলে যায়। এরপর শুরু হয় তার দ্বিতীয় সত্তার আলোড়ন—

"নিজের ওপর এক ধরণের বিরক্তি দেখা দিল, আত্মবিস্তারে ক্ষুব্ধ বোধ করলেন তিনি। যা ঘটল, কোনো কৈফিয়ৎ দিয়েই তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। অন্যের কথা বাদ দিলেও নিজের কাছে কোন কৈফিয়ত দেবেন তিনি।[১১]

এই সূক্ষ্ম অপরাধবোধ থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি রামতনু। তাই একসময় স্ত্রীর অপমান আর নিজের অবসানের ভারে আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করতে হয় তাকে। সবকিছু গোলমাল হয়ে যায় তার। তিনি প্রকৃতিস্থ নেই, স্থান-কাল-পাত্র হারিয়ে ফেলেছেন। দেহের অস্বাচ্ছন্দ্যের মতোই ক্লেশকর তার এই মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য। লেখক তার মনের অবস্থা সম্পর্কে বলেন, রাতকানা পাখির মতো চিন্তাটা তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যাচ্ছে, শবদাহ সেরে শ্মশান থেকে ফেরার পথে যেমন হঠাৎই পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে তেমনি মানুষটির ধ্বস্ত বিবেক।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্ররা জটিল এবং বিশাল বিশ্বের নানা প্রশ্নের মায়াবী বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। 'আমরা' উপন্যাসের কথক প্রিয়নাথ মজুমদার এরকমই বিষণ্ণতায় বা ডিপ্রেশন-এ ভোগে। কোনোকিছুতে ভালো লাগে না তার। তার মনে আনন্দ-ফুর্তির অভাব। সবসময়েই অকারণ দুঃখের ভার, হীনমন্যতা, হতাশা, নৈরাশ্যবাদিতা, ভগ্নোৎসাহ, আত্মবিশ্বাসের একান্ত অভাব তার মধ্যে দেখা দেয়। কোনোকিছুতেই তার আগ্রহ নেই— প্রিয়জনের সঙ্গে আলাপ-গল্পও জব করা, সিনেমা, টিভি, রাজনীতি কিছুতেই তার সুখ নেই। কথাবার্তা , চলাফেরায় , সাজপোষাকে, মুখের ভাবভঙ্গিতে তার মনে অসুখী ভাবের প্রকাশ পায়। সর্বত্রই অনুভব করে মননবিহীন, আবেগবিহীন, কল্পনাবিহীন এক অসাড়তা। সে তার অসাড় মন নিয়ে আত্মগত মনোবৃত্তে ঘুরপাক খায়। কোনো সিদ্ধান্ত সে নিতে পারে না। তনুশ্রী নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। তনুশ্রীও তাকে ভালোবাসে গভীরভাবে। কিন্তু ভালোবাসার মধ্যেও তার মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয় না। তার নিজেরই স্বগতোক্তিতে বোঝা যায়—

"মাঝে মাঝে প্রকৃতই গুলিয়ে যায় সব কিছু, তখন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসা কী ? তখন, তনুশ্রীর গা থেকে বেরনো ঘামে ও পাউডারের সঙ্গে গুলিয়ে ওঠে নিঃশ্বাস; কোনোরকমে নিজেকে সংবরণ স্বরে জিজ্ঞেস করে, প্রিয়নাথ, এর সঙ্গে তোমার

সম্পর্ক কী ? কিংবা আমলানির সঙ্গে ? সুধার সঙ্গে ? নয়নাংশুর সঙ্গে ? ভয় হয়, বড়ো ভয় লাগে এসব প্রশ্ন থেকে পেরিয়ে আসার জন্যে প্রাণপণ হাঁটতে শুরু করি আমি, দ্রুত ও অবিন্যস্তভাবে।"[১২]

'একা' উপন্যাসে স্বপ্ন জাগর অবস্থায় শিশিরের অবচেতন মনকে দিব্যেন্দু পালিত অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। শীলা, সুমি, পাকড়াশি প্রভৃতি অনেকেই তার স্মৃতিপথে যাতায়াত করে। অতীত এসে বর্তমানে মিলে যেতে থাকে। লেওন ইডেল তাঁর 'The Modern Psychological Novel' গ্রন্থের দশতম অধ্যায় 'Novel as Poem' প্রবন্ধে একধরনের 'পোয়েটিক ইমেজ'-এর কথা বলেছেন। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে তারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শিশির তার নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে সমস্ত কিছু চিনে নিতে চায়। এইভাবে ক্রমশ সাবলীল হয়ে ওঠে পৃথিবী আর এক পৃথিবীতে— সমস্ত হাওয়া এসে ক্রমশ ছুঁয়ে যায় তাকে, মাংস থেকে ক্রমশ আলাদা হতে থাকে হাড়, ধূপের গন্ধময় আচ্ছন্নতা এমনকি বেলার রোদ্দুরেও চুপিসাড়ে ডেকে আনে গভীর মধ্যরাত।"[১৩]

স্মৃতি মাঝে মাঝে শিকড় ধরে টান দেয় শিশিরের শব্দের মধ্যে হারিয়ে যায় শব্দ, একান্তে নিজের হাঁটা-চলার শব্দ সোচ্চার হয়ে ওঠে কানে। নিজেই সম্মোহিত হয়ে বিড়বিড় করে বলে ওঠে, "শিশির, আছি। অপেক্ষায় আছি। —শুধু বুঝতে পারছি, আমার দিনমান আটকে যাচ্ছে স্মৃতির খেলায়; শুধু দেখতে পাচ্ছি, চেনাশোনা শব্দগুলো থেকে শীতের পাখির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে অর্থ; নতুন তাৎপর্য নিয়ে ফিরতে আসছে তারা।"[১৪] এরকম দিবাস্বপ্ন শিশিরের অবচেতন মনকেও চিনিয়ে দেয়।

আবার 'ইনসমনিয়া'য় ভোগে শিশির। নির্বান্ধব শিশির ক্রমশ একা হতে থাকে। স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু একটা অস্বস্তি, একটা আড়ালের যন্ত্রণা এসে সবকিছু এলোমেলো করে দেয় তার। তখন স্মৃতি বিজড়িত বিস্মৃতির দিকে ক্রমাগত একা হাঁটতে থাকে সে। "মাথার ভিতর কেঁপে আঠা হয়ে যাচ্ছে শিরাগুলো। সেখানে ঘুম। কিন্তু— দু'হাতে চুলের মধ্যে বিশৃঙ্খল আঙুলগুলো ঠেলতে ঠেলতে শিশির হাই তুলল, কিন্তু সে ঘুমোবে না।"[১৫]

লেওন এডেল তাঁর 'Modern Psychological Novel' গ্রন্থে যে 'Mental Prattle'-এর কথা বলেছেন, 'উড়োচিঠি' উপন্যাসে চন্দনার 'মাথার ভিতর হঠাৎ দড়ির খেলা' সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। ভাবনা তাকে অনেকদূর টেনে নিয়ে যায়। পাঁচবোনের ছোট হয়ে তাকে শুধু অপেক্ষা করেই যেতে হয়। তার 'মাথা ঘোরে; শরীরে অন্ধকারের এই চমকটা ঠিক সহ্য করতে পারে না সে। দ্রুত ঘেমে ওঠে হাতের চেটো। অনেক সময় সামলে নেয়, যখন পারে না তখন তারপর কি হয় বুঝতে পারার আগেই আবার ফিরে যায় অন্ধকারে।...এই বয়সে নাকি অনেক মেয়েরই হয়, বিয়ে হলে ঠিক হয়ে যায়।"[১৬] এই যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি হিস্টিরিয়া রোগের কারণ। আবার টুপুর ভেতরে 'ঢেউ তোলা

নদীর মতো কি একটা বয়ে যায়'। 'এই মুহূর্তে মনের সমস্ত দ্বিধা নিয়ে পৃথিবীর আলো হাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে এক রকম ঐশ্বর্য; বহুদূর ব্যাপ্ত উজ্জ্বলতার মধ্যে টুপুর দেখতে পায় তার বিভিন্ন রঙ খামখেয়ালি অনুভূতি হয়ে ঢুঁয়ে যাচ্ছে তার লুকানো শরীর ও শরীরের ভিতর তালাবন্ধ ছোটো ছোটো ঘরগুলোকে।' এ তার মনচৈতন্যের 'স্ট্রিম অব কনশাসনেস'-এরই-অনিবার্য ইঙ্গিত। তার ইচ্ছে করে চেতন মনের পলকা অবরোধ সম্পূর্ণ অবর্জিত করে যে যেমনভাবে যা ইচ্ছে করুক তাকে নিয়ে। প্রায় সুখকর এক অজানা অনুভূতির মধ্যে নিজেকে চিনে নিতে থাকে। তার ইচ্ছে করে এই সুখ চিরস্থায়ী হোক। এটা টুপুর মধ্যে ফ্রয়েড কথিত অলস্-এর প্রভাব।

'অবৈধ' উপন্যাসে যৌনতা খুব ঋজু এবং বলিষ্ঠ। 'চরিত্র' উপন্যাসে আহামরি আর নৃসিংহের যৌন কামনায় যে পাপ ধরা পড়ে, 'অবৈধ' উপন্যাসে পার্থ আর জিনার সক্রিয় কামনায় পাপের ছোঁয়াটুকুও নেই। মানসিকতার দিক থেকে দুজনেই সংস্কারমুক্ত দুই নরনারী। ওট্রেখাকে অবদমনে পৌরুষ নেই কোনো। পুরীর হোটেলে অন্ধকার যেন উৎসাহ দিয়েছে পার্থ আর জিনাকে। অন্ধকারে নিজের শরীরের ঘ্রাণ মিশিয়ে দেয় পার্থর শরীরে। 'নিজের নিরাবরণ সর্বাঙ্গে পার্থর শরীরের আদ্যন্ত পৌরুষ জড়িয়ে, আর্ত স্তনদ্বয়ে পার্থর বুকের পেশি ও রোমরাজির কোমল স্পর্শ অনুভব করতে করতে, পার্থর নিঃশ্বাসের প্রতিটি উত্থান-পতন নিজের নিঃশ্বাসে মিশিয়ে নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়ে জিনা। দিব্যেন্দু পালিতের এই বর্ণনায় অশ্লীলতার রেশমাত্র নেই। কারণ, এ তো শুধু শরীরী আকর্ষণ নয়। জিনা স্পষ্ট অনুভব করে 'কী যে সন্তর্পণে ঘোরাফেরা করছে তলপেটের অন্ধকার অভ্যন্তরে, এতকালের অনাদরে ম্লান একটির পর একটি কোষ ভরে উঠছে নতুন সম্ভাবনায়। আদিরসের খেলা এই উপন্যাসের সৃষ্টির দ্যোতনা বহন করে আনে। এখানেই দিব্যেন্দু পালিত সার্থক শিল্পী।

ফ্রয়েডের অনেক পরে জাক লাঁকা মানবমনস্তত্ত্বকে শুধু অবদমনে খোঁজার কথা বলেননি। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের বিভিন্ন শাখায় মানবমনস্তত্ত্বকে খোঁজার চেষ্টা করছেন। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে এই বিষয়টি দেখা যায়। 'অনুভব' উপন্যাসের আত্রেয়ীকে কলকাতার ইউনেসকোর প্রোজেক্টে কাজ করতে আসার মাধ্যমে চিনে নেওয়া যায়। আবার 'মৌনমুখর' উপন্যাসে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের মাধ্যমে তড়িৎকে, 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ' উপন্যাসে চরিত্রদের চেনা যায় বিজ্ঞাপন জগতের প্রসঙ্গকে সামনে রেখে। আবার এক ধরণের 'ইমাজেনারি ফরমেশন' থেকে চিনে নেওয়া যায় 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসের অদিতা রায়কেও। জাক লাঁকা 'Beyond the Reality Principle' গ্রন্থে 'Objective of Psychology' প্রসঙ্গে বলেছেন, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে চরিত্র ধরা পড়ে "With all his desires, imaginary formations, language and meaning."[৩৮]

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে বিবেকের দংশন, পাপবোধ, অন্যায় অপরাধজনিত উৎকণ্ঠা এবং নিজের সংযম হারিয়ে ফেলার জন্য যে উৎকণ্ঠা তারই প্রতিফলন দেখা

যায়। অ্যাংজাইটি নিউরোসিসেরও প্রকাশ ঘটে। যেমন, 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের দাশরথি বিবেকে দংশনের ফলে সৃষ্টি হয় উৎকণ্ঠা, 'সম্পর্ক' উপন্যাসে রামতনুর, 'সোনালী জীবন' উপন্যাসের সারার পাপবোধ 'একা' উপন্যাসের শিশিরের মনে হয়েছিল, সে তার স্ত্রী প্রতি অন্যায়-অপরাধ করেছিল। এই ধরনের মানসিক ক্রিয়া ইচ্ছানুসারে হয় না, অজ্ঞাতে ঘটে যায়। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্ররা এই উৎকণ্ঠাকে কখনোই অবদমন রিপ্রেসন করতে পারেনি। তাই তো সারাকে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে হয় 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসের জয়াকে ছাদ থেকে লাফাতে হয়, 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসে ধীমান স্ত্রীকে হারানোর পর একধরণের অপরাধবোধ থেকে শ্রীলাকে গলা টিপে হত্য করেছিল এবং শেষে নিজেও আত্মহত্যা করে। 'অচেনা আবেগ' উপন্যাসে জয়দীপ বরে বেশে আত্মহত্যা করেছিল। আত্মহত্যা করে সে প্রেমিকা শমিতাকে বোঝাতে চেয়েছি তার ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না।

'অনুভব' উপন্যাসে ইতিহাসবোধ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের অবিরাম আনাগোন চলতে থাকে। চলতে থাকে আত্রেয়ীর আত্মবিশ্লেষণ। এড্ওয়ার্ড দুজারদিন কথিত 'ইণ্টারন্যাল মনোলোগে'র প্রকাশও ঘটে। রাহুলের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর কলকাতায় ফিরে একমুখী নানা চিন্তা আত্রেয়ীকে ঘিরে ধরে। নিজেকে নিয়ে ভাবনার টানাপোড়েনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। সন্দেহ, হতাশা ও অনিশ্চয়তা থেকে একধরণের বিষণ্ণতা এসেছে।

"তখন মনে হয় একান্তে নিজেকে নিয়ে থাকাই ভালো। এক একদিন এমনও হয় যখন ঝলমলে দিনদুপুরেও ঝপ করে নেমে আসে অন্ধকার। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ঝাপসা লাগে চারদিক, জলজ গন্ধে ভারী হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস।"[১৮]

যতদিন গেছে ততই সে একা হয়ে পড়েছে। যতই সে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করুক, হতাশা তার পিছু ছাড়েনি। হতাশা ক্রমশ বাড়তে থাকে। হঠাৎ ইচ্ছা থেকে পুরোনো অ্যালবামের ছবি দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। নিজের মনে প্রশ্ন ওঠে, সে নিজেই সবার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এর জবাব খুঁজতে গিয়ে নিজেই দ্বিধাবোধ করে। রাহুলের অপমান তাকে আত্মমুখি করে তুলেছিল। "এই যে দেড় বছর নিজের মন ও শরীরটাকে গচ্ছিত রেখেছিল রাহুলের কাছে, সম্পর্কটা স্বাভাবিক ভেবেই যথেচ্ছ হতে দিয়েছিল তাকে এই ব্যাপারগুলো কি তাহলে যেমন ছিল তেমনই রেখেছে"[১৯] অপমানের এই দিকটা সে কোনদিনই ভুলতে পারেনি। স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে চলে এসেছিল কলকাতায়। সে এখন মুক্ত। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। বাঁচতে চায় নিজের মতো করে। স্বাবলম্বী হতে চাকরির দরখাস্ত করে। স্বনির্ভরতার এই জোরটাই তাকে টিনিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু দাদার বন্ধু উৎপলের সঙ্গে মেলামেশা করার সময়ও সে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল। অথচ উৎপলই তার শুভাকাঙ্ক্ষী। আসলে "সে দাঁড়িয়ে আছে এক অন্ধকার সমুদ্রের সামনে, যেখানে শুধুই ঢেউ আর ঢেউ আর ঢেউ ছাড়া কিছুই নেই, চারপাশের শব্দ

ও নৈঃশব্দ্য মিলতে পারছে না নির্দিষ্ট কোনও বিন্দুতে।"[৯] রক্তের সম্পর্কেও আড়ষ্টতা ঢুকে পড়েছে। অতীত স্মৃতি থেকে মুক্তি নেই তার। কোনোদিকে এগোবার বদলে ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছে নিজেরই ভিতরে। নিজের তৈরি রক্তের মধ্যে একা হতে থাকে সে। আত্মীয়ের বিরহ মনকে বোঝাতে লেখক বৃষ্টি, নৈঃশব্দ্য, মেঘ, অন্ধকার ইত্যাদির প্রতীক বা প্রসঙ্গও এনেছেন। আসলে 'অনুভব' একটি নারীর অন্তর্বেদনার উপাখ্যান।

দুই পূর্ণবয়স্ক নারীপুরুষের জটিল মানোদৈহিক সম্পর্ককে 'মাত্র কয়েকদিন' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লেখক। স্বামী মারা যাবার পর অদিতি একা হয়ে যায়। ছেলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ে করে আলাদা হয়ে যায়। সেই একাকিত্ব আরো বেড়ে যায়। বিষাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে অদিতি। একাকিত্ব কাটাতে বিশাশ্লিশ বছর বয়সে স্বামী বন্ধু প্রিয়ব্রতর স্মরণাপন্ন হয়। আকর্ষণ বাড়তে থাকে। একসময় দেহমনের আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে। কামের তাড়নায় (লিবিডো) ছুটে যায় প্রিয়ব্রতর ফ্ল্যাটে। শরীরের সমস্ত কিছু উজাড় করে দেয়। প্রিয়ব্রতও ফিরিয়ে দেয়নি।

"বাহান্ন বছর বয়সেও তার শরীর, স্বাস্থ্য, নিজেকে উজ্জীবিত করার ক্ষমতা এতটুকু টাল খায়নি। নিজের সমগ্র পৌরুষ নিয়ে সেদিন রাত্রে সে যখন অদিতির শরীরে প্রবেশ করে এবং আবেগ থেকে সম্পূর্ণ শরীরী হয়ে উঠে তার কাঁধে দাঁতের দাগ বসাতে বসাতে অস্ফুট অভিমানে কিছু বলতে থাকে অদিতি, তখনও, সেই কথাগুলো না শুনে নিজেকে পরিতৃপ্ত করার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে। যেন অদিতি নয়, তার সামনে সম্ভোগের জন্য পড়ে আছে মাংসময় এক টগবগে নারী শরীর, যে কোনও নাম হতে পারে তার— বস্তুত কিছুই এসে যায় না নাম বা পরিচয়ে।"[১০]

অল্প বয়সে বিধবা অদিতি আর বিবাহ না করা প্রিয়ব্রতর মধ্যে কামনা-বাসনার অবদমিত ইচ্ছা এতদিনে পূর্ণ হয়। কিন্তু পরের দিন সকালে অদিতির মনের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আসে। অদিতি সবকিছু উজাড় করে দিতে চেয়েছিল, দিয়েওছে। কিন্তু এইটুকু হওয়ার জন্য সে আসেনি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া অদিতি চেয়েছিল একটা আশ্রয়, একটা অবলম্বন। যা প্রিয়ব্রত দিতে পারেনি। তাই রাতের অন্ধকারে যে সুখ অনুভব করে ভোরের আলোয় তা ভেঙে যায়।

শুধুমাত্র পারস্পরিক আকর্ষণেই দুই পূর্ণ বয়স্ক নরনারীর অবৈধ সম্পর্কের গোপন রহস্য উন্মোচন করেছেন লেখক 'হঠাৎ একদিন' উপন্যাসে। বহুগামিতা এবং বিবাহোত্তর অবৈধ সম্পর্কের পর নারীপুরুষের জটিল মানসিকতার সৃষ্টি হয়। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের অতি সুন্দর পটভূমিতে আকস্মিক দেখা হয় শ্রীজিৎ ও অনুজার। সেই পরিচয় তাদের এমনি এক শারীরিক আকর্ষণের বন্ধনে জড়িয়ে ফেলে কলকাতায় এসেও চলতে থাকে তাদের উদ্দাম লুকোচুরি খেলা। তাদের আকর্ষণে কোনো আবেগ বা ভালোবাসা নেই, সবটাই শরীরের আকর্ষণ। এই আদিম প্রবৃত্তি বা লিবিডোর তাড়নায় দুজনের মধ্যে দেখা দিয়েছে

এক ধরনের পাপবোধ। অনুজা তার স্বামী, সন্তানদের চায়নি। তাদের ছেড়ে আসতেও পারেনি। এতো কিছু হবার পরও আনন্দই তাকে বেশি ভালোবাসে। তাই উপন্যাসের শেষে অনুজা নিজের অনুতাপ, অনুশোচনায় আনন্দর বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে...

"সমস্তই শুধু একজনের সঙ্গে শরীর খেলার জন্যে— যে-খেলার অতীত ছিল না কোনোও, যে-খেলার ভবিষ্যৎও নেই। শুধু নিজের জন্যে নয়, আনন্দকে প্রতারণা করার জন্যে তখন কীভাবে সারা শরীর ভেঙে কান্না জমা হয়েছিল চোখে! আর, তখনই মনে হয়েছিল, এই বৃষ্টি, এই অভিজ্ঞতা হয়তো কোনও সংকেত পাঠাচ্ছে তার কাছে— ইঙ্গিত দিচ্ছে নিষেধের, যা হয়েছে হয়ে গেছে, এবার ফেরো। অর্থহীনতার পিছনে এইভাবে ছুটে কোন সর্বনাশ ডেকে আনছ তুমি!"[২২]

ফোটোগ্রাফার শ্রীজিৎ ও তার স্ত্রী বিপাশাকে ঠকাতে পারেনি। অসুস্থ বিপাশার যৌন ক্ষমতা হারিয়ে গেছে। ফলে তেইশ-চব্বিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে সুখ পায়নি শ্রীজিৎ। সিনেমা সাংবাদিক আনন্দকমলের স্ত্রী অনুজার প্রতি তার আকর্ষণ ভালোবাসার নয়, শরীরী হয়ে উঠে। সেই শারীরিক আকর্ষণে তৃপ্তি অনুভব করলেও অসুস্থ স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়। এর ফলে তার অবচেতন মনে এক ধরনের হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। শ্রীজিতের মধ্যে একটা লাগামছাড়া জীবন ছিল বটে। কিন্তু সেই লাগামছাড়া জীবনে অনুজা আর সঙ্গ দিতে পারেনি। আনন্দকে প্রতারণা করার জন্য তার সারা শরীর ভেঙে কান্না জমা হয়েছিল চোখে। অপরদিকে শ্রীজিতের মানসিকতার তীব্র পরিবর্তন ঘটিয়েছেন লেখক। শ্রীজিতের বন্ধু শুভঙ্কর সেরিব্রাল অ্যাটাকে হাসপাতালে ভর্তি হলে বাস্তবের মাটিতে নেমে আসে শ্রীজিৎ। অসুস্থতার পরিবেশে বিপাশার কথা চিন্তা করতে করতে শ্রীজিতের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে।

ইয়ুং মনে করেন, ব্যক্তির অতীত জীবনে বা শৈশবে নয় বর্তমানেই নিউরোসিসের কারণ নিহিত। আর শুধু বাসনার অতৃপ্তিই রোগের কারণ নয়। জীবন সংগ্রামে পরাজয়ই তার কারণ। ব্যক্তি সর্বদাই বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার চেষ্টা করছে। বাস্তবের বিভিন্ন সমস্যা তাকে সমাধান করতে হচ্ছে। কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধান যদি তার সামর্থে না কুলোয় তখন তার লিবিডো বাস্তব থেকে সরে ব্যক্তির শৈশবাবস্থায় প্রত্যাবৃত্তি করে। ফলে ব্যক্তি বাস্তবের সম্মুখে এলোমেলো নানা আচরণ করতে থাকে। এমন অবস্থায় নিউরোসিস দেখা দেয়। ইয়ুং বলেছেন—

"Therefore I no longer final the cause of a neurosis in the past, but in the present, I ask, what is the necessary task which the patient will not accomplish ?"[১০]

বাস্তবের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীনই দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে নিউরোসিস বা উদ্বায়ু রোগে ভুগিয়েছে। রামতনু, দাশরথি, অনীশ, রজত, আদিত্য, এষা, তপতী, শিশির, প্রিয়ব্রত, আত্রেয়ী প্রমুখ চরিত্রের সমস্যা বর্তমানের জীবনসংগ্রামের সমস্যা। অতীতের কোনো সমস্যা নয়। কামনা-বাসনার অতৃপ্তিও তাদের মধ্যে বড়ো নয়। আবার ইয়ুং এও বলেন, বাস্তব সমস্যাই নিউরোসিসের একমাত্র কারণ নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণেও এ রোগ হতে পারে। কোনো কোনো যৌন ইচ্ছার বিশৃঙ্খলার দরুণও হতে পারে। চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যেও যে নিউরোসিস দেখা দেয়, তাদের কারণ হিসাবে তিনি বলেন, বাস্তব সমস্যা, অতৃপ্ত যৌন ইচ্ছা বা অস্বাভাবিক ক্ষমতাস্পৃহা বর্তমান থাকে। চল্লিশের পর তা আর থাকে না। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তিরও যৌন আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে। 'হঠাৎ একদিন' উপন্যাসের শ্রীজিতের বয়স একান্ন-বাহান্ন। এই বয়সেও সে বিবাহিত নারী অনুজার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। 'মাত্র কয়েকদিন' উপন্যাসে বাহান্ন বছর বয়সী প্রিয়ব্রতও কামের তাড়নায় স্থির থাকতে পারেনি। বারবার বন্ধুর স্ত্রী অদিতির কথা মনে পড়েছে। একবার দেহ মিলন হবার পরও চলতে থাকে তাদের গোপন মেলামেশা। আসলে আমাদের মধ্যে যে অনুভূতি রয়েছে তা অতিক্রম করে পূর্ণতালাভের প্রয়োজন হয়ে ওঠে। ইয়ুং এর মতে—

"The symtoms of neurosis are not simply the effects of long past cases, whether infantile sexuality or the infantile urge to power, they are also attempts at a new synthesis of life— unsuccessful attempts let it be added— yet attempts nevertheless, with a core of value and meaning."[৩]

দিব্যেন্দু পালিত কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব মাথায় রেখে সৃজনশীলতার পথে অগ্রসর হননি। হয়তো কিছু তাত্ত্বিক ভাবনা তাঁর মগ্ন চেতনায় ছিল, যা লেখনীর মাধ্যমে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছায়। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে গ্রাম্যজীবনবিচ্ছিন্ন নাগরিক মধ্যবিত্ত তার একাকিত্ব ও নৈঃসঙ্গ্যের মধ্যে এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংকট লালন করেছে। জগৎ ও জীবনের বিচিত্রমুখী জটিলতা, নৈরাশ্য, মোহভঙ্গ, বিভ্রান্ত প্রভৃতি সার্থক রূপ পায় তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রগুলির অবদমিত হৃদয়ের বহুমুখি বিকার ও বিক্ষোভ প্রথম থেকেই ধরা পড়েছে। তিনি মূলত নারী-পুরুষের মনোদৈহিক জটিলতার স্বরূপ স্পর্শ করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. পালিত, দিব্যেন্দু— সিন্ধু বারোয়াঁ, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৯৭
২. তদেব— পৃ. ৬৮

৫. তদেব— পৃ. ৬৯
৬. পালিত, দিব্যেন্দু— সেদিন চৈত্রমাস, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৩৩
৭. তদেব— পৃ. ৯৭
৮. নন্দী, হীরেন্দ্রনাথ— মনের বিকার ও প্রতিকার, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ২৯
৯. পালিত, দিব্যেন্দু— প্রণয়চিহ্ন, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৯০
১০. পালিত, দিব্যেন্দু— সন্ধিক্ষণ, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৩০
১১. Jung. C. G— Modern Man in Search of A Soul, Translated by W. S. Dell and Cary F. baynes, printed by great britian by Lund Humphrise, London, Bradford, Re-printed-1961, p. 217.
১২. পালিত, দিব্যেন্দু— সন্ধিক্ষণ, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ২৫
১৩. পালিত, দিব্যেন্দু— সম্পর্ক, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৭০
১৪. পালিত, দিব্যেন্দু— আমরা, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৮২
১৫. পালিত, দিব্যেন্দু— একা, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৪৩০
১৬. তদেব— পৃ. ৪৫১
১৭. তদেব— পৃ. ৪১২
১৮. পালিত, দিব্যেন্দু— উড়োচিঠি, দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৫১৫
১৯. Benvenato, Bice and Kennedy, Roger— The Works of Jacques Lacan, an introduction, FAB, 1986, p. 74
২০. পালিত, দিব্যেন্দু— অনুভব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ১০
২১. তদেব— পৃ. ১৫
২২. তদেব— পৃ. ৩৭
২৩. পালিত, দিব্যেন্দু— মাত্র কয়েকদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৩৮

২২. পালিত, দিব্যেন্দু— হঠাৎ একদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০১০, পৃ. ৮২
২৩. Jung. C. G— Collected Papers of Analytical Psychology, edited by Dr. Constance E. Long, Moffat Yard and Company, New York, Second Edition-1917, p. 232.
২৪. Jung C. G— Two Essays on Analytical Psychology, translated from the German by R. F. C. Hull, New York, Second Edition, 1966, p. 45.

রবীন্দ্র কুমার বর্মন : গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

কবিতিকা
বইয়ের কারিগর
ওয়েবসাইট www.kabitika.com ই-মেল kabitika10@gmail.com
মোবাইল 9832130048